মাতৃভাষা পত্রিকা

বর্ষ ১১ | সংখ্যা ১ | জানুয়ারি–জুন ২০২৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট

মাতৃভাষা পত্রিকা

বর্ষ ১১, সংখ্যা ১, জানুয়ারি–জুন ২০২৫

ISSN: 2618-0103 ।। ISSN-L: 2618-0103

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট

মাতৃভাষা পত্রিকা
ভাষা বিষয়ক ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা
বর্ষ ১১, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-জুন ২০২৫

প্রকাশকাল: মে ২০২৫
(Pablished in may 2025)

সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
পরিচালক, আমাই

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই

সহযোগী সম্পাদক
ড. নাজনিন নাহার
সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা), আমাই

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক ও সম্পাদক, মাতৃভাষা পত্রিকা, আমাই
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি
ড. হানা রুথ থমসন, প্রাক্তন প্রভাষক, SOAS, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ কাহালী, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. তপন কুমার বাগচী, পরিচালক (ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগ), বাংলা একাডেমি
ড. মনিরা বেগম, চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শারমিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই
আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই
ড. নাজনিন নাহার, সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা), আমাই

প্রচ্ছদ: অনুপম হুদা

মূল্য: ২০০/- US $ 3

ডিজাইন ও মুদ্রণ: ইনোভা কমিউনিকেশনস, আরামবাগ, ঢাকা

ষাণ্মাসিক মাতৃভাষা পত্রিকার প্রকাশক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ (www.imli.gov.bd)

@ স্বত্ব: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
ISSN: 2618-0103, ISSN-L: 2618-0103

এই গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহে প্রতিফলিত মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি লেখকবৃন্দের একান্তই নিজস্ব। এর জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট দায়ী নয়।

মাতৃভাষা পত্রিকা

ভাষা বিষয়ক ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা

সূচিপত্র

সৈয়দ শামসুল হকের কথাসাহিত্য: ভাষা-নির্মিতিতে মনস্তত্ত্ব ৫
আসমা ইয়াসমীন রুনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের স্নাতক ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দের ক্রিয়া-বিশেষণ 都 (dōu)-এর ব্যবহারগত ত্রুটি বিশ্লেষণ ২৭
এম এম আফিকুর রহমান নাহিদ, তন্বী রহমান

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত ভূমিজদের বিপন্ন ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি: পাবনা জেলাভিত্তিক একটি পর্যালোচনা ৩৮
এস. এম. তানভীর রহমান

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান: তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা ৫৬
নূর নাহার শারমিন সুলতানা

হিজড়াদের লোকভাষা: গোষ্ঠীগত সংযোগমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের স্বরূপ ৭৩
প্রদিতি রাউত প্রমা

পাঁচবিবি উপজেলার ওরাওঁ নৃগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনমনে ভাষাগত পুঁজির প্রভাব ৯৪
মনসুর আহমেদ

বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার প্রাসঙ্গিকতা ও সীমাবদ্ধতা ১০৬
মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, জেনিফার জাহান

নওগাঁ জেলার সাঁওতালি ভাষা: একটি পর্যালোচনা ১২৬
মোঃ ইসলাম আলী

ঢাকার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ভাষা-বৈচিত্র্য ১৪৩
রঞ্জনা বিশ্বাস

বিশ্বায়নে ভাষার উন্নয়ন ও অবনয়ন: জার্মান ভাষাপ্রসঙ্গ ১৬০
রোজালীনা শ্যামা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *'চিলেকোঠার সেপাই'* উপন্যাসের ভাষায় বাখতিনের বহুস্বর প্রসঙ্গ ১৭৬
হুমায়রা আফরোজ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা পত্রিকায় প্রবন্ধ পাঠানোর নিয়ম ১৯৩

সৈয়দ শামসুল হকের কথাসাহিত্য: ভাষা নির্মিতিতে মনস্তত্ত্ব

আসমা ইয়াসমীন রুনা*

Abstact: Syed Shamsul Haque's (1935-2016) fiction is rich in the multidimensional portrayal of the sensitive human mind. The spiralling dynamics of an individual's mind and mental inclinations have become the primary focus of his stories and novels. He crafted a unique language style to express human nature's inevitable and innermost tendencies. His thoughts, built on diverse words and fluid ornaments, have found their way into a unique body of art. The author's psychological perspective has been revealed through his restrained wording and dispassionate narrative style. The main objective of this article is to determine the influence of the psyche on the language that captures the heartfelt feelings of the character.

মূলশব্দ (Keywords): ভাষা (Language), মনস্তত্ত্ব (Psychology), মন (Psyche), উপন্যাস (Novel), গল্প (Story)

বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য শিল্পী সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক হলেও কথাসাহিত্যে তাঁর অবস্থান স্বতন্ত্র। আধুনিক জীবন বাস্তবতায় ব্যক্তির মানসপ্রবণতার বিসর্পিল গতিপ্রকৃতি তাঁর গল্প ও উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। সৈয়দ শামসুল হকের ভাষা কখনো গতিশীল, কখনো প্রতীকময়, আবার কখনো বহুস্বরিক। তিনি ব্যক্তির মনোজাগতিক বিচরণকে ধারণ করে সাহিত্য বয়ানে উপস্থাপনের প্রয়াসে নির্মাণ করেন এক নান্দনিক শিল্পকাঠামো। এই কাঠামোর বিশেষত্ব হলো এটি চরিত্রের অন্তর্গত চালচিত্রকে বহির্জগতে ভাষিক রূপদানে সক্ষম। এই প্রক্রিয়ায় তিনি ব্যবহার করেছেন কাব্যিক সংলাপ, আলংকারিক ভঙ্গি এবং সংক্ষিপ্ত অথচ বহুবাচনিক বাক্য বিন্যাস, যা পাঠকের হার্দিক অনুভূতিকে প্রগাঢ় সংবেদনায় প্রকাশ করে।

* Dr. Asma Yasmin Runa, Associate Professor, Bangla Discipline, Khulna University, email: asmayruna@gmail.com

সৈয়দ শামসুল হকের কথাসাহিত্য কীভাবে চরিত্রের মনোজগতের প্রতিক্রিয়াকে ভাষা কাঠামোয় শিল্পরূপ প্রদান করে তা অন্বেষণ এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও ভাষা রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দ, সংলাপ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প কীভাবে মনোধর্মী হয়ে ওঠে তা উপস্থাপনের প্রয়াস রয়েছে এ প্রবন্ধে।

ভাষার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয় মানুষের চিন্তন ও উচ্চারণ। মানবজীবনের কোনো অভিজ্ঞতাকে ভাষার সাহায্য ব্যতীত প্রকাশ করা যায় না। ভাষার মাধ্যমে লেখকের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনার নানা প্রান্তের মধ্যে নিবিড় সংযোগ গড়ে ওঠে। মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেয়ার পর মানুষের দ্বিতীয় জন্ম হয় ভাষাগর্ভে। ভাষাকে অবলম্বন করেই নির্মিত হয় সাহিত্য। "সাহিত্য-শিল্পের মূল সম্পদ তার ভাবমূর্তি, শিল্পীর জীবনের অভিজ্ঞতা, অন্তরের অনুভূতি, কল্পনার সৃজনীক্ষমতা; কিন্তু তাঁর শিল্পরূপের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল ভাষা" (শ, ১৩৯০: ৭)। সাহিত্যের যেকোনো মাধ্যমে লেখকের মনের প্রকৃতি মুদ্রিত হয়ে থাকে। কারণ ভাষার দেহেই সংযুক্ত থাকে ব্যবহারকারীর মনোলোক। মানবসত্তার বিচিত্র রূপের রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) চরিত্রের অন্তর্মানস রূপায়ণে কথাসাহিত্যের ভাষায় রূপক ও সাংকেতিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। পাত্র-পাত্রীর দ্বিধাদ্বন্দ্বময় অন্তর্বর্তী জীবনের স্বরূপ উপস্থাপনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) প্রতীক ও চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। স্থান ও পরিবেশভেদে ব্যক্তির আচরণ অনুগামী শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭১) সাহিত্য ভাষায়। মানব প্রকৃতির বিচিত্র বিকার ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) বিরচিত নিরাবেগ বর্ণনারীতির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) চরিত্রের জৈব আকাঙ্ক্ষাকে লক্ষ্যভেদী বর্ণনাভঙ্গির মধ্য দিয়ে জীবন্ত করে উপস্থাপন করেছেন। আত্মদ্বন্দ্বে পীড়িত মানুষের সংকট ও যন্ত্রণাজর্জর মনোলোকের চিত্র বুদ্ধদেব বসু (১৯৩৮-১৯৭৪) রোমান্টিক ভাষাভঙ্গি, ফ্ল্যাশব্যাক ও স্মৃতি অনুষঙ্গী প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। বিভাগ পূর্বকালের কথাকার শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক ও প্রতীকের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বঞ্চনা, বৈষম্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অবদমনের চিত্র তুলে ধরেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) তাঁর রচনায় যথোপযুক্ত শব্দ, স্বগত কথনরীতি ও চেতনাপ্রবাহরীতি প্রয়োগের মাধ্যমে কথাসাহিত্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকট, বিচ্ছিন্নতা ও পারিপার্শ্বিক জটিলতায় বৃত্তাবদ্ধ মানুষের মনোজাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ করেছেন। ক্রমবিকাশমান নাগরিক সমাজবৃত্তের আখ্যানে মানুষের জটিল অন্তর্বিশ্ব সাবলীল সংলাপ ও বাস্তব অনুষঙ্গী উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে ভাষারূপ লাভ করেছে রশীদ করিমের (১৯২৫-২০১১) রচনায়। আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২-২০০৯) সৃষ্টিতে ঋজু ও অর্থপূর্ণ ভাষায় অস্তিত্ব সাধনা ও জীবন সংগ্রামরত সাধারণ মানুষের মনোজগৎ মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য কথাশিল্পী সৈয়দ শামসুল হকের রচনায় দ্যোতনাময় শব্দ ও ভিন্ন গদ্যভঙ্গির মধ্য দিয়ে বিবিধ সংকট ও আত্মদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ

মানুষের মনোলোক প্রতীকায়িত হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক বলেন: "ভাষাকেই আমরা ভাবি" (হক, ২০১৬: ২৭)। গদ্য বা পদ্য যাই রচনা করা হোক না কেন, ভাষাকে অবলম্বন করেই তা গড়ে ওঠে:

> গদ্য কিংবা পদ্য, বস্তুত ভাষা ব্যবহার– সাহিত্যে বা সংসারে, কৃষিকাজের অবিকল একটি উদ্যোগ; ধান, সরষে কিংবা গোলাপের মতোই বিশেষভাবে নির্বাচিত, অর্জিত, কর্ষিত একটি ভূমিখন্ডে তার বপন ও ফলন (হক, ২০০৫: ৭০)।

কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও প্রবণতাকেন্দ্রিক কিছু গবেষণা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সৈয়দ শামসুল হকের রচনায় বিদ্যমান। তবে ভাষা ও মনস্তত্ত্ব বিন্যাসের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে পরিপূর্ণ ও এককভাবে নির্মিত বিশ্লেষণমূলক গবেষণা অপ্রতুল। ফলে মনস্তাত্ত্বিক অনুষঙ্গের প্রয়োগে ভাষাশৈলী নির্মাণ বাংলা কথাসাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক ভাষাচর্চায় এক নতুন তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক পরিপ্রেক্ষিত প্রদান করবে।

গবেষণাকর্মটি পাঠ বিশ্লেষণমূলক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়েছে। এই লক্ষ্যে নির্বাচিত গল্প ও উপন্যাসসমূহের আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সৈয়দ শামসুল হকের গল্প-উপন্যাসের ভাষা-ব্যবহারের অন্তর্নিহিত শিল্পরীতির সঙ্গে মনস্তত্ত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ভাষিক কারিগর রূপে প্রতিষ্ঠিত সৈয়দ শামসুল হক মানবজীবনের প্রাত্যহিক বাস্তবতা ও অনুভূতিকে শিল্পায়িত করতে ভাষার গতি-শক্তি ও অলংকারের সুষমাকে কাজে লাগিয়েছেন। নিম্নে সৈয়দ শামসুল হকের কথাসাহিত্যে মনোজাগতিক প্রতিক্রিয়ার জারিত রূপ যেভাবে ভাষায় শিল্পিত হয়েছে তার ধারাবাহিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

ভাষারীতি

কথাশিল্পী সাহিত্যসৃষ্টির জন্য কোনো পৃথক বা স্বতন্ত্র ভাষার সাহায্য পান না। নিত্য ব্যবহারে অতিপরিচিত ভাষার উপাদান হিসাবে যে শব্দগুলি নির্দিষ্ট অর্থবহ– সেই ভাষা ও শব্দসম্ভার আশ্রয় করেই তাঁদের বক্তব্য পরিস্ফুট করতে হয়, অনুভূতি সঞ্চারিত করতে হয়। সে কারণে ভাষা ব্যবহারে প্রত্যেক মহৎ সাহিত্যশিল্পীই এক বিশেষ ভঙ্গি বা মানসিকতার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। বাকনির্মাণে কোনো কথাকার তথ্যনিষ্ঠ, কোনো কথাকার মননধর্মী কেউ বা কাব্যিক প্রকাশের পক্ষপাতী (চট্টোপাধ্যায়, ২০১১: ২৭)। এভাবে তারা এক নিজস্ব বাকশৈলী বা স্টাইল গড়ে তোলেন। সৈয়দ শামসুল হক নিজস্ব বাকশৈলী বা স্টাইলের মধ্য দিয়ে বহুল ব্যবহৃত ভাষায় নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। তিনি মনে করেন, একজন সাহিত্যিকের জন্য ভাষাবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "নইলে ভাষা আমাদের দিয়ে কথা বলিয়ে নেবে ঠিকই, ভাষাকে দিয়ে আমরা কথা বলিয়ে নিতে পারবো না" (হক, ২০১৭ক: ১১)। প্রতিদিনের ব্যবহারে মলিন ক্ষীণপ্রাণ

হয়ে পড়া অতিপরিচিত শব্দকে তিনি প্রখর উজ্জ্বলতা ও সাংকেতিকতা দিয়েছেন। তাই তাঁর সাহিত্যের ভাষা সহজেই আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। সৈয়দ শামসুল হকের নির্মিত বাকশৈলীর মধ্যে চরিত্রের অন্তর্লোকের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। গল্প-উপন্যাসের ভাষা সৃষ্টিতে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া মিশে আছে প্রায় অভিন্নভাবে। *মেঘ ও মেশিন* উপন্যাসে প্রেমিকের জন্য প্রতীক্ষারত এক নারীর গভীর হৃদয়ানুভূতির অনুপম প্রকাশ ঘটেছে এই বর্ণনার মাধ্যমে:

> কৌরবের জন্যে অপরা এখন অন্তরের ভেতরে তুমুল তামাটে, প্রবল প্রবাল রঙের অসহিষ্ণুতা বোধ করে– অসহিষ্ণুতা কৌরবের সান্নিধ্যের জন্যে, কৌরবের গায়ের গন্ধের জন্যে, কৌরবের কথা বলবার সময় নাক ঈষৎ কুঁচকে যাবার জন্যে, এমনকি কৌরবের কালো ঠোঁটজোড়ার জন্যে– এসব থেকে বিয়োগের চিন্তা, বিচ্ছেদের আশংকা অপরাকে অসহিষ্ণু করে তোলে (হক, ২০০২ক: ১১৮)।

শব্দ-ব্যবহার

ভাষার অন্যতম অনুষঙ্গ শব্দ। অভিধানে শব্দ সঞ্চিত থাকে একটি সীমিত অর্থের গণ্ডিতে। প্রতিভাবান লেখকের হাতে শব্দ নতুন রূপ লাভ করে। বিখ্যাত ফরাসি কবি মালার্মে কবিতাকে শব্দের শিল্প আখ্যা দিয়েছেন (শিকদার, ২০০৪: ১২৫)। শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কথাশিল্পীর ভাষিক দক্ষতা বা ভাষাশৈলীর বিশেষত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু সাহিত্যে নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও একই শব্দ বিচিত্র ভাব ও অনুভবের দ্যোতক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। "শব্দের কিছু অর্থ ধারণালব্ধ, আবার কিছু অর্থ অন্তর্জ্ঞানোপলব্ধ" (আহসান, ১৩৭৫: ৩)। শব্দের সহায়তায়ই পাঠক একটি বস্তুর বিশেষ পরিচয়কে অতিক্রম করে তার অনুভূতি বা আবেগকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, প্রয়োজন ও প্রতিবেশের কারণে কখনও কখনও শব্দের আর্থ-পরিধি প্রসারিত হয়।

সৈয়দ শামসুল হক কথাসাহিত্যে বিষয়-অন্বিষ্ট শব্দপ্রয়োগ করেছেন। ফলে আমরা অতি পরিচিত শব্দের শরীরেও আবিষ্কার করি অনাস্বাদিত অনুভব ও অনুরণন। তিনি শব্দনির্বাচনের ক্ষেত্রে চরিত্রের অবস্থান ও মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত সচেতনভাবে লক্ষ করেন। যার কারণে অতি সাধারণ শব্দ, বয়ান-কৌশলের কারণে ভিন্ন ব্যঞ্জনা লাভ করে। *বারো দিনের শিশু* উপন্যাসে আনোয়ার ও রাবেয়ার মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। আনোয়ারের জীবনে নতুন এক নারীর আগমন ঘটে। প্রাক্তন স্ত্রী রাবেয়া পুনরায় তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। দুইজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হলে তারা একে অপরের প্রতি পুনরায় দৈহিকভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আনোয়ার বলে: 'আমরা দু'জন দু'জনের ভেতরে ক্রমাগত চলে যাই, ফিরে আসি আবার যাই। করোটির ভেতরে মহাকাশ। বারো দিনের দুটি শিশুর মতো আমরা অনন্তের ভেতরে ভেসে যাই" (হক, ২০১২ক: ২৩৮)।

করোটি শব্দের আক্ষরিক অর্থ খুলি, মহাকাশ বলতে বোঝায় বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশ। কিন্তু করোটি ও মহাকাশ শব্দ দুটি আভিধানিক অর্থের বাইরে গিয়ে নতুন অর্থ ধারণ করেছে। করোটি ও মহাকাশ শব্দ দুটি যৌনতা প্রকাশে ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গমরত দু'জন নর-নারীর একে অপরের প্রতি গভীর ভালোবাসা বোঝাতে তিনি এই শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন।

সৈয়দ শামসুল হক অনেক ক্ষেত্রে শব্দকে রূপক-সাংকেতিক ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। 'তাস' গল্পে ঘড়ি, তাস ইত্যাদি শব্দগুলো নানা সংকেতে নতুন নতুন অর্থ তৈরি করে। তাঁর নির্বাচিত শব্দগুলো প্রায়শ অভিধানের অর্থের বাইরে নতুন অর্থ ধারণ করেছে। 'তাস' গল্পে স্বামীর মৃত্যুর পর বাড়ির দেয়াল ঘড়িটি হয়ে ওঠে খোকনের মায়ের নিঃসঙ্গতার সঙ্গী। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার স্বামীর স্মৃতি ও স্পর্শ। দীর্ঘদিন ধরে ঘড়িটা নষ্ট হয়ে থাকলেও খোকন ঘড়িটি ঠিক করার ব্যাপারে ঔদাসীন্য দেখায়। খোকনের তাস খেলা এবং বাবার স্মৃতির প্রতি অবহেলা মা সহ্য করতে না পারলেও নীরব থেকেছে। মধ্যরাতে খোকনের মায়ের মানসপটে ভর করে পরস্পরবিরোধী চিন্তা:

> গোটা পৃথিবী যখন ঘুমে অচেতন, যখন রাত কুটিল সরীসৃপের মতো শুধু বাড়ছে, তখন মার মনে সারাদিনের সেই অদ্ভুত, পরস্পরবিরোধী চিন্তাগুলো এসে ভিড় করে দাঁড়াল। একা একা মনে পড়ল খোকনের কথা, নতুন তাসের প্যাকেট আর দেয়াল ঘড়িটার কথা। ঘড়িটা এখনো চলছে (হক, ২০১৭খ: ৬৮)।

বাক্যটিতে ঘড়ি ও তাস শব্দ দুইটি আভিধানিক অর্থের বাইরে নতুন অর্থ ধারণ করেছে। এই শব্দগুলো একজন বিধবা নারীর নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রণাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এক সময়ের নষ্ট দেয়াল ঘড়িটি অতীত স্মৃতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাস খেলার নেশায় খোকন নষ্ট ঘড়ি ঠিক করার কথা ভুলে যায়। খোকনের মায়ের জীবনে তাস হয়ে ওঠে তার প্রতিপক্ষ। তাস ও ঘড়ি দুটি বিপরীত প্রতীক। এই গল্পে মায়ের ঘড়িটি পুরাতন আর ছেলের তাসটি নতুন। সময়ের বিবর্তনে পুরাতন পিছিয়ে পড়ে আর বন্দি হয় নিঃসঙ্গতার বিবরে। ঠিক তেমনি 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান' গল্পে নিঃস্ব দেওয়ান ইদ্রিস খাঁ তৃষ্ণার্ত লেখককে রূপার গ্লাসে পানি পরিবেশন করে। অভাবের তাড়নায় সে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র এমনকি নিজেকে বিক্রি করলেও গ্লাসটিকে যত্ন করে আগলে রেখেছে। গ্লাসটি তার কাছে শুধুমাত্র পানি খাবার উপকরণ নয়, বরং তার বংশের অতীত সমৃদ্ধি ও মর্যাদার প্রতীক।

শব্দের উপর যথেষ্ট দখল থাকলেই কেবল শব্দের প্রকৃত অর্থকে এমন বিশাল ব্যাপ্তি দান করা সম্ভব। লেখকের মনন, রুচি, পরিমিতিবোধ ও নির্লিপ্তিগুণ শব্দ-সাধনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সৈয়দ শামসুল হকের গল্প-উপন্যাসে চরিত্রের অন্তর্ময় অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে সুবিন্যস্ত শব্দরাজির সমন্বয়ে। 'পূর্ণিমায় বেচাকেনা' গল্পে অভাবী অনামী বিক্রেতা নিজের জীবনের এক দুঃসহ স্মৃতি বর্ণনা করেছে। উদ্বোধনে

মায়ের মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনার সময় তার মধ্যে লক্ষ করা যায় আশ্চর্য এক নিস্পৃহতা:

> বহুদিন খিঁচুড়ি খাইনি। আমার মা একদিন খিঁচুড়ি করেছিল। সবাই মিলে লেবুপাতা ডলে খেলাম। পূর্ণিমার রাত ছিল, স্যার। সেই আলোতেই উঠোনে বসে খেয়েছিলাম, স্যার। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি মার গলায় পরনের শাড়ি, জাম গাছের ডাল থেকে ঝুলছে (হক, ২০১৭খ: ৩৮৬)।

সাহিত্যের মৌল উপাদান শব্দ। ভাষার ঐশ্বর্য নিহিত থাকে শব্দের অভ্যন্তরে। শব্দ ধারণ করে লেখকের সংবেদন। যথাযথ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে লেখকের বক্তব্য সঞ্চারিত হয় পাঠকের অন্তরে। শব্দের সুচারু ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মনোজগত ও তার অন্তরীণ অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন।

সংলাপ-সংযোজন

গল্প-উপন্যাসের ভাষায় সংলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিষয়বস্তুর প্রয়োজনানুসারে একজন কথাকার তাঁর রচনায় সংলাপ ব্যবহার করেন। কথাসাহিত্যে সংলাপের ব্যবহার নাটকের তুলনায় কম। নাটকের বিষয়কে বা চরিত্রকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাত্র-পাত্রীর নাম নির্দেশক চিহ্নের সমান্তরালে সরাসরি তা ব্যবহার করা হয়। গল্প-উপন্যাসের মতো সংলাপের আগে-পরে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বা সমান্তরাল কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কথাসাহিত্যে সংলাপ ও বর্ণনা দুটোই খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সৈয়দ শামসুল হক এ প্রসঙ্গে বলেন: "আমাদের গল্প লেখার উপকরণ দুটো। এক হচ্ছে বর্ণনা আরেক হচ্ছে সংলাপ। ... সংলাপ আর বর্ণনা দিয়ে তৈরি হয় গল্প" (হক, ২০১৬: ১৭)। ব্যবহারের বৈচিত্র্য, বিন্যাসের জটিলতা ও অর্থদ্যোতনার দিক থেকে কথাসাহিত্যের সংলাপ নাটকের সংলাপের তুলনায় আরও গভীর ও দূরপ্রসারী (আনোয়ার, ২০১৫: ২৮১)। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসে সংলাপ রচনায় মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সাফল্যের পেছনে রয়েছে সংলাপ-উপযোগী খণ্ডবাক্য, নিত্য ব্যবহৃত শব্দাবলির নির্বাচন এবং চরিত্রের সমাজ ও মনস্তত্ত্ব বোধ। তাঁর উপন্যাস ও গল্পের সংলাপ বিশ্লেষণ করলে তার প্রমাণ মেলে। 'গন্তব্য অশোক' গল্পে সংলাপের মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করা যায় শিরিন ও সামাদের মধ্যকার টানাপোড়েন। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরেছে, একে অপরকে বিশ্বাস করে না:

> আপনি আমাকে সন্দেহ করেন কেন?
> কোনো উত্তর দেয়নি সামাদ।
> আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন না?
> সামাদ নিশ্চুপ।
> আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই, কেউ ছিল না।

> সামাদ তবু নিরুত্তর। তার চোখ দুটো আগের মতোই বোঁজা।
> শিরিন তখন বলেছিল, 'কেন আপনি এরকম করেন? আমাকে বলতে পারেন না?'
> তখন পাশ ফিরে শুয়েছিল সামাদ, শিরিনের দিকে পিঠ দিয়ে। শিরিন তখন সামাদের পিঠে হাত রেখেছিল। 'আমাকে ঘৃণা করেন?'
> যেন একটা পাথরের সঙ্গে কথা বলছে শিরিন।
> বৌকে ভালোবাসতে হয়, জানেন বুঝি? আপনি এত লেখাপড়া করেছেন, এত বোঝেন, এটা বোঝেন না? (হক, ২০১৭খ: ৩৬১)।

বর্ণনার ভেতরে সংলাপ-ব্যবহার সৈয়দ শামসুল হকের গল্প বর্ণন-কৌশলের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। *অনুপম দিন* উপন্যাসটি এই কৌশলে লেখা। সংলাপের আগে বা পরে বড়ো ড্যাশচিহ্ন বা কমা ব্যবহার করে তিনি সংলাপ পৃথক করেন; যার মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হয় চরিত্রের অন্তর্গত ভাবনা। এছাড়া তিনি ঊর্ধ্ব কমা বা অন্য কোনো সংলাপ চিহ্ন ব্যবহার করেননি। আবুর বড়ো ভাই হাশেম বকুলের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। কিন্তু বড়োলোকের উচ্চাভিলাসী তনয়া বকুল তার প্রেমকে উপেক্ষা করেছে নানা অজুহাতে। অন্তমুর্খী আবেগী মধ্যবিত্ত যুবক আবুর তীব্র আবেগ ও অপ্রাপ্তি তাকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে। দীর্ঘদিন পর পরিবারে ফিরে আসা অপ্রকৃতস্থ হাশেমের বিক্ষিপ্ত অন্তর্জগৎ এই সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে:

> মরিয়মকে উপেক্ষা করে, বীথির দিকে না তাকিয়ে, তাদের সমুখে থেকেও যেন অনেক দূরে দাঁড়িয়ে, খানিক হাঁটল হাশেম। একবার দাঁড়িয়ে পেছনে হাত বেঁধে মাটির দিকে চোখ রেখে কী ভাবল। তারপর আবার এক সর্বস্ব ধরে টান দেয়া অস্থিরতার তাড়ায় ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগল, তোমাকে জ্বালিয়ে সুখ আছে, মা। পাঁচ বছর আগে একটা নেশার মত পেয়ে বসেছিল– বুকের আগুন দিয়ে বিশ্বসংসারকে জ্বালিয়ে মারব। ঠিক এইখানটায়, দ্যাখো মা– মরিয়মের সামনে এসে হাত দিয়ে নিজের হৃদয়টাকে ইঙ্গিত করে হাশেম। বলে, সারাক্ষণ একটা আগুন জ্বলছিলো। মস্ত বড় আগুন। মনে করেছিলাম, সবকিছু পুড়িয়ে মারব এ আগুনে। কিন্তু পারলাম কই, মা? হাজার হাজার মানুষ দেখলাম। তারা সবাই কী বলল, জানো? বললো, সাধু বাবা, বুকের ভেতরে আগুন জ্বলছে, তাকে নিভিয়ে দিতে পারো? হাজার হাজার মানুষ। আমার পা ধরে যখন কাঁদত, বলতাম– ভাগ, পালা এখান থেকে। তবু কি ছাড়ে ওরা? ইস, একেকটা মানুষ ভেতরে ভেতরে, শরীরের চামড়া-মাংসের দেয়ালের ওপারে, দোজখ থেকে সব লকলকে আগুন নিয়ে এসেছে। আমি তার কী করব? একজনকে পা টেনে লাথি মারতে গিছলাম, পা উঠলো না (হক, ২০১৪: ৩১১-৩১২)।

সৈয়দ শামসুল হকের রচনায় ব্যক্তির অভ্যন্তরের বিকার, ব্যাধি ও অসংগতির চিত্র বিধৃত হয়েছে। *খেলারাম খেলে যা* উপন্যাসে বাবরের মানুষের প্রতি কোনো আস্থা ও বিশ্বাস নেই। তাই সে সম্পর্কের কোনো বন্ধনে জড়াতে চায় না। চরিত্রের স্ববিরোধী মনোভাব রূপায়ণের জন্য তিনি কখনও কখনও স্বগতোক্তি ব্যবহার করেছেন। বাবরের অন্তর্জগৎ ফুটে উঠেছে এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে:

> একেবারে নতুন লাগছে জাহেদাকে। নতুন চেহারা। অর্থটা যেন ভাল বোঝা যাচ্ছে না।

> কিন্তু মনের মধ্যে টের পাওয়া যাচ্ছে। ভালবাসা? জাহেদা কি তাকে ভালবেসে ফেলেছে? একটা মানুষের ওপর জীবনের দায় দিলেই এমন দৃষ্টি ফুটে উঠে দু'চোখে।
>
> না না। ভালবাসা নয়। আমি কাউকে ভালবাসি না। কাউকে না। ভালবাসা বিশ্বাস করি না। এ হতে পারে না। এ আমি চাই না।
>
> বাবর মাথা দোলাতে লাগল।
>
> অসম্ভব; হতে পারে না (হক, ২০০২খ: ৩৪৫)।

গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত উপন্যাস ও গল্পে সৈয়দ শামসুল হক অবলীলায় দেশের উত্তর অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। সংলাপ এবং বর্ণনায় ব্যবহৃত এই উপভাষা প্রয়োগে তিনি পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ফলে চরিত্রগুলোর যথাযথ স্ফুরণ ঘটে ও তাদের অকৃত্রিম অনুভূতি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। *চোখবাজি* উপন্যাসে গফুর মিয়া তার পালিত কন্যা মালতির বিয়ের ব্যাপারে ছিল চিন্তিত। জলেশ্বরীর ওসি সাহেবের শ্যালকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে চায় গফুর। ওসি সাহেব তার মেয়ের হিন্দুয়ানি নামের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে সে বিব্রত বোধ করে। সন্দিগ্ধ গফুর মিয়া তার ছেলে মুক্তিযোদ্ধা হায়দার মিয়ার কাছে মালতীর প্রকৃত ধর্ম-পরিচয় জানতে চায়। পিতা-পুত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে হায়দার মিয়ার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও মানবিকতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> বাচ্চা ছাওয়া, দুধের ছাওয়া, তার হিন্দু-মোসলমান কী, বাপজান? বাচ্চা কেনে, কারো দেহে লেখা নাই হিন্দু-মোসলমান। সকলেই মানুষ হয়। মানুষ বলিয়া ভাবেন। মানুষ বলিয়া চিন্তা করেন সবাইকে। উপরতালায় তাক করিয়া দেখেন, আসমানে বসি তোমার আল্লা আর ভগবান দুইজনে গলা ধরিয়া বসি-বসি মানুষের তামশা দ্যাখে আর মিটমিট করিয়া হাসে (হক, ২০০৭ক: ৩৩১)।

বুকঝিম এক ভালোবাসা উপন্যাসে মহব্বত জঙের ষড়যন্ত্রের শিকার হয় পালা গায়ক মনসুর বয়াতি। মনসুর বয়াতির কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য মহব্বত জঙ তার বোন চাঁদ সুলতানার হাতে তুলে দেয় বিষ মিশ্রিত মিঠাই। নিজের অজান্তে বিষ মিশ্রিত মিঠাই মনসুর বয়াতি মুখে তুলে নেয়। সে মিঠাই খেয়ে চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায় মনসুর বয়াতির কণ্ঠ। প্রিয়তম পুরুষের এই করুণ পরিণতিতে বেদানাদগ্ধ চাঁদ সুলতানা নিজেও বিষ খেয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। অনুতাপ দগ্ধ চাঁদ সুলতানার মনস্তাপ তুলে ধরতে ঔপন্যাসিক ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন:

> বোবা করলাম বনের পাখি নিজের কোলে নিয়া? কী আর করবাম আমি এই জীবন লয়া? মতি বাঁদির হাত ধরে অনুনয় করে চাঁদ, কিসের ঢোল, কিসের ডগর, আমারে দাও কইয়া। আমি যে গেলাম আইজ সর্বস্বান্ত হইয়া। তুমি তো সকলই জানো, আমার সাথি তুমি। আমারে নি আইনা দিতে পার বিষ, বিষ খাইবাম আমি (হক, ২০০৪ক: ৪১)।

'আপদের বৃষ্টি, করুণার বৃষ্টি' গল্পে জলেশ্বরীর চিরকুমার সোবহান চাচা জানতে

পারে, তাদের বাড়ির গৃহ পরিচারিকা ছমিরনকে তার স্বামী আব্বাস তালাক দিয়েছে। চুরি করা মুরগির তরকারি রান্না করতে অস্বীকৃতি জানানোয় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে ঈদের দিন আব্বাস ছমিরনকে তালাক দেয়। আব্বাস অনুমান করতে পারে তার এই হঠকারী সিদ্ধান্তের পরিণতি। অবিমৃষ্যকারী দরিদ্র আব্বাসের অন্তর্মানসের প্রকৃত রূপ অঙ্কনের প্রয়াসে গল্পকার লোকভাষাকে অবলম্বন করেছেন। আব্বাস তার নিজের ভুল বুঝতে পেরে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বলে:

> মোর বিবি মুই মন থেকিয়া তালাক দেও নাই, বাহে। তাল্লাক কইলেও মন থেকিয়া মুই উচ্চারণ করো নাই বড়বাবু বড়মিয়া গো। মোর বিবি ফির ঘরে নিয়ে যামো হে। তোমরা যা কন, যত জুতা লাগান হামাক লাগান, যত বেগার হামাকে দিয়া খাটে নিবার চান নেন, মুই বেগার খাটি দেমো। তাল্লাক মোর মনের তাল্লাক নয় গো (হক, ২০১৭ঙ: ৫৩০)।

সৈয়দ শামসুল হকের গল্প-উপন্যাসে প্রমিত ভাষা, আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি উর্দু ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। ১৯৪৭ সালের অব্যবহিত পরের পটভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে *ইহা মানুষ* উপন্যাস। তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। বাংলার আপামর জনসাধারণ এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র সার্কাস মাস্টার মহব্বত খাঁকে জীবিকার প্রয়োজনে উর্দু ভাষা ব্যবহার করতে হয়। তার মতে, অন্যের ওপর খবরদারি করতে উর্দু ভাষা বেশ কার্যকরী। তাছাড়া জলেশ্বরীতে বিহারি রিফিউজিদের আনাগোনা বেশি, তাই তাদের খুশি করার স্বার্থে তাকে উর্দু বলতে হয়। অন্যদিকে তার দর্শকের অধিকাংশই যুবক, যারা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চায়। সার্কাসের মধ্য দিয়ে সে বাঙালির প্রাণের দাবিকে তুলে ধরেছে। ফলে উর্দু ও বাংলার সংমিশ্রণে তার সংলাপ গড়ে ওঠে। মহব্বত খাঁয়ের ব্যবহৃত এই বিশেষ সংলাপের মাধ্যমে, তার অন্তর্দেশে প্রবহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত রমজান আলী মানবেতর জীবনযাপন করে। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। বেঁচে থাকার তাগিদে রমজান আলী মোহাব্বত খাঁর সার্কাসের পশুর খাঁচায় স্বেচ্ছায় বন্দি হয়ে খেলা দেখায়। মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মঞ্চে পশু হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করার পেছনে কাজ করেছে তার প্রবল জীবন তাড়না। পেটের ক্ষুধা ও বাস্তবতার কাছে পরাজিত হয়েছে মর্যাদাবোধ ও বিবেক। রমজান আলীর পশু সদৃশ জীবন বেছে নেয়ার পেছনে ক্রিয়াশীল মনস্তত্ত্ব, মোহাব্বত খাঁয়ের বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> মোহাব্বত খাঁ ছড়ি দিয়ে কাপড় ঢাকা খাঁচার ওপর চাপড় মেরে বলে, এইও, চোপ। একদম চুপ রহো। আরে বাবা, ফির উর্দু নিকাল গিয়া। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আসল কথা, আমারও ডর করে। আমারও ডর করে এই জন্তুকে। দেখলে বুঝবেন না, কিন্তু সব জন্তুর

মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক এই জন্তু– সাংঘাতিক এই জন্তু, গোলি মারে, মিছা বলে, হাসে-কান্দে, খাবার পায় না তো ভিখ মাঙ্গে, দুনিয়ায় কত খাবার, কিন্তু নিজে কেড়ে খেতে পারে নাড় হ্যাঁ, এই আজব জন্তু– *ইহা মানুষ* (হক, ২০০৭খ: ২৭৮)।

সৈয়দ শামসুল হক গল্প-উপন্যাসে প্রায়শই ঢাকার ভাষা ব্যবহার করেছেন। প্রায় আশি বছরের জীবনের পরিধির মধ্যে দীর্ঘ সময় তিনি ঢাকায় বাস করেছেন। নিজ শহর কুড়িগ্রামের জনপদ ও ভাষার প্রতি তাঁর যেমন ভালোবাসা ছিল তেমনি ঢাকা শহরের প্রতিও তাঁর ভালোলাগা ছিল। পুরানো ঢাকার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন *মৃগয়ায় কালক্ষেপ*, *কেরানিও দৌড়ে ছিল* প্রভৃতি উপন্যাসে। জলেশ্বরী থেকে জীবিকার সন্ধানে লঞ্চে চাকরি করতে আসা জজ মিয়া ওরফে কেরানির প্রেমে পড়েছিল বংশালের বুলবুল মিয়ার মেয়ে রুহিতন। জজ মিয়ার গ্রাম থেকে বড়ো বোনের পাঠানো বিয়ের ফর্দ দেখে রুহিতন ভাবে জজ মিয়া বুঝি তাকে বিয়ে করতে চায়। জজ মিয়ার প্রতি যুবতী রুহিতনের যে তীব্র আবেগ ও কামনা তা প্রকাশের জন্য ঔপন্যাসিক পুরনো ঢাকার আঞ্চলিক ভাষাকে বেছে নিয়েছেন:

একখান কথা! বিয়ের ফর্দ যে কইরা রাখছেন, আগে পরস্তাবটা আব্বার কাছে পারছেন?

কী বলছো তুমি?

আমি তো পলায়া বিয়া বইতে পারুম না। তয় কি আমারে লইয়া ভাগনের মতলব করছেন! আমি কলাম তাতেও রাজী (হক, ২০১৩: ৩৭)।

সংলাপ ব্যবহারে সৈয়দ শামসুল হক কতটা সচেতন ছিলেন, তা তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নির্মাণশৈলী বিশ্লেষণে সহজেই অনুধাবন করা যায়। বিদেশের পটভূমিতে সৃষ্ট উপন্যাসগুলোতে তিনি ইংরেজি সংলাপের পরিবর্তে সাধু ভাষা প্রয়োগ করেছেন। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার দূরত্ব বোঝাতে তিনি ব্যবহার করেছেন এই ভাষা। বাঙালি তার স্বদেশে যেমন, বিদেশে তেমন নয়। বিদেশে বাঙালির আচরণ কেমন হয়, তা নিয়ে গড়ে উঠেছে *তুমি সেই তরবারি*, *বালিকার চন্দ্রযান* অথবা *অন্য এক আলিঙ্গন* উপন্যাস। একটি বাঙালি পরিবারে একজন বাঙালি মেয়ে, একজন বাঙালি গৃহিণী বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় তা তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। *বালিকার চন্দ্রযান* উপন্যাসে মিস্টার আলীর বড়ো মেয়ে ইয়াসমিন পাত্রপক্ষের ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এ কাজে তাকে সহযোগিতা করে মেজবোন মাহজাবীন। ক্ষুব্ধ মিস্টার আলী মাহজাবীনকে রাগত স্বরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। মিস্টার আলীর সংলাপের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে তার মানসিক অবস্থা:

মাহজাবীন আমার দিকে তাকাও। মেয়েটির চোখ তুলে পরক্ষণেই নামিয়ে নেয়। আমার বিশ্বাস, ইয়াসমিন হইতে তুমি ভিন্ন। তুমি তাহার মতো নও। পিতামাতাকে তুমি শ্রদ্ধা কর, বাঙালি মেয়ের শালীনতাবোধ তোমার আচরণে আমি লক্ষ করিয়াছি। তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না, তোমার ভগ্নি আমাদের প্রত্যেকের মুখে চুনকালি মাখাইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে? (হক, ২০০১ক: ১৮)।

বিদেশের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসগুলোতে সাধু ভাষার প্রয়োগের ফলে ভিন্নধর্মী এক দ্যোতনা তৈরি হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বসবাসরত বাঙালির ভাষার সঙ্গে বিদেশে অবস্থানরত বাঙালির ভাষার দূরত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত সাধু ভাষা নিছক সাধু ভাষা নয়, ইংরেজিগন্ধী সাধু ভাষা; যাতে ইংরেজির ছাঁচ ও শব্দাবলি বাংলায় অনেক সময় আক্ষরিকভাবে অনূদিত হয়েছে (আহসান, ২০১৫: ৩০২)। যেমন:

ক. "আমার প্রাচীন মানুষটি রক্ষণশীল" (My old man is conservative) (হক, ২০০১খ: ১৩৪)। *অন্য এক আলিঙ্গন* উপন্যাসের এই বাক্যের মধ্যদিয়ে বিবির বাবার রক্ষণশীল মানসিকতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিবি তার বাবার সঙ্গে লন্ডনে বিমানবন্দরে দেখা করতে যাবার পূর্বে, বিদেশি বন্ধু টেডকে তার সঙ্গে না যেতে অনুরোধ করে। বিবির বিশ্বাস, তার বাবা কোনো যুবকের সঙ্গে তাকে দেখলে বিচলিত বোধ করবে। বাবার উদ্বিগ্ন মানস অনুমানার্থে সে টেডকে এ কথা বলেছে।

খ. "আমি শিশুর সহিত" (I am with a child) (হক, ২০০১খ: ১৪৮)। লন্ডনে বাসরত অবিবাহিত বিবি অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের কারণে চিন্তিত। প্রেমিক জনাথানকে এ বিষয়ে নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করতে এ বাক্যটি ব্যবহার করেছে।

গ. "আমার উত্তম আমি করিব, কন্যা" (I'll do my best, girl)। (হক, ২০০১খ: ১৬৭)। এই বক্তব্যের মাধ্যমে বিবির বাবার বন্ধু সহানুভূতিপ্রবণ ডাক্তার মজুমদারের মনোভাব ফুটে উঠেছে। গর্ভপাতের জন্য এই ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছিল বিবি। বিবির এ অবস্থার জন্য স্বদেশি যুবক আন্দালিবকে দায়ী মনে করে সে। বিবিকে অভয় দিতে সে এ মন্তব্য করেছে।

বিদেশের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসে প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি সাধু ভাষাকে অবলম্বন করেছেন। যেমন:

ক. *অন্য এক আলিঙ্গন* উপন্যাসে দেখা যায় প্রবাসী আন্দালিবের ভালোবাসার মানুষ বিবি লন্ডনে এসে ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। আন্দালিব বিবিকে পাওয়ার আশায় মরিয়া হয়ে ছুটলেও বিবি তাকে এড়িয়ে চলে। অপমানিত ও ক্রুদ্ধ আন্দালিব বন্ধু কাদেরের কাছে বিবিকে বশে আনার পরামর্শ চায়। কিন্তু কাদের জানায়, ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী লন্ডনের নাগরিকদের ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ। একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে, আন্দালিবের এ বেদনা প্রশমিত হতে পারে বলে কাদের মনে করে। সে প্রতিবেশী আন্দালিবের বাড়ির মালিকের স্ত্রী অসমবয়সী মিসেস জলিলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে নিজেকে এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পরামর্শ দেয়। কাদের তাকে উদ্দেশ্য করে বলে: 'দাতব্য গৃহ হইতে শুরু হয়' (হক, ২০০১খ: ১৪২)। এই প্রবাদের মাধ্যমে

মূলত কাদেরের অস্বাভাবিক চিন্তাপ্রসূত কদর্য ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে।

খ. আন্দালিব তার ভালোবাসার মানুষ বিবিকে চোখের আড়াল হতে দিতে চায় না। বিবির আবাসস্থলে গিয়ে আন্দালিব জানতে পারে, সে টেড নামের যুবকের সঙ্গে লন্ডন ত্যাগ করেছে। টেড ও বিবির ব্যাপারে আন্দালিব জানতে চাইলে, রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার টিম বলেঃ "তাহারা হয় আঠা দ্বারা সংযুক্ত" (হক, ২০০১খ: ১৮০)। এই বাগধারাসদৃশ বাক্যের মাধ্যমে ম্যানেজার উভয়ের অন্তরঙ্গতা ও সম্পর্কের গভীরতা প্রকাশ করেছে।

বাংলায় কিছু শব্দ বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক উপন্যাসে এসব শব্দ অনেক সময় আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন: মানুষ তোমার আগুন আছে (হক, ২০০১গ: ২৭৩)। সাধারণত বিপ্লবী চেতনা ধারণকারী বা প্রতিবাদী ব্যক্তির স্বরূপ নির্দেশে 'আগুন' শব্দটির ব্যবহার করা হয়। তবে *মৃগয়ায় কালক্ষেপ* উপন্যাসে এক আফ্রিকান তরুণ আব্দুল হাদীর কাছে নিছক ধূম্রশলাকা জ্বালানোর উদ্দেশ্যে আগুন চেয়েছে: "মানুষ তোমার আগুন আছে?" (হক, ২০০১গ: ২৭৩)। এই বাক্যের মাধ্যমে নিতান্তই সাধারণ ভাবনা সঞ্চারিত হয়েছে।

শিল্পে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী সেলিম আল দীন তাঁর কথানাট্যের আঙ্গিক-নির্মাণ করেছেন একইসঙ্গে গল্প, কাব্য, সংগীত ও নাটকের সম্মিলনে। তেমনি সৈয়দ শামসুল হক কবিতার ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করেছেন আধুনিক উপন্যাস রচনায়। *অন্তর্গত* উপন্যাসে নিরীক্ষাধর্মী ফর্মের ব্যবহার মূলত তাঁর সচেতন শিল্পচেতনার দিকটি নির্দেশ করে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ শামসুল হকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> আমি মনে করি না, সাহিত্যের কোনো ফর্ম মৃত হয়ে যায়; আমি বিশ্বাস করি, একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ ফর্ম তার সমস্ত সম্ভবপরতা নিঃশেষিত করে ফেলে মাত্র; এবং নতুন সময়ে নতুন সম্ভবপরতা আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায় সে নেপথ্যে অপেক্ষা করে। তাহলে এই রচনার বর্ণনা হোক কথাকাব্য (হক, ১৯৯৫: সবিনয় নিবেদন)।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুক্তিযোদ্ধাদের করুণ পরিণতির বাস্তবোচিত রূপ ধৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। "অন্তর্গত স্বগত কথনের ভঙ্গিতে রচিত উপন্যাসে সৈয়দ শামসুল হক বাঙালিসত্তার সর্বগ্রাসী ক্রন্দন, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্ম-আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছেন" (খান, ১৯৯৭: ৩৪৯)। মান্দারবাড়ি গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আকবর হোসেনের অসীম সাহস ও বীরত্বগাঁথা সকলের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। আকবর হোসেনের সাক্ষাৎপ্রার্থী সাংবাদিকবৃন্দকে মুক্তিযোদ্ধা বাবুল সম্পর্কে সাবধান করে দেয় পথচারী তরুণ। কৌশলী বাবুল পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক চব্বিশজন বাঙালি হত্যার দায় চাপিয়ে দেয় আকবর হোসেনের কাঁধে। মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের অপরিসীম কৃতিত্ব ও আকাশচুম্বী খ্যাতিই তাকে ঈর্ষাকাতর করে তুলেছিল। আব্দুর রহমান ও শেফালির মিথ্যা সাক্ষ্যের

কারণে অভিযুক্ত আকবর হোসেনকে নিরাপত্তার অজুহাতে গৃহবন্দি করে রাখে সে। প্রতারক বাবুলের কৈফিয়ত উঠে আসে 'আমাদের' নামক এক সত্তার স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে। জাতির শ্রেষ্ঠসন্তান আকবর হোসেনের নিঃসঙ্গতা ও বন্দিদশার নির্মম চিত্র পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে কথাকাব্যের আদলে শিল্পিত হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হকের *যদি পাই পুনরাবৃত্তেই* কাব্যগ্রন্থে এমন পুনরাবৃত্তির সন্ধান মেলে। তিনি শব্দের রদবদল করে কাব্যভাষায় ভিন্নধর্মী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন। এই গ্রন্থের ১০ সংখ্যক পুনরাবৃত্তিমূলক কবিতার মধ্য দিয়ে কবির অন্তর্গত অনুভব শব্দরূপ লাভ করেছে:

সবুজ মেঘের তুমি	হলুদ মেঘের
হলুদ মেঘের তুমি	ধূসর মেঘের
ধূসর মেঘের তুমি	মেঘের শাড়িতে
কার্তিকের চাঁদ তুমি	রতির রাতের
রতির রাতের তুমি	তুমুল বৃষ্টির
তুমুল বৃষ্টির তুমি	সবুজ ঘাসের
সবুজ ঘাসের তুমি	রতির বৃষ্টির
রতির বৃষ্টির তুমি	ঊষর দেহের
ঊষর দেহের তুমি	জীবন প্রান্তের (হক, ২০১২খ: "১০" সংখ্যক কবিতা)।

যদি পাই পুনরাবৃত্তেই কাব্যগ্রন্থের ভাষাশৈলীর সঙ্গে অন্তর্গত উপন্যাসের ভাষাকাঠামোয় সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দ ব্যবহারের কারণে সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাসের ভাষা আরও বেশি সংবেদনময় হয়ে ওঠে। ফলে চরিত্রের অন্তর্দেশ রূপায়ণে তা অধিক ক্রিয়াশীল বলে প্রতীয়মান হয়:

এক মুহূর্তের জন্যে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়বে বাবুল,
এখন সে তার ক্রোধটাকে গোপন করবে
এবং হেসে ফেলে আমাদের বলবে,
'আমি তাকে ভালোবাসি।
আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি।
আমার চেয়ে বেশি কেউ তাকে ভালোবাসে না।
আমি তাকে ভালোবাসি বলেই
তার বিপদে আজ পাশে দাঁড়িয়েছি,
যেমন বহুবার আমি দাঁড়িয়েছি।'
'বিপদ?'
'বলতে পারেন, তার নিরাপত্তার জন্যই আমি,
বলেছি তাকে বাড়ির বাইরে না আসতে।
পাছে কেউ কিছু করতে উদ্যত হয়,
আমি কিছু ছেলেকে পাহারায় বসিয়েছি।'
পাহারা
'না, সে বন্দি নয়।
না, বন্দি তাকে করা হয় নি,
যদিও সাক্ষীদের জবানবন্দি দেখে
ভারতীয়রা তাকে বন্দিই করতে চেয়েছিল।

আমি তাকে ভালোবাসি, তাই বাধা দিই।
আমিই আপনাদের নিয়ে যাব তার কাছে।
আসুন, পায়ে হেঁটেই যাওয়া যাক' (হক, ২০০৪খ: ২০১)।

বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের *আয়না বিবির পালা* নামে একটি প্রাচীন গাথা প্রচলিত আছে। মামুদ উজ্জ্যাল ও আয়না বিবির যে গাথা বহুকাল ধরে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রেখেছে সৈয়দ শামসুল হক তাকে নবরূপ দিয়েছেন। তিনি বলেন: ''মনে পড়ছে, ময়মনসিংহে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে এক যাত্রাপালা দেখে কীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম এর অন্তঃসারকে আজো আমাদের ভেতরে আবিষ্কার করে '*আয়না বিবির পালা*' লিখেছিলাম'' (হক, ২০০২গ: ভূমিকা)। প্রাচীন গাথা কাহিনির আঙ্গিকে গড়ে ওঠা উপন্যাসে তিনি যুক্ত করেছেন একালের কাহিনি। বন্ধু জামালের কুপরামর্শে আরব দেশে গিয়ে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করার লোভে মামুদ উজ্জ্যাল তার স্ত্রী আয়না বিবিকে ঘরে রেখে রওয়ানা দেয়। এই সুযোগে জামাল আয়নাকে হস্তগত করার চেষ্টা করে। উত্তাল নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আয়না নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করে। অন্যদিকে মামুদ উজ্জ্যাল বিদেশে যেতে না পেরে ফিরে আসে নিজ গ্রামে এবং আয়নাকে অসতী অপবাদ দিয়ে ত্যাগ করে। আয়নাকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে মামুদ উজ্জ্যাল। তাকে পতিতাপল্লিতে বিক্রি করে দেয়। মামুদ উজ্জ্যালের লোভ ও হঠকারী আচরণ তাকে চূড়ান্ত অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়। উদ্ভ্রান্ত মামুদ উজ্জ্যালের অসংলগ্ন কার্যকলাপের পেছনে ক্রিয়াশীল মনোজগতের গতি-প্রকৃতি চিত্রণের প্রয়াসে ঔপন্যাসিক স্বতন্ত্র ভাষাশৈলী ব্যবহার করেছেন:

তুমি কী কর উজ্জ্যাল? নিজের হাতে যে ঘর তুমি একদিন তুলেছিলে, সেই ঘরের চাল টেনে নামাও?

তুমি কী কর, উজ্জ্যাল? নিজের হাতে সুন্দি বেতে যে বাঁধন তুমি দিয়েছিলে, সেই বাঁধন খুলে বেড়ার পাটি নদীর পানিতে ভাসিয়ে দাও?

তুমি কী কর, উজ্জ্যাল? নিজের যে গাভীর গলায় তুমি মিঠা ঘুঙুর বেঁধে দিয়েছিলে, সেই ঘুঙুরের দুল ছিঁড়ে তুমি শ্মশানে ফেলে দাও?

এই উনুন নিজের হাতে বানিয়েছিল একজন; মামুদ পদাঘাতে তার ঝিক ভেঙে দেয়।

এই ছিকা নিজের হাতে বুনেছিল একজন, মামুদ কঠিন হাতে ছিঁড়ে নামায়।

এই নকশি কাঁথা নিজের হাতে সীবন করেছিল একজন, মামুদ দারুণ রোষে আগুন ধরিয়ে দেয়। সমস্ত বাড়িটাই এক নিশীথে দাউদাউ করে আগুনে জ্বলে ওঠে (হক, ২০০২গ: ৮৩)।

পালাকার মনসুর বয়াতি ও চাঁদ সুলতানার কাল্পনিক প্রেমের কাহিনি অবলম্বনে গড়ে উঠেছে *বুকঝিম এক ভালোবাসা* উপন্যাস। বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় ময়মনসিংহ গীতিকার আদলে তিনি গড়ে তুলেছেন এই উপন্যাস। ঔপন্যাসিক প্রাচীন পালাকারের মতো গানের সংলাপ, কবিতার ভঙ্গি এমনকি পরিবেশন রীতিও গ্রহণ

করেছেন। তিনি পালাগানের নাটকীয়তা, সংগীতময়তা ও বর্ণনা-কৌশল গ্রহণ করে একটি নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস গড়ে তুলেছেন (আহসান, ২০০৮: ৩৫৫)। উপন্যাসে চাঁদ সুলতানা ও মনসুর বয়াতির অসম ভালোবাসা মেনে নেয়নি চাঁদ সুলতানার ভাই জমিদার মহব্বত জঙ। মহব্বত জঙ হত্যার উদ্দেশ্যে মনসুর বয়াতিকে ধরে এনে বিষ দিয়ে তার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়। বন্ধু ফিরোজ দেওয়ানের সঙ্গে অচেতন অবস্থায় চাঁদ সুলতানার বিবাহ সম্পন্ন হয়। চেতনা ফিরে পেয়ে চাঁদ প্রতিজ্ঞা করে মনসুর বয়াতির মতো সেও বোবা হয়ে থাকবে সারাজীবন। চাঁদ সুলতানার অন্তর্গত অনুভূতি প্রকাশ করতে ঔপন্যাসিকের ব্যবহৃত ভাষাভঙ্গি:

> লোকসকল, চাঁদের যখন চেতন আসে আবার ফিরে, মনে মনে একটি কথাই সে বলে, কী বলে? আহা, সে এই বলে, যে গান ছিল তার জীবন সেই গান আর সে গাইতে পারে না। কথা বলতে পারে না। না জানি কত কষ্ট তার। না জানি কতখণ্ডে চূর্ণ তার হিয়া। আমি রাখিব পরান আমার পরানে বান্ধিয়া। আমারই কারণে তার এই অভিশাপ। আমিও তবে কোনোদিন আর এই মানব-মুখে একটি শব্দও উচ্চারণ করব না। বোবা হয়ে থাকব আমিও। বোবা হয়ে আমি সেই বোবার কষ্ট নিজের কষ্ট করে নেব (হক, ২০০৪ক: ৪৫)।

বিষয়, পরিবেশ ও চরিত্রানুযায়ী সংলাপ-নিমার্ণে তিনি ছিলেন কুশলী শিল্পী। গল্প-উপন্যাসে চরিত্রের অন্তর্মানস সংলাপের অন্তর্বয়নে তুলে ধরেছেন সৈয়দ শামসুল হক। ব্যক্তির মনোজগৎ রূপায়ণে তাঁর প্রযুক্ত সংলাপ প্রশংসার দাবি রাখে।

শুধু কাব্যের ক্ষেত্রে নয় কথাসাহিত্যেও অলংকার এক প্রকার ভাষা হিসেবে গণ্য হয়। ‘‘ভাষার মূর্তরূপে শব্দালংকার আর ভাবরূপে অর্থালংকারের প্রাচুর্য দেখা যায়’’ (পাল, ২০১৫: ১৪৪) বাক্যে অলংকারের সার্থক প্রয়োগ বাক্যকে করে তোলে অর্থবহ, নান্দনিক। সৈয়দ শামসুল হকের সৃষ্ট অলংকারে ব্যক্তির অন্তর্ময় মনোজগতের প্রতিক্রিয়াসমূহ পরিস্ফুট হয়েছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ইত্যাদি অলংকারের যথাযথ প্রয়োগে তার ভাষা হয়ে ওঠে মনোময়।

উপমার ব্যবহার

উপমা সাহিত্যের ভাষাদেহে সৌন্দর্য বর্ধনের অন্যতম একটি অবলম্বন। উপমার যথোপযুক্ত ব্যবহারের ভাষায় প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সাহিত্যে উপমার অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে কবি বুদ্ধদেব বসু বলেন, ‘‘উপমা বাদ দিলে ভাষার প্রকাশশক্তি খর্ব হয়ে পড়ে’’ (বসু, ১৩৮৯: ৫৭)। তুলনা অর্থে ব্যবহৃত উপমার কাজ অলংকরণ। ভাবকে মধুর সৌন্দর্যমণ্ডিত করে প্রকাশ করতে কবি উপমার আশ্রয় নেন। তেমনি বক্তব্যকে সুস্পষ্ট ও যথার্থ করতে, আবেগকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ভাবকে মূর্তিতে রূপান্তরিত করতে গদ্যলেখক উপমা ব্যবহার করেন। সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস ও গল্পে ব্যবহৃত উপমার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে চরিত্রের অন্তর্গত প্রবণতা ও তাঁর মানস পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

বাঙালিরা প্রবাসে টিকে থাকার লক্ষ্যে নিরন্তর শ্রমসাধ্য কাজে লিপ্ত থাকে। এর বিনিময়ে তারা তাদের সন্তান ও পরিজনের সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চিত করতে চায়। বিদেশের পটভূমিতে গড়ে ওঠা *বালিকার চন্দ্রযান* উপন্যাসে দেখা যায়, প্রবাসে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরা অতিমাত্রায় স্বাধীনচেতা ও বাঙালি সংস্কৃতি-পরিপন্থি কাজে ন্যস্ত থাকে। বাবা-মায়ের সিদ্ধান্তের উপর তারা আস্থা রাখতে পারে না। ফলে তারা এক আদিম ও উদ্দাম জীবন-যাপনে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। লন্ডনে বেড়ে ওঠা মিস্টার আলীর মেয়ে ইয়াসমিন বাবার পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করার ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং ভিনদেশি এক যুবকের সঙ্গে লিভ টুগেদার করে। নিজের মেয়ের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার খবরে মুষড়ে পড়ে মিস্টার আলী। একজন পিতার অসহায়ত্ব ও গভীর মনোবেদনা মূর্ত করার প্রয়োজনে লেখক উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। একজন বিষাদাক্রান্ত পিতার অভিব্যক্তিকে বিশেষ করে তার ব্যর্থতাবোধকে লেখক অভাবনীয় উপমায় উদ্ভাসিত করেছেন: "ব্যর্থতাবোধ বাদুরের মতো ঝুলে থাকে। দুহাতে মাথার দুপাশ ধরে তিনি কতক্ষণ বসে থাকেন, চেতনা থাকে না" (হক, ২০০১ক: ৫১)। বাঁদুর নিশাচর প্রাণী; সে রাতের অন্ধকারে সচল হয়ে ওঠে। মিস্টার আলীর জীবনের ব্যর্থতাকে লেখক আঁধারের প্রাণী বাদুড়ের উপমায় রূপময় করে তুলেছেন।

'নাম' গল্পের দরিদ্র আশরাফ বিত্তবান বন্ধু হুরমতের সাহায্য ও সাহচর্যে দিনাতিপাত করছিল। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার জন্য আশরাফ বন্ধুর কাছে একটা কোট ধার করেছিল সে। কোটটা গায়ে দেয়া মাত্র তার নাকে প্রবেশ করে মিষ্টি একটা ঘ্রাণ। বন্ধুর দামি কোটের ঘ্রাণ তাকে ঈর্ষাকাতর করে তোলে। আশরাফের ঈর্ষাকাতর মানসকে অভিব্যক্তি দানের জন্যে লেখক নিম্নরূপ উপমা ব্যবহার করেন: ''হুরমতকে এই প্রথম, সে ঈর্ষা করে। ঈর্ষায় তার আঙুলগুলো শক্ত হয়ে ওঠে সাঁড়াশীর মতো পাকাতে থাকে'' (হক, ২০১৭খ: ২৩৭)। কপর্দকহীন আশরাফ হুরমতের সমতুল্য হতে পারে না কিছুতেই। ঈর্ষার অনুভূতি তার দেহে কীভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা এই উপমার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে।

অনুপম দিন উপন্যাসে মেজ চাচার বাড়িতে আশ্রিত থাকে বীথি। একই বাড়িতে অবস্থানরত চাচাতো ভাই আবু ও বীথির সম্পর্ক নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কানাঘুষা চলতে থাকে। যদিও আবুর মা মরিয়ম বীথিকে খুব ভালোবাসে, কন্যাসম বীথি তার হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। বীথির বাবার পরামর্শে বীথিকে তার বড়োচাচা খোরশেদ চৌধুরী নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। বাৎসল্য স্নেহে কাতর মরিয়মের অন্তঃস্থ বেদনা বোঝাতে লেখক নিমগাছের উপমার আশ্রয় নিয়েছে: ''বিরাট নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে অশান্ত পাতাগুলোর মতো মরিয়মের ভেতরটা হু হু করে ওঠে'' (হক, ২০১৪: ৩৬২)। গাছের পাতা স্বভাবতই গতিশীল, চঞ্চল। মরিয়মের বেদনার তীব্রতা গল্পকার গাছের পাতার চাঞ্চল্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

'তাস' গল্পে খোকনের মা সালেহার নিঃসঙ্গতা রাতের অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও গভীরতর হয়ে ওঠে। এক একটি রাত তার জীবনে হাজির হয় বিমর্ষতা ও বিষণ্নতার প্রতীক হয়ে। বাড়ির সবাই যখন ঘুমে অচেতন তখন সে পুরনো স্মৃতি হাতড়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে। সারাদিন পর স্বামীহারা সালেহার শ্রান্ত মনে ভিড় করে খোকনের নির্লিপ্ততা, নতুন তাসের প্যাকেট আর দেয়াল ঘড়িটি। বিমর্ষ সালেহার অন্তর্গত হাহাকার রূপায়িত করার প্রয়াসে গল্পকার লেখেন: "গোটা পৃথিবী যখন ঘুমে অচেতন, যখন রাত কুটিল সরীসৃপের মতো শুধু বাড়ছে, তখন মার মনে সারাদিনের সেই অদ্ভুত, পরস্পরবিরোধী চিন্তাগুলো এসে ভিড় করে দাঁড়াল" (হক, ২০১৭খ: ৬৮)। সরীসৃপ অন্য প্রাণীর দেহে বিষ ছড়ায়। বিষাদময় রাতের আঁধারে মায়ের অন্তর্যন্ত্রণাকে রূপায়িত করার জন্যে সৈয়দ শামসুল হক রাতের সঙ্গে সরীসৃপের তুলনা করে উপমা নির্মাণ করেছেন।

উপমা ব্যক্তির উপলব্ধির দরজায় নতুন ও নান্দনিক প্রত্যাশা জাগিয়ে দেয়। কেবল শিল্পসফলতার জন্যে নয়, কল্পনাকে ধারণ করার জন্যেও গল্প-উপন্যাসে উপমা ব্যবহার করা হয়। সৈয়দ শামসুল হক কথাসাহিত্যে মনোবাস্তবতা রূপায়ণে উপমাকে আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর সৃষ্ট উপমা চরিত্রসমূহের আবেগকে শব্দসূত্রে বাঙ্ময় করে তুলেছে।

উৎপ্রেক্ষা-সৃজন

কথাসাহিত্যের ভাষায় উৎপ্রেক্ষার সার্থক ব্যবহার ভাষায় নতুন মাত্রা দিতে পারে। উৎপ্রেক্ষা শুধু অলংকার নয় বরং কবির গভীরতম উপলব্ধির নিবিড়তম প্রকাশ। উৎপ্রেক্ষা শব্দের অর্থ উৎকট জ্ঞান। প্রবল সাদৃশ্যবশত উপমেয়কে উপমান বলে যদি উৎকট সংশয় জন্মে, তবে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয় (গণাই, ২০০৮: ৩৫)। উৎপ্রেক্ষা সম্বন্ধে জর্জ হোয়েলীর *Poetic Process* গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন জন প্রেস তাঁর *দি চেকার্ড শেড* (১৯৬৫) নামক গ্রন্থে:

> যে উৎপ্রেক্ষা আমাদের দৃষ্টিকে বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে সুনিশ্চয়ভাবে নির্দেশিত করে সে উৎপ্রেক্ষায় অসাধারণ স্বচ্ছতার প্রয়োজন, কিন্তু সে স্বচ্ছতা অনেকটা দৃষ্টিগত, সুস্থির এবং হয়তো বা অচঞ্চল। যাকে আমি যথার্থ উৎপ্রেক্ষা বলি সে উৎপ্রেক্ষা শ্রবণ মাত্রই আমাদের কানে অনুরণন তুলবে। সে উৎপ্রেক্ষা সর্বব্যাপ্ত হবে এবং ধ্বনি এবং আলোতে পরিণত হয়ে কবিতার সর্ব অবয়বকে উদ্ভাসিত ও সচকিত করবে (আহসান, ১৯৮৫: ৬৭)।

উৎপ্রেক্ষা অলংকারের কারণে কবিতার ন্যায় গদ্যের পাঠকের অনুভূতিতেও নতুন চেতনা জাগরিত হয়। এক কথায় বলা চলে, পাঠকের চিন্তা এবং বোধ উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে নতুন ব্যাখ্যা খুঁজে পায়। সৈয়দ শামসুল হকের রচনায় উপমার মতো উৎপ্রেক্ষার বহুল ব্যবহার নেই। বিষয়ের প্রয়োজনে কিছু কিছু গল্প-উপন্যাসে তিনি মানব স্বভাবের অন্তর্ময় রূপ উৎপ্রেক্ষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। *তুমি সেই তরবারি*

উপন্যাসে লন্ডনে বসবাসরত সাকিনা ও কাশেমের সংসারে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকে বেলাল। বেলালের সঙ্গে বাড়ির বাইরে বাজারে গিয়েও সাকিনা স্বামী কাশেমের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সাকিনার আচরণে স্বামীর প্রতি গভীর অনুরাগ অপ্রকাশ্য থাকে না বেলালের কাছে। ঈর্ষান্বিত বেলালের অন্তর্গত মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে নিচের উৎপ্রেক্ষাটির মধ্য দিয়ে:

> বারবার এই ভালবাসার কথা না বললেই নয়? না হয় ভালোই বাসে, তাই বলে সারাক্ষণ সেটা বলতে হবে? যেন একটা বাচ্চা মেয়ে, খেলনার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না (হক, ২০১৭গ: ২৩৭-২৩৮)।

খেলনাপ্রিয় শিশুর মনোজগতের সঙ্গে সাকিনার মনস্তত্ত্বকে মিলিয়ে দেন লেখক এই উৎপ্রেক্ষাটির মধ্য দিয়ে।

আয়না বিবির পালা উপন্যাসে মামুদ উজ্জ্যালের বিদেশ ফেরত বন্ধু জামালের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে তার সুন্দরী স্ত্রী আয়নার প্রতি। সে মামুদকে আরব দেশে যাওয়ার জন্য নানাভাবে প্রলুব্ধ করে। যাতে জামালের অনুপস্থিতিতে সে আয়নার ঘনিষ্ঠ হতে পারে। নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে জামাল মামুদ উজ্জ্যালের বাড়িতে গেলে আয়না তার জন্য আসন পেতে দেয়। আয়নার সৌন্দর্যে বিমোহিত জামাল ইচ্ছা করে আয়নার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি করে। অপ্রস্তুত আয়না দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করে। লম্পট জামালের মানসিকতা নিচের উৎপ্রেক্ষাটির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে:

> দাওয়ায় উঠে আয়নার হাত থেকে আসন নেবার সময় জামালের সঙ্গে হাত ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়; তড়বড় করে সরে যায় আয়না, জামালের বড় মিঠে লাগে সেই চলে যাবার ভঙ্গি, নবীন মাছ যেন মানুষের সাড়া পেয়ে তলতল করে পানির ভেতরে হারিয়ে যায় (হক, ২০০২গ: ৬৮)

জামালের চরিত্রের সঙ্গে ধূর্ত মাছ শিকারির তুলনা করতে তিনি এই উৎপ্রেক্ষাটি ব্যবহার করেছেন।

'শরবতির পাশ ফেরা' গল্পে জলেশ্বরীর হযরত শাহ সৈয়দ কুতুব উদ্দিনের মাজারের সিঁড়িতে শরবতি নামের এক পাগল নারীকে বিবস্ত্র অবস্থায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। মাজারের মতো জনবহুল স্থানে শরবতিকে দেখে আগত মুসল্লিদের চোখ আটকে যায়। নিজেদের দৃষ্টি অবনত করা উচিত বলে মনে করলেও, তারা তাদের মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। একজন মস্তিষ্কবিকৃত যুবতী নারীর শরীর দেখার লোভ সামলাতে না পারা আগন্তুকদের মনস্তত্ত্ব বোঝাতে গল্পকার উৎপ্রেক্ষার সাহায্য নেন: ''ক্রমে ক্রমে জলেশ্বরীর যত চোখ আছে সব চোখ শরবতির উলঙ্গ দেহের উপর ওড়াউড়ি করে, যেন বা হলদে প্রজাপতির বুনো ফুলের চারদিকে'' (হক, ২০১৭খ: ৫১১)। শরবতির দেহে তিনি বুনো ফুলের সৌন্দর্য আরোপ করেছেন যার লোভে প্রজাপতি ভিড় করে। এই উৎপ্রেক্ষার মধ্য দিয়ে শরবতির দেহের প্রতি পুরুষের লালসার দিকটি প্রস্ফুটিত

হয়েছে।

'পতন' গল্পে বুড়িরচরের বাদশা মিয়া তার মায়ের অনুরোধে মামাবাড়ি গিয়ে সম্পত্তিতে মায়ের ভাগ দাবি করে। অভাবের সংসারে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বাদশা মিয়ার মা, তাকে ভাইদের কাছে সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিল। মামারা তাকে সাহায্য করেনি, বরং অপমান করেছে। বাদশা মিয়ার বিশ্বাস তার মামারা কোনো সাহায্য করেনি একথা জেনেও তার মায়ের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না। বাদশা মিয়ার মায়ের অন্তর্গত প্রবণতা বোঝাতে গল্পকার উৎপ্রেক্ষার সৃষ্টি করেন: ''আমার মায়ের শরীরে রাগ ফাগ বলতে কিছু নাই, আল্লাহ যেন তাকে জগতের ঘন দুধ থেকে তোলা মাখন দিয়ে তৈরি করেছেন'' (হক, ২০১৭ঘ: ৫৫)। মাখনের নমনীয়তার সঙ্গে বাদশা মিয়ার মায়ের স্বভাবের তুলনা করতে গল্পকার এই উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেছেন।

সৈয়দ শামসুল হকের গল্প-উপন্যাসে ব্যবহৃত উৎপ্রেক্ষাসমূহ বাস্তব অভিজ্ঞতা-জারিত। উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিষয় ও পরিপ্রেক্ষিত সচেতন। মানবস্বভাবের অন্তর্গত বিবিধ অভিব্যক্তির চিহ্নায়নে তিনি উৎপ্রেক্ষার আশ্রয় নিয়েছেন।

চিত্রকল্প-নির্মাণ

ইংরেজি Image-এর প্রতিশব্দ হিসেবে চিত্রকল্প শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। "চিত্র হচ্ছে ভাষার রঙে ছবি আঁকা। আর তার সঙ্গে ভাবনা-কল্পনার সম্মিলন ঘটলে নির্মিত হয় চিত্রকল্প" (বাগচী, ২০১৫: ৪২৬)। সাহিত্যিকের অন্তর্গত অভিজ্ঞতা, সংবেদনা তার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত হয় চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে। এজরা পাউন্ড চিত্রকল্প সম্পর্কে বলেছেন, 'ইমেজ' বা 'চিত্রকল্প' বুদ্ধি এবং আবেগের সমন্বয়ে মুহূর্তের মধ্যে বিচিত্র বক্তব্যের এক সমন্বিত প্রকাশরূপ আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে'' (ঠাকুরতা, ১৪২১: ১৩)। একটি সার্থক চিত্রকল্প শত পৃষ্ঠা বর্ণনার চেয়েও বেশি কার্যকর। কবিদের মতো কথাশিল্পীরাও চিত্রকল্পের মাধ্যমে পরিপার্শ্বকে দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। তারা ভাষার মাধ্যমে ভাবনাকে দৃশ্যায়িত করেন, স্মৃতিকে জাগ্রত করেন। একজন সাহিত্যশিল্পীর শক্তিমত্তা নির্ভর করে চিত্রকল্প তৈরির দক্ষতার ওপরে। সৈয়দ শামসুল হকের মতে: ''গল্প পড়তে পড়তে যিনি ছবি না দেখে ওঠেন, মুখ না অনুভব করেন- বুঝতে হবে গলদ একটা আছে কোথাও। আমি এর জন্য পাঠককে দায়ী করবার বদলে লেখককেই করবো। বলবো, লেখকই পাঠাতে পারেননি সংকেত'' (হক, ২০০৫: ৬৭)। বিচিত্র অনুভবের স্রষ্টা সৈয়দ শামসুল হক স্নেহপরায়ণ মানবহৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশের লক্ষ্যে চিত্রকল্পের দ্বারস্থ হয়েছেন। গার্হস্থ্য জীবনে তুচ্ছ আবেগ, বাৎসল্য, মমত্বের যে রূপকল্প তিনি নির্মাণ করেন তা তিরিশের দশকের নঞর্থক জীবনবোধের বিপরীতে রাবীন্দ্রিকবোধের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পোস্টমাস্টার' গল্পে যাপিত জীবনের সাধারণ গৃহকর্ম ও প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের সঙ্গে মানবহৃদয়ের স্নেহকাতরতা ও সঙ্গপ্রিয়তার অনভূতিকে একাত্ম করে চিত্রকল্পের কাঠামোয় প্রকাশ করেছেন। গল্পে পোস্টমাস্টারের রতনকে নিজ পরিবারে

ফিরে যাবার খবর জানানোর পরের মুহূর্তের চিত্র এভাবে প্রকাশিত হয়েছে:

> পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না (ঠাকুর, ১৯৯৬: ১৬)।

অনুরূপভাবে মানবমনের অন্তর্গূঢ় চেতনা প্রকাশক সৈয়দ শামসুল হকের 'হিজল কাঠের নাও' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। যেখানে মমতাময়ী মা হামিদা বানু কন্যা শাফিনাজের সঙ্গে বিচ্ছেদ ভাবনায় শঙ্কিত। বিয়ের পরে মেয়ে স্বামীর বাড়িতে চলে যাবে। বাৎসল্যপরায়ণ মায়ের হৃদয়ার্তি প্রকাশে লেখক গৃহস্থালি কাজ ও বৃষ্টির চিত্রকল্পের আশ্রয় নিয়েছেন।

> ওপাশের উনুনে নিমকি ভাজছে শাফিনাজ নিজে। ওর হাতের ময়দা হামিদা বানুর চেয়েও ভালো হয়। এপাশে চায়ের পানিতে বলক উঠছে তার সামনে। আর কি সরল ছেলে দেখো আখতার, প্যান্ট শার্ট শুদ্ধু এসে বসেছে রান্নাঘরের সামনে চৌকাঠের পাশেই। হয়তো বলবে : উঁহু, কেতলিতে আরও খানিকটা চা পাতা ঢালুন, খালা-আম্মা। লিকার একটু কড়া হলেই আমার পছন্দ। আখতারের খালা-আম্মা আরো খানিকটা পাতা ঢেলে দেবেন প্যাকেট থেকে। হাসবেন। আপনজনের মতো হাসবেন। ডানপাশে চোখ ফেরালে হামিদা বানু দেখতে পেতেন শাফিনাজ বুড়ো আঙ্গুল মুখের ভেতরে পুরে হাসছে। আলমিরা থেকে নামানো কাপে তিনি কেতলি থেকে গাঢ় লিকার ঢেলে দেবেন। আগুনের মতো লাল। বাইরে ততক্ষণে আকাশেও আগুন ধরে গেছে। কখনো কখনো দুয়োরানির কুঁড়েঘরের প্রাসাদে আকাশ বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে (হক, ২০১৭খ: ৩৪)।

নিষিদ্ধ লোবান উপন্যাসে বিলকিস ও প্রদীপ ওরফে সিরাজ মিলিটারির হাতে ধরা পড়ার পর, বিলকিস সিরাজকে নিজের ভাই বলে পরিচয় দেয়। প্রদীপের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে মেজর ধরে নেয় বিলকিসও হিন্দুধর্মাবলম্বী। নপুংসক মেজর প্রদীপকে হত্যা করে বিলকিসকে ভোগ করতে চায়। বিলকিস শর্ত আরোপ করে, প্রদীপের দেহ সঠিক নিয়মে সৎকার করার সুযোগ পেলে সে মেজরের মনোবাসনা পূর্ণ করবে। নির্বিকার ভঙ্গিতে সে তার সহযোদ্ধা ভাইয়ের সৎকারের আয়োজন করে। বিলকিসের অন্তর্গত অপরিসীম ক্রোধ ও শোক যেন সহসা তাকে এক অপরিসীম শক্তি দান করে। ঔপন্যাসিক নিপুণ চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তুলেছেন বিলকিসের বিধ্বস্ত মনোজগৎ:

> বিলকিস কখনো চিতা রচনা দূরে থাক, দাহ-সৎকার পর্যন্ত দ্যাখেনি। মানুষের রক্তের ভেতরে মৌলিক কিছু কর্তব্য সম্পাদনের নীল-নকশা থাকে। বিলকিস নীরবে দ্রুত হাতে কাঠগুলো বিছানার মতো করে সাজায়। উনোনে কাঠ দেবার স্মরণে সে দুসারি কাঠ ঢালু করে সাজায়, যেন আগুনের বিস্তার সহজ ও সতেজ হয়। তারপর মেজরের দিকে তাকায়। মেজরের নিঃশব্দ ইশারা পেয়ে বিহারী ছোকরাগুলো প্রদীপকে ভ্যান থেকে নামিয়ে আনে। চিতার দিকে এগোয় তারা। চিতার কাছে, বিলকিসের পাশে দাঁড়িয়ে তারা মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে। অচিরে বিলকিসের নীরব অথচ স্পষ্ট নির্দেশ পেয়ে

লাশটিকে তারা চিতার ওপর শুইয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে সরে যায়। তারা আগের জায়গায় ফিরে না গিয়ে আরো দূরে ভ্যানের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় (হক, ২০০১ঘ: ২৪০)।

লেখকের ঔৎসুক্য ও অভীপ্সা শব্দচিত্রের মাধ্যমে সাহিত্যে বহুমাত্রিক বোধ উৎপন্ন করে। দৃশ্যমানতা চিত্রকল্পের প্রধান গুণ হলেও চিত্রকল্পকে সবসময় প্রকটভাবে দৃশ্যময়ই হতে হবে এমন কথা নেই। কখনো কখনো মানুষের অনুভূতি ও বিশ্বাস হতে চিত্রকল্প তৈরি হতে পারে। যার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় চরিত্রের অন্তর্গত বোধ। চিত্রকল্পের মাধ্যমে এ বোধের সফল প্রকাশে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক।

সৈয়দ শামসুল হকের কথাসাহিত্যের ভাষা এক সক্রিয়, জীবন্ত ও মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির মাধ্যম। সৃজনীক্ষমতার গুণে তাঁর রচনায় ভাষা কেবল ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে সীমায়িত থাকেনি, বরং মানবসত্তার অভ্যন্তরস্থ অনুভূতি, আনন্দ-বেদনা, দ্বন্দ্ব, সংকট ও আত্মসংঘাত প্রকাশের এক শিল্পমাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ভাষার প্রতিটি উপাদান ও অলঙ্কারে মনস্তত্ত্বের যথাযথ প্রয়োগে তিনি প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। শব্দ-ব্যবহার, সংলাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি চরিত্রের অন্তর্ময় ভাব প্রকাশক্ষম ধ্বনি ব্যবহার করেন। এছাড়া আঞ্চলিক শব্দের সচেতন প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি চরিত্রের আত্মস্বরূপকে আরও স্পষ্ট করে তোলেন। উপমা ও উৎপ্রেক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি ভাগ্যবিড়ম্বিত, যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের নানারকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করেছেন। অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ব্যক্তির অন্তর্গত অভিব্যক্তি রূপময় হয়ে উঠেছে চিত্রকল্পের মাধ্যমে। এভাবেই তাঁর কথা সাহিত্যের নির্মিত ভাষা হয়েছে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব অনুগামী।

তথ্য-নির্দেশ

আনোয়ার, চন্দন। (২০১৫)। *হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য: বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণকৌশল*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

আহসান, মোস্তফা তারিকুল। (২০০৮)। *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

আহসান, মোস্তফা তারিকুল। (২০১৫)। উপন্যাসের ভাষা: প্রসঙ্গ সৈয়দ শামসুল হক। খান, শামসুজ্জামান, তালুকদার, জাকির ও মজিদ, পিয়াস (সম্পা.), *জলেশ্বরীর জাদুকর: সৈয়দ শামসুল হক সম্মাননা সংকলন*। কথাপ্রকাশ: ঢাকা।

আহসান, সৈয়দ আলী। (১৩৭৫)। *কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা*। বইঘর: চট্টগ্রাম।

আহসান, সৈয়দ আলী। (১৯৮৫)। *কবিতার রূপকল্প*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

খান, রফিকউল্লাহ। (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

গণাই, অমরেন্দ্র। (২০০৮)। *অলংকার*। ভাষা ও সাহিত্য: কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। (২০১১)। *উপন্যাসের রূপরীতি*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯৯৬)। আবু সায়ীদ, আব্দুল্লাহ (সম্পা.), *শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প*। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র: ঢাকা।

ঠাকুরতা, অঞ্জনা গুহ। (১৪২১)। *সময়ের চিত্রকল্প চল্লিশের চারজন কবি*। দিবারাত্রির কাব্য: কলকাতা।

পাল, মৌসুমী। (২০১৫)। *রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প: বিষয় ও রূপরীতি*। অক্ষর পাবলিকশানস: ত্রিপুরা।

বসু, বুদ্ধদেব। (১৩৮৯)। *রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য*। নিউ এজ পাবলিশার্স: কলকাতা।

বাগচী, তপন। (২০১৫)। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতা: শিল্প বিবেচনা। বরকত, হিমেল (সম্পা.), *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ*। অক্ষর প্রকাশনী: ঢাকা।

শ, রামেশ্বর। (১৩৯০)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা।* প্রথম খণ্ড। পুস্তক বিপণি: কলকাতা।

শিকদার, সৌরভ। (২০০৪)। *কথাসাহিত্যের শিল্পরূপ ও ভাষাশৈলী*। খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি: ঢাকা।

হক, সৈয়দ শামসুল। (২০১৭ক)। *কথা সামান্যই*। সাহিত্য প্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০১৭খ)। *গল্পসংগ্রহ ১*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

——————। (২০১৭গ)। তুমি সেই তরবারি। *উপন্যাস সমগ্র-৩*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০১৭ঘ)। *গল্পসংগ্রহ ২*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

——————। (২০১৭ঙ)। *গল্পসংগ্রহ ৩*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

——————। (২০১৬)। কথাসাহিত্যের বিচিত্র জগৎ। (সাক্ষাৎকার গ্রহণ: কামাল, আহমাদ মোস্তফা)। আহমাদ, মাসউদ (সম্পা.), *গল্পপত্র*, বর্ষ: ৬, সংখ্যা: ৯। ঢাকা।

——————। (২০১৪)। অনুপম দিন। *উপন্যাস সমগ্র-১*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০১৩)। কেরানিও দৌড়ে ছিল। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০১২ক)। *বারো দিনের শিশু*। উপন্যাস সমগ্র-১০। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০১২খ)। *যদি পাই পুনরাবৃত্তেই*। শুদ্ধস্বর: ঢাকা।

——————। (২০০৭ক)। চোখবাজি। *উপন্যাস সমগ্র-৭*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০০৭খ)। ইহা মানুষ। *উপন্যাস সমগ্র-৭*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০০৫)। *মার্জিনে মন্তব্য*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০০৪ক)। বুকঝিম এক ভালোবাসা। *উপন্যাস সমগ্র-৬*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০০৪খ)। অন্তর্গত। *উপন্যাস সমগ্র-৬*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০০২ক)। মেঘ ও মেশিন। *উপন্যাস সমগ্র-৫*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০০২খ)। খেলারাম খেলে যা। *উপন্যাস সমগ্র-২*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০০২গ)। আয়না বিবির পালা। *উপন্যাস সমগ্র-৫*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০০১ক)। বালিকার চন্দ্রযান। *উপন্যাস সমগ্র-৪*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

——————। (২০০১খ)। অন্য এক আলিঙ্গন। *উপন্যাস সমগ্র-৪*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

--------------। (২০০১গ)। মৃগয়ায় কালক্ষেপ। *উপন্যাস সমগ্র-৪*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা

--------------। (২০০১ঘ)। নিষিদ্ধ লোবান। *উপন্যাস সমগ্র-৪*। অন্যপ্রকাশ: ঢাকা।

--------------। (১৯৯৫)। *অন্তর্গত*। বিদ্যাপ্রকাশ: ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের স্নাতক ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দের ক্রিয়া-বিশেষণ 都(dōu)-এর ব্যবহারগত ত্রুটি বিশ্লেষণ

এম এম আফিকুর রহমান নাহিদ* , তন্বী রহমান**

সারাংশ: বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য চীনা ক্রিয়া-বিশেষণ 都 (dōu) শেখা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। বাংলা ও চীনা বাক্য গঠনের ভিন্নতা (বাংলা: S+V+O, চীনা: S+O+V) এই চ্যালেঞ্জের একটি কারণ। গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০২৩ সালে অধ্যয়নরত স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ওপর জরিপ এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে চীনা ক্রিয়া-বিশেষণ dōu ব্যবহারে প্রধান ত্রুটিগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ত্রুটিসমূহের তিনটি প্রধান শ্রেণি চিহ্নিত করা হয়েছে: 错序偏误 (ক্রমবিন্যাসজনিত ত্রুটি), 混用偏误 (মিশ্র ব্যবহারজনিত ত্রুটি), এবং 遗漏偏误 (অনুপস্থিতিজনিত ত্রুটি)। এছাড়া অন্যান্য কিছু ত্রুটিও পাওয়া গেছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি, ব্যাখ্যার কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, অনুশীলনের অভাব, মাতৃভাষার নেতিবাচক প্রভাব, dōu ও অন্যান্য ক্রিয়া-বিশেষণের পার্থক্য না বোঝা এবং ব্যাকরণগত সাদৃশ্য এসব ত্রুটির জন্য দায়ী। শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের শেখার কৌশল এবং পাঠ্যপুস্তকের মানোন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের dōu ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

মূলশব্দ (Keyword): ক্রিয়া-বিশেষণ '都-dōu' (Adverb'all'), ত্রুটি বিশ্লেষণ (Error analysis), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (University of Dhaka), চীনা ভাষা বিভাগ (Chinese language department), ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ (2nd year students)

ভূমিকা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ও চীনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে; যার ফলে বাংলাদেশে চীনা ভাষা শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ঢাকা

* M M Afiqur Rahman Nahid, Lecturer, IML, University of Dhaka, Corresponded Author: email: rahman.nahid@du.ac.bd

** Tanny Rahman, Part-time Teacher, IML, University of Dhaka

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৮ সালেই চীনা ভাষা কোর্স চালু হয়েছিল (Hossain, 2024), বর্তমানে কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ভাষা শিক্ষাদান করা হচ্ছে। তবে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব ও শিক্ষাদানের সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষার্থীরা বিশেষত ক্রিয়া-বিশেষণ 都 (dōu)-এর ব্যবহারে ত্রুটির সম্মুখীন হচ্ছে, যা কেবল বাংলাদেশেই নয়, বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বহুল পরিলক্ষিত একটি সমস্যা (DongYao, 2013; HuiTing, 2014; XiuXia, 2015; YiNan, 2014)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের স্নাতক ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীরা সাধারণত মৌলিক ব্যাকরণ শেখে, তবে ২য় বর্ষে প্রবেশের পর তারা ব্যাকরণের জটিল কাঠামোর মুখোমুখি হয়। এ পর্যায়ে মাতৃভাষার প্রভাব, অনুশীলনের অভাব ও ব্যাকরণগত জটিলতা তাদের ভুল করার প্রবণতাকে বৃদ্ধি করে। তাই এই গবেষণাটি ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের উপর কেন্দ্রীভূত, কারণ তারা ব্যাকরণগত কাঠামোর একটি মৌলিক ধারণা অর্জন করলেও জটিল ক্রিয়া-বিশেষণ, বিশেষত 都 (dōu)-এর সঠিক ব্যবহার পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেনি। গবেষণায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে 都 (dōu) ব্যবহারের প্রধান ত্রুটি যথাক্রমে ক্রমবিন্যাসজনিত, মিশ্র ব্যবহার এবং অনুপস্থিতিজনিত ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়েছে। ত্রুটির মূল কারণ হিসেবে মাতৃভাষার প্রভাব ও অনুশীলনের অভাব চিহ্নিত হয়েছে। ফলে, শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো কমানোর সুপারিশ করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের চীনা ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা বিভাগের স্নাতক ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের 都 (dōu) ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবহারে করা ত্রুটির ধরনসমূহের পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ প্রদান করা। একইসাথে, 都 (dōu) ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবহারে ত্রুটি সৃষ্টির কারণসমূহ চিহ্নিত করা এবং চীনা ভাষার প্রাথমিক শিক্ষায় এর শিক্ষাদানে কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করা।

গবেষণা প্রশ্ন

১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চীনা ভাষা বিভাগের স্নাতক ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীরা 都 (dōu) ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবহারের সময় বাক্যে কী কী ধরনের ত্রুটি করে?

২) 都 (dōu) ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টির কারণসমূহ কী কী?

৩) 都 (dōu) ক্রিয়া-বিশেষণের জন্য শিক্ষাদান এবং শিক্ষার পদ্ধতি কীভাবে আরও উন্নত করা যেতে পারে?

গবেষণার গুরুত্ব

প্রথমত, এই গবেষণাটি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের চীনা ভাষার নবীন শিক্ষার্থীবৃন্দের জন্য 都 (dōu) ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবহারে সহায়ক তথ্যসূত্র এবং দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ

করবে। দ্বিতীয়ত, গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষার ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দের 都 (dōu) ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবহারে ত্রুটিপূর্ণ বাক্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

পূর্ব গবেষণা সমীক্ষণ

পূর্ব গবেষণাসমূহে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের চীনা ভাষা শিক্ষার্থীদের ত্রুটি এবং বিশেষত ক্রিয়া-বিশেষণ 都 (dōu) ব্যবহারে চ্যালেঞ্জের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। (Hossain, 2024) এর বইটি স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অত্যন্ত উপযোগী পাঠ্যবই, যা শব্দার্থ ও ব্যাকরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। তবে, বইটিতে 都 (dōu) নিয়ে কোনো আলোচনা নেই, যা শিক্ষার্থীদের ভাষা শেখার প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। রুউয়ে (২০১৭) এবং শিউশিয়া (২০১৫) তাঁদের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, বিদেশি শিক্ষার্থীদের 'ক্রমবিন্যাসজনিত' এবং 'অনুপস্থিতিজনিত' ত্রুটির প্রধান কারণ মাতৃভাষার নেতিবাচক প্রভাব এবং শিক্ষকের পেশাদার দক্ষতার অভাব। (Quan & XiuKui, 2014) বাংলাদেশে চীনা ভাষা শিক্ষার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে উন্নত শিক্ষণ কৌশল এবং দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। (XiuKui, 2014) এর আরেকটি গবেষণায় বাংলাদেশের নবীন শিক্ষার্থীদের চীনা ব্যাকরণ শেখার চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। সার্বিকভাবে, সংশ্লিষ্ট গবেষণাগুলো ক্রিয়া-বিশেষণ 都 (dōu) ব্যবহারের ত্রুটির ধরন ও কারণসমূহ বুঝতে সহায়ক হয়েছে, যেমন মাতৃভাষার প্রভাব, শিক্ষকের প্রশিক্ষণের অভাব এবং পাঠ্যবই সংক্রান্ত সমস্যা। সংশ্লিষ্ট গবেষণাগুলো চীনা ভাষার শিক্ষার্থীদের বাক্যে 都 (dōu) ব্যবহারে ত্রুটির সমাধান ও সংশোধনের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছে, যা ভবিষ্যৎ চীনা ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম এবং গবেষণার জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করতে পারে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট গবেষণাগুলো বাংলাদেশে চীনা ভাষা শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও মূল্যবান ধারণা প্রদান করেছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটিতে ভাষা এবং সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে বিদেশি ভাষা শেখার প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ত্রুটি তৈরি হয়, তা বিশ্লেষণের জন্য জরিপ এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। জরিপ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদেরকে পাঁচটি প্রশ্নমালা দেওয়া হয়েছে, যা dōu ক্রিয়া-বিশেষণের পাঁচটি ভিন্ন ব্যাকরণ কাঠামোর ভিত্তিতে তৈরি, যথা: 主语+副词+动词+宾语; 每… …都; 全… …都; 一点儿+也/都 + 不 + 动词+ (宾语); 一 + 量词 + 名词 + 也/都 + 不/没+ 动词。২য় বর্ষের মোট ৩৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে এই গবেষণায় প্রথম প্রশ্নমালায় ৩১ জন (৮৬.১১%), দ্বিতীয়তে ৩০ জন (৮৩.৩৩%), তৃতীয়তে ৩৩ জন (৯১.৬৭%), চতুর্থতে ৩৩

জন (৯১.৬৭%) এবং পঞ্চম প্রশ্নমালায় ৩১ জন (৮৬.১১%) অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশ্নমালার দ্বারা শিক্ষার্থীদের ত্রুটিপূর্ণ বাক্যসমূহ চিহ্নিত ও ত্রুটির কারণ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ২য় বর্ষের চীনা ব্যাকরণ সংক্রান্ত কোর্সের দুইজন শ্রেণিশিক্ষকের (একজন বাংলাদেশি ও একজন চীনা) মতামত নেওয়া হয়, যা শিক্ষার্থীদের ত্রুটির ধরন এবং তাদের শিক্ষাদানের কৌশল বুঝতে সহায়ক ছিল।

শিক্ষার্থীদের ত্রুটি জরিপ ও বিশ্লেষণ

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, শিক্ষার্থীরা 都 (dōu) ব্যবহারে প্রধানত তিন ধরনের ত্রুটি করে: ভুল ক্রমবিন্যাস (২২০টি), মিশ্র ব্যবহারজনিত (৫৮টি) এবং অনুপস্থিতিজনিত (৩৬টি)। এছাড়া কিছু অন্যান্য ত্রুটি (১২টি) শনাক্ত করা হয়েছে। সর্বমোট ৩২৬টি ত্রুটিযুক্ত বাক্য সনাক্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত ফলাফল নিম্নরূপ:

ছক ১: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা বিভাগের স্নাতক ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত 都 (dōu) ক্রিয়া-বিশেষণের ত্রুটিসমূহের ফলাফল

মোট বাক্যের সংখ্যা	২৯৯৮
সঠিক বাক্যের সংখ্যা	১৯২৩
ত্রুটিযুক্ত বাক্যের সংখ্যা	১০৭৫
ক্রম বিন্যাসজনিত ত্রুটিযুক্ত বাক্যের সংখ্যা	২২০
মিশ্র ব্যবহারজনিত ত্রুটিযুক্ত বাক্যের সংখ্যা	৫৮
অনুপস্থিতিজনিত ত্রুটিযুক্ত বাক্যের সংখ্যা	৩৬
অন্যান্য ত্রুটিযুক্ত বাক্যে	১২

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, চীনা ক্রিয়া-বিশেষণ ‘dōu’ ব্যবহারে প্রধানত চার ধরনের ভুলের প্রবণতা রয়েছে এবং এই ধরনের ভুল করা শিক্ষার্থীদের ‘dōu’ ব্যবহারের সময় খুবই সাধারণ বিষয়। নিম্নলিখিত ছকে প্রতিটি ধরনের ভুলের অনুপাত উল্লেখ করা হয়েছে:

ছক ২: চার ধরনের ত্রুটিযুক্ত বাক্যের অনুপাত

ক্রমবিন্যাসজনিত ত্রুটিযুক্ত বাক্যের হার	৬৭.৪৮%
মিশ্র ব্যবহারজনিত ত্রুটিযুক্ত বাক্যের হার	১৭.৮০%
অনুপস্থিতিজনিত ত্রুটিযুক্ত বাক্যের হার	১১.০৪%
অন্যান্য ত্রুটিযুক্ত বাক্যের হার	৩.৬৮%

সারণি অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষার ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে dōu ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি ত্রুটি ছিল ক্রমবিন্যাসজনিত ত্রুটি, যার হার ৬৭.৪৮%। এটি নির্দেশ করে যে, শিক্ষার্থীরা dōu বাক্যে সঠিক অবস্থানে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি এবং এই বিষয়টি আরও গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। দ্বিতীয়ত, মিশ্র ব্যবহারজনিত ত্রুটি ছিল ১৭.৮০%, যেখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্রিয়া-বিশেষণ যেমন: 已经 (yǐjīng)、全 (quán)、就 (jiù)、也 (yě) এবং 还 (hái)-এর সঙ্গে 都 (dōu)-এর ভুল মিশ্রণ করেছে। এর মধ্যে 都 (dōu) এবং 已经 (yǐjīng) ও 还 (hái)-এর মিশ্রণের হার ছিল ৪.৯১% করে, যা অন্যান্য মিশ্রণের তুলনায় বেশি। তৃতীয়ত, অনুপস্থিতিজনিত ত্রুটি ছিল ১১.০৪%, যদিও তুলনামূলকভাবে কম, তবে শিক্ষার্থীরা প্রায়ই এই ধরনের ত্রুটি করে থাকে, যা গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। অবশেষে, অন্যান্য ত্রুটির হার ছিল ৩.৬৮%, যেগুলো দুটি ভাগে বিভক্ত: প্রথমত, একই বাক্যে দুটি ত্রুটি (যেমন শব্দগত ত্রুটি এবং অব্যবহারজনিত ত্রুটি), যা মোটের ৩.৩৭% এবং দ্বিতীয়ত, স্বতন্ত্র শব্দগত ত্রুটি, যা মাত্র ০.৩১%, যা চার ধরনের ত্রুটির মধ্যে সবচেয়ে কম।

ক্রিয়া-বিশেষণ 都 'dōu'-এর ক্রমবিন্যাসজনিত ত্রুটি বিশ্লেষণ

এই গবেষণায় ক্রমবিন্যাসজনিত ত্রুটি বলতে সেই ধরনের ত্রুটিকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা dōu ব্যবহার করেছে, কিন্তু তা বাক্যের ভুল স্থানে বসিয়েছে, ফলে ত্রুটিপুর্ণ বাক্য গঠিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষার স্নাতক ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ত্রুটির হার ৬৭.৪৮%, যা তাদের সাধারণ সমস্যা। এর কারণ হলো, dōu বাক্য গঠনটি ব্যাপ্তি ক্রিয়া-বিশেষণ এবং সময় ক্রিয়া-বিশেষণের তুলনায় জটিল, যা শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে আয়ত্তে নিতে সমস্যায় পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, বাক্য *(১) 都留学生去上课了(শুদ্ধ বাক্য: 留学生都去上课了）এবং *(২) 今天放假，都学生们去公园了(শুদ্ধ বাক্য: 今天放假，学生们都去公园了）তে dōu এবং বাক্যের কর্তার অবস্থান অদলবদল হওয়ায় ত্রুটি ঘটেছে। সঠিকভাবে বলতে হলে, বাক্যের বহুবচন কর্তা (留学生 বা 学生们) dōu-এর আগে আসা উচিত ছিল। এই ত্রুটির মূল কারণ হলো শিক্ষার্থীদের dōu এবং বহুবচন কর্তার সঠিক সম্পর্ক না বোঝা। ফলে, শিক্ষকদের উচিত এই নিয়মগুলো ভালোভাবে শেখানো, বিশেষত বহুবচন কর্তার ক্ষেত্রে dōu-এর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা। গবেষণার ফলাফল থেকে আরও বোঝা যায় যে, ক্রমবিন্যাসজনিত ত্রুটি অন্যান্য ত্রুটির তুলনায় অনেক বেশি, যা শিক্ষার্থীদের চীনা ভাষায় পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাবে ঘটে।

ক্রিয়া-বিশেষণ 都 'dōu'-এর মিশ্র ব্যবহারজনিত ত্রুটি বিশ্লেষণ

গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিক্ষার্থীরা প্রায়ই এমন অবস্থায় dōu-এর পরিবর্তে অন্যান্য শব্দ যেমন: 已经 (yǐjīng)、还 (hái)、全 (quán)、就 (jiù) এবং 也 (yě) ব্যবহার করেন যেখানে 都 (dōu) ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় ছিল। টেবিলের তথ্য অনুযায়ী, এই ধরনের মিশ্র ব্যবহারজনিত ত্রুটি মোট ত্রুটির ১৭.৮০%, যেখানে 都 (dōu) এবং 已经 (yǐjīng) ও 还 (hái)-এর মধ্যে মিশ্রণের হার সর্বোচ্চ, ৪.৯১% এবং 都 (dōu) ও 也 (yě) এর মধ্যে ত্রুটির হার সবচেয়ে কম, ২.১৫%। নিচে 都 (dōu) ক্রিয়া-বিশেষণের ভুল ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করা হলো:

都 (dōu) **এবং** 已经 (yǐjīng)、全 (quán)、就 (jiù)、也 (yě) এবং 还 (hái)-এর মিশ্রণ

গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা 都 (dōu) এবং বিভিন্ন অনুরূপ ক্রিয়া বিশেষণ, যেমনঃ 已经 (yǐjīng)、全 (quán)、就 (jiù)、也 (yě) এবং 还 (hái)-এর মিশ্রণজনিত ত্রুটি করে। প্রথমত, শিক্ষার্থীরা 都 (dōu) এবং 已经 (yǐjīng) এর মধ্যে ত্রুটি করে । 都 (dōu)-এর অর্থ সব বা সকল হলেও শিক্ষার্থীরা এটি 已经 (yǐjīng)-এর মতো সম্পন্ন অর্থে ব্যবহার করে, যা ত্রুটির কারণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাক্য *(৩) 他全身已经不舒服 (শুদ্ধ বাক্যঃ 他全身都不舒服， এই বাক্যে 已经 (yǐjīng)-এর ভুল প্রয়োগ দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, 还(hái) শব্দটি পূর্বের অবস্থার অপরিবর্তিত থাকা নির্দেশ করলেও, শিক্ষার্থীরা এটি 都 (dōu)-এর সাথে মিশ্রণ করে ত্রুটিপূর্ণ বাক্য তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, *(৪)小李一杯茶还没喝 (শুদ্ধ বাক্যঃ 小李一杯茶都没喝) এবং *(৫) 每时每刻，还在消费 (শুদ্ধ বাক্যঃ 每时每刻，都在消费）বাক্যগুলোতে 还(hái)-এর সঠিক প্রয়োগ বোঝার অভাব থেকে শিক্ষার্থীরা ভুল করেছে। এছাড়াও, 都 (dōu) এবং 全 (quán)-এর মধ্যে পার্থক্য বোঝার সময় শিক্ষার্থীরা ভুল করে থাকে, কারণ 都 (dōu) শব্দটি সবাই বা সবকিছু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, আর 全 (quán) বোঝায় পুরো বা সম্পূর্ণ কিছু। উদাহরণস্বরূপ, *(৬) 每个人全要孝顺父母 (শুদ্ধ বাক্যঃ 每个人都要孝顺父母）বাক্যে শিক্ষার্থীরা 全(quán) এবং 都(dōu)-এর মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারেনি। 都 (dōu) এবং 就 (jiù)-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রেক্ষাপট বুঝতে ভুল করে শিক্ষার্থীরা ত্রুটি করে। 都 (dōu) শর্ত ছাড়াই ব্যবহৃত হলেও 就 (jiù) শর্তসাপেক্ষে বাক্যে যুক্ত হয়, যা শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে উপলব্ধি না করায় প্রায়ই ত্রুটি হয়। উদাহরণস্বরূপ, *(৭) 那个地方一点儿就不远 (শুদ্ধ বাক্যঃ 那个地方一点儿都不远）বাক্যে এই ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। সবশেষে, 都 (dōu) এবং 也 (yě)-এর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা প্রায়ই দুটির অর্থ কাছাকাছি মনে করলেও পার্থক্য বোঝার ক্ষেত্রে ভুল করে। 都 (dōu) সাধারণত সবাই বা সমস্ত অর্থে ব্যবহৃত হলেও, 也 (yě)

“এছাড়াও” বা “অতিরিক্তভাবে” অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, *(৮) 每星期一，他也迟到 (শুদ্ধ বাক্য: 每星期一，他都迟到）এবং *(৯) 他全身也不舒服 (শুদ্ধ বাক্য: 他全身都不舒服）বাক্যে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা এদের পার্থক্য সঠিকভাবে উপলব্ধি না করায় ত্রুটি করেছে। এসব ত্রুটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে 都 (dōu) এবং অনুরূপ ক্রিয়া-বিশেষণের সঠিক ব্যবহার আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে, যা তাদের ভাষা শিক্ষার উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

ক্রিয়া-বিশেষণ 都 ‘dōu’-এর অনুপস্থিতিজনিত ত্রুটি বিশ্লেষণ

গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা প্রায়ই dōu এর অনুপস্থিতিজনিত ত্রুটি করে, যা বাক্যে নির্দিষ্ট উপাদান বাদ পড়ার কারণে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, *(১০) 我们班的同学来了(শুদ্ধ বাক্য: 我们班的同学都来了）এবং *(১১) 他们俩是同学 (শুদ্ধ বাক্য: 他们俩都是同学）বাক্যগুলোতে শিক্ষার্থীরা dōu বাদ দেওয়ার কারণে অর্থের সম্পূর্ণতা নষ্ট হয়েছে। dōu শব্দটি সবাই বা সকল বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এবং এটি সাধারণত বাক্যের বহুবচন কর্তার পরে বসে। উদাহরণ হিসেবে, (১২) 他的哥哥姐姐都是老师 বাক্যে dōu-এর সঠিক ব্যবহার দেখানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা প্রায়ই এই নিয়মগুলো পুরোপুরি আয়ত্ত করতে না পারার কারণে এবং বাংলা ভাষার নেতিবাচক প্রভাবের কারণে ত্রুটি করে। যেমন, বাংলায় “প্রতি” বা “প্রত্যেক” শব্দের পরে “সব” বা “সকল” ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, *(১৩) 他每个星期一迟到 বাক্যেটিতে dōu অনুপস্থিত, যা মাতৃভাষার প্রভাব থেকে এসেছে, যার শুদ্ধ বাক্য: 他每个星期一都迟到。সুতরাং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে স্নাতক প্রাথমিক পর্যায়ে, dōu ব্যবহারে মাতৃভাষার নেতিবাচক প্রভাবের কারণে প্রায়ই অনুপস্থিতিজনিত ত্রুটি করে থাকে।

ক্রিয়া-বিশেষণ 都 (dōu)-এর ব্যবহারে ত্রুটিসমুহের কারণ

চীনা ভাষার শিক্ষায় বিশেষত dōu (সব/সকল) ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন ত্রুটি দেখা যায়, যা তাদের ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে। এই ত্রুটিগুলি শিক্ষকদের শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের ভাষার অভ্যস্ততার ওপর নির্ভর করে। এই গবেষণায়, dōu-এর ব্যবহারে ত্রুটির কারণসমূহ শিক্ষকদের এবং শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ক) শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির কারণে ত্রুটি

পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি: শিক্ষকরা চীনা ভাষার ব্যাকরণ এবং শব্দ ব্যবহারের উপর প্রভাব ফেলেন। তবে, অনেক সময় শিক্ষকদের জন্য চীনা ভাষার জটিল বিষয়গুলো

পূর্বনির্ধারণ করা কঠিন হয়ে যায়। বিশেষত, dōu-এর সঠিক ব্যবহার শিখাতে গেলে শিক্ষকরা অনেক সময় ব্যাকরণের গভীরতা ও শিক্ষার্থীদের চাহিদা যথাযথভাবে বুঝতে ব্যর্থ হন। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নত করা এবং প্রতিটি পাঠের আগে বিস্তারিত প্রস্তুতি নেওয়া অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষকদের উচিত dōu এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাকরণসমূহ নিয়ে গবেষণা করা, যাতে শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে ব্যাকরণটি শিখতে পারে।

ব্যাখ্যার কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা: শিক্ষকরা ক্লাসে সাধারণত 都 (dōu)-এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করেন, তবে অনেক সময় অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি, যেমন: 都(dōu) এবং 已经 (yǐjīng)、 全 (quán)、 就 (jiù)、 也 (yě) এবং 还 (hái)-এর পার্থক্য বাদ দেওয়া হয়। যদি শিক্ষার্থীরা 都 (dōu) এবং অন্যান্য ক্রিয়া-বিশেষণের পার্থক্য সঠিকভাবে না বোঝে, তবে তারা এই শব্দগুলোর ভুল ব্যবহার করতে পারে। শিক্ষকদের উচিত 都 (dōu)-এর পাশাপাশি এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যাকরণগত ধারণাগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে শিক্ষার্থীরা শব্দগুলোর সঠিক অর্থ ও প্রয়োগ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে এবং ত্রুটির সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

অনুশীলনের অভাব: ব্যাকরণের নিয়ম শুধু পাঠ্যবই থেকে শেখা যায় না, বরং তা অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করা প্রয়োজন। অনেক সময় শিক্ষকরা ক্লাসে ভাষার অনুশীলনের উপর কম জোর দিয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য dōu ব্যবহারের কার্যকর অনুশীলন প্রয়োজন, যেমন: সংলাপ এবং শূন্যস্থান পূরণ অনুশীলন। যদি শিক্ষকরা ক্লাসে পর্যাপ্ত অনুশীলন না করান, তাহলে শিক্ষার্থীরা তাদের শেখার কার্যক্রমে বাধাগ্রস্ত হবে, যা পরবর্তীতে ভাষা ব্যবহারের সময় ত্রুটিপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে ভূমিকা পালন করবে।

খ) শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রুটি

মাতৃভাষার নেতিবাচক প্রভাব: নতুন ভাষা শেখার সময় শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার কাঠামো ও চিন্তাধারা প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলা ভাষার শিক্ষার্থীরা 都 (dōu) ব্যবহারে মাতৃভাষার নিয়ম অনুসরণ করে, যা ভুলের কারণ হয়। বাংলা ভাষায় 'সবাই' শব্দটি উপেক্ষিত থাকলেও, চীনা ভাষায় 都 (dōu) প্রায়শই অপরিহার্য। এছাড়া, বাংলায় ভাষায় 都 'সবাই' এবং 每 'প্রত্যেক' একসঙ্গে ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু চীনা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, যা শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করে। এই সমস্যার সমাধানে শিক্ষকদের উচিত মাতৃভাষার প্রভাব কমিয়ে 都 (dōu)-এর সঠিক ব্যবহার শেখানো। এ লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচুর বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন করতে হবে, যাতে তারা প্রাসঙ্গিক বাক্যে 都 (dōu)-এর ব্যবহার দেখতে ও অনুশীলন করতে পারে। পাশাপাশি, বাংলা ও চীনা বাক্যের গঠন তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে পার্থক্য স্পষ্ট করা প্রয়োজন। শূন্যস্থান পূরণ, বাক্য রূপান্তর ও কথোপকথন চর্চার মতো অনুশীলন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হলে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই সঠিক ব্যবহার রপ্ত করতে পারবে। শিক্ষকেরা

শিক্ষার্থীর ভুল ব্যবহারের তাৎক্ষণিক সংশোধন ও ব্যাখ্যা প্রদান করলে তাদের ধারণা আরও দৃঢ় হবে। সর্বোপরি, 都 (dōu) ব্যবহারের ফলে বাক্যের অর্থ কীভাবে পরিবর্তিত হয় বা স্পষ্ট হয় তা বোঝানো শিক্ষার্থীদের মনে এটির প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করবে এবং ধীরে ধীরে তারা মাতৃভাষার প্রভাব কাটিয়ে সঠিক ব্যবহারে দক্ষ হবে।

都 (dōu) এবং অন্যান্য ক্রিয়া-বিশেষণের পার্থক্য বুঝতে না পারা: 都 (dōu) এবং অন্যান্য ক্রিয়া-বিশেষণ যেমন: 就 (jiù), 也 (yě) ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য না বোঝার ফলে শিক্ষার্থীরা ত্রুটি করে। উদাহরণস্বরূপ, 就 (jiù) একটি শর্তসাপেক্ষ শব্দ, যার পর 都 (dōu) ব্যবহার করা হয় না। শিক্ষার্থীরা এই পার্থক্য না বুঝে ভুলভাবে শব্দ দুটি একসঙ্গে ব্যবহার করেছে। যেমন: *(১৪) 他每次不在的时候，就像少了什么似的，让人感觉不舒服（শুদ্ধ বাক্য: 他每次不在的时候，都像少了什么似的，让人感觉不舒服）。

ব্যাকরণগত সাদৃশ্য: শিক্ষার্থীরা সাধারণত ব্যাকরণের সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে বাক্য গঠনে ভুল করে থাকে। 都 (dōu) এবং 也 (yě)-এর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও, এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। 都 (dōu) যখন সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে, তখন তা সব সময় পূর্ববর্তী বাক্যের আগে বসে, কিন্তু 也 (yě) সামগ্রিক অর্থ প্রকাশের সময় পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় বাক্যেই ব্যবহার করা যেতে পারে, শিক্ষার্থীদের মাঝে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা না থাকার ফলে ত্রুটিযুক্ত বাক্য তৈরি করেছে।

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিকোণ থেকে dōu ব্যবহারের ত্রুটিগুলির কারণ একটি জটিল এবং বহুস্তরীয় বিষয়। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা, ব্যাকরণগত বিষয়গুলি নিয়ে গভীর চিন্তা এবং যথাযথ অনুশীলন শিক্ষার্থীদের dōu ব্যবহারে ত্রুটি কমাতে সহায়ক হতে পারে। একইভাবে, শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার প্রভাব কমিয়ে এবং dōu-এর সঠিক ব্যবহার জানার মাধ্যমে ভাষাগত ত্রুটিগুলি হ্রাস করা সম্ভব।

সুপারিশমালা

শিক্ষকদের জন্য সুপারিশ: একজন পেশাদার চীনা ভাষার শিক্ষক হিসেবে, শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা, নৈতিক গুণাবলি এবং শিখন ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। যেমন– তাদের বয়স, শ্রেণি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি। এটি শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও শিখন ক্ষমতা অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করার জন্য অপরিহার্য। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের চীনা ভাষা শেখার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যও বোঝার চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের ভাষা শেখার উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে। যেহেতু চীনা ভাষার শেখার প্রক্রিয়া একেবারে ভিন্ন ধরনের, চীনা শিক্ষক যদি বাংলা ভাষা জানেন, তবে শিক্ষার্থীদের চীনা ও বাংলা ভাষার পার্থক্য বোঝানো সহজ হবে। উদাহরণস্বরূপ,

dōu শব্দটি চীনা ভাষায় বেশ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বাংলাতে এর অনুবাদ "সব বা সবকিছু" হতে পারে, তবে দুটি ভাষার ব্যাকরণগত ব্যবহার ভিন্ন। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের এ ধরনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ শেখানোর মাধ্যমে তাদের ভাষাগত ত্রুটি কমাতে সহায়তা করতে পারেন। শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের ভাষার ব্যবহারগত ত্রুটি শনাক্ত করা এবং সেই ত্রুটিগুলির উপর ভিত্তি করে শিখন কৌশল তৈরি করা। চীনা ভাষার ব্যাকরণ শেখানোর সময়, শিক্ষককে ব্যাকরণিক নিয়মের ব্যবহারিক দিকটিও বুঝিয়ে বলতে হবে। যেমন– কোন ব্যাকরণ কখন, কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য সুপারিশ: শ্রেণিকক্ষে শিখন একটি আন্তঃক্রিয়ামূলক প্রক্রিয়া, যেখানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের উচিত ক্লাসে সময়ের সদ্ব্যবহার করে শিক্ষকদের সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে ক্লাসেই তা সমাধান করা। শ্রেণিকক্ষে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যেখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই একে অপরের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং যেখানে ভাষাসঙ্গী ও বৃন্দ আলোচনার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষার্থীদের উচিত পাঠ শেষে বিষয়গুলো পুনরায় পড়ে যেখানে তারা বুঝেনি তা চিহ্নিত করে সহপাঠী বা শিক্ষকের কাছ থেকে দ্রুত সমাধান নেয়া। বিশেষত, শিক্ষার্থীরা dōu শেখার সময় তাদের উচিত এর ব্যাকরণ এবং ব্যাবহারিক জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন থাকা।

পাঠ্যবইয়ের জন্য সুপারিশ: বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য চীনা ভাষার পাঠ্যবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি সঠিক পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়, কারণ পাঠ্যবই সরাসরি ভাষা শেখাকে প্রভাবিত করে। পাঠ্যবইতে বিষয়গুলো এমনভাবে সাজানো উচিত যাতে সহজ থেকে কঠিন ধাপে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে চীনা ভাষার ব্যাকরণিক জটিলতা সহজে আয়ত্ত করতে পারবে। বিশেষত, স্নাতক নবীন শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত পাঠ্যবইয়ে dōu-এর ব্যাকরণিক নিয়মগুলোর ব্যাখ্যা এবং পর্যাপ্ত উদাহরণ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে বাক্যে কবে এবং কোথায় dōu ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়াও পাঠ্যবইতে বিভিন্ন ধরনের অনুশীলনী থাকা উচিত, কারণ অনুশীলন চীনা ভাষা শেখার একটি অপরিহার্য অংশ। এটি তাদের ভাষাগত দক্ষতা আরও উন্নত করবে এবং তাদের চীনা ভাষার উপর শক্ত ভিত্তি তৈরি করবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা বিভাগের স্নাতক ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দের চীনা ক্রিয়া-বিশেষণ 都 (dōu) ব্যবহারের ত্রুটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ত্রুটির ধরন তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে: ক্রমবিন্যাসজনিত ত্রুটি, মিশ্র ব্যবহারজনিত

ক্রুটি এবং অনুপস্থিতিজনিত ক্রুটি। এছাড়া অন্যান্য কিছু ক্রুটিও পাওয়া গেছে। ক্রুটির প্রধান কারণগুলো হলো: শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি, ব্যাখ্যার কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, অনুশীলনের অভাব, মাতৃভাষার নেতিবাচক প্রভাব, 都 (dōu) ও অন্যান্য ক্রিয়া-বিশেষণের পার্থক্য না বোঝা এবং ব্যাকরণগত সাদৃশ্য। এসব কারণে শিক্ষার্থীরা 都 (dōu) ব্যবহারের সময় ক্রুটি করে থাকে। এই গবেষণায় শিক্ষকদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের চীনা ভাষা শেখার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্যও 都 (dōu) ব্যবহার সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ও চর্চাগত ভিত্তি সরবরাহ করতে পারে। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সময় সীমিত থাকায় ক্রুটির শ্রেণিবিভাগ ও বিবরণ পর্যাপ্তভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি এবং প্রদত্ত সুপারিশগুলোর শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় কার্যকারিতা যাচাই করা হয়নি, তাই ভবিষ্যতে গবেষকরা এই বিষয়গুলোর পাশাপাশি 都 (dōu) ক্রিয়া-বিশেষণের আয়ত্তকরণ প্রক্রিয়া নিয়েও গবেষণা করতে পারেন।

তথ্য-নির্দেশ

DongYao, L. (2013). Error analysis and teaching strategies for the acquisition of the adverb Dou by Russian students (Doctoral thesis). Jilin University.

Hossain, M. A. (2024). *Eso China Vasha Shikhi*. Institute of Modern Languages, University of Dhaka. ISBN: 978-984-33-4139-6.

HuiTing, H. (2014). Error analysis of the use of the scope adverb Dou by Thai students. *Chifeng University Journal* (Chinese Language, Philosophy and Social Sciences Edition).

Quan, L., & XiuKui, W. (2014). Review of research on Chinese teaching in Bangladesh. *Chifeng University Journal* (Chinese Language, Philosophy and Social Sciences Edition).

XiuKui, W. (2014). A study and analysis of Chinese grammar learning by beginner-level learners in Bangladesh (Master’s thesis). Yunnan University.

XiuXia, L. (2015). Error analysis and teaching strategies for the use of the adverb Dou by Central Asian students (Master’s thesis). Xinjiang University.

YiNan, L. (2014). Error analysis of the acquisition of the scope adverb Dou by international students (Master’s thesis). Lanzhou University.

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত ভূমিজদের বিপন্ন ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতিঃ পাবনা জেলাভিত্তিক একটি পর্যালোচনা

এস. এম. তানভীর রহমান*

Abstract: Diversified ethnic Bhumij heritage and social culture, specially the Bhumij language of Pabna, are facing the threat of extinction. With the advancement of modernity, education, along with other factors, wants to influence these. The study tries to explore the present scenario of the society and culture of these Bhumij; the status of their threatened language causes behind the extinction and the measures to preserve them. For the assessment, data were collected through interviews and fieldwork observations. To comprehend the language and its extinction facts, collected data were later analyzed. This research will also explore the language, culture, and heritage of Bangladesh. The study may help policymakers in designing policy to preserve the nearly extinct language and influence future researchers.

মূলশব্দ (Keywords): Pabna (পাবনা), Bhumij (ভূমিজ), Society and Culture (সমাজ ও সংস্কৃতি), language (ভাষা), Education (শিক্ষা), Threat (বিপন্নতা), Preserve (সংরক্ষণ)

ভূমিকা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত ভূমিজদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বসবাস পাবনা জেলায় দীর্ঘকাল ধরেই দেখা যায় (Hunter, 1876)। [১] তাদের লালিত সমাজ ও সংস্কৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়ায় তা চিত্তাকর্ষকও বটে, যা নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়েই বাংলাদেশের সামগ্রিক সংস্কৃতির অংশ। এতদ্‌সত্ত্বেও, তাদের সমাজ-সংস্কৃতির নানা উপাদান আধুনিকতার অগ্রসরতার সাথে সাথে প্রতিনিয়ত সমস্যাসংকুল পথ পাড়ি দিচ্ছে। তাদের সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান ভাষা বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও বিপন্নতার হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। আবার

* S. M. Tanvir Rahman, Assistant Professor, Department of English, Government Edward College, Pabna and PhD. Fellow, PUST, email: tanvirrhmns@gmail.com

দারিদ্র্য ও এর সাথে চলমান জীবন সংগ্রাম তাদের জীবনের রূপরেখায় পরিবর্তন আনছে। অন্যদিকে, শিক্ষা তাদের সমাজজীবনে নানা ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও এর মাধ্যমেও সংঘটিত কিছু পরিবর্তন তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির নানা দিককে প্রভাবিত করছে। অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠী হিসেবে সীমিত সম্পদ নিয়ে সামাজিক বঞ্চনা তাদের একদিকে তাদের যেমন পিছিয়ে রাখছে, তেমনি আবার প্রচলিত বিশ্বাস বা মনোজগতের গঠনও তাদের প্রভাবিত করছে বলেই মনে হয়। এসব কারণে তাদের সামাজিক বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, অন্যদিকে আবার তারা স্বকীয় অস্তিত্বকে রক্ষার চেষ্টাও করছে। শিক্ষার প্রভাবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়ে তাদের কিছুটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হলেও সামগ্রিকভাবে তাদের অবস্থান পশ্চাৎপদ। অন্যদিকে, তাদের ভাষার বিপন্ন অস্তিত্ব ও এর সংরক্ষণে সীমিত উদ্যোগ হতাশাব্যঞ্জক হলেও তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরণ প্রত্যাশা করা যায়।

গবেষণার বিষয় শনাক্তকরণ

পাবনা জেলার ভূমিজদের সমাজ ও সাংস্কৃতির নিজস্বতা আছে যা পাশাপাশি বসবাসকারী অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলো থেকে অনেকটাই ভিন্ন। কিন্তু এর সাথে অনেকেরই পরিচয় নেই বলে তাদের সামাজিক উপস্থাপন অনেকটা নিজ সমাজকেন্দ্রিক, আবার পাশাপাশি বসবাসকারী অন্যান্যদের থেকে তারা জীবনাচারের নানা উপযোগ ভোগ ও উদ্‌যাপনে পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষা, পেশা বাছাই, আয় থেকে শুরু করে নিজেদের সংকটহীন নিরাপদ বসবাস সবক্ষেত্রেই তারা সমস্যার মধ্যে রয়েছে। অন্যদিকে, মাতৃভাষার বিপন্নতার হুমকি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গও বটে। এসব বিবেচণায় জীবন সংগ্রামের এসব বিষয়াদির প্রকৃতি উন্মোচন করা অত্যাবশ্যকও বটে। এক্ষেত্রে তাদের এসব সমস্যা উদ্ভবের কারণ ও সমাধানের পথ অনুসন্ধান করা প্রয়োজনীয় বিধায় বিস্তৃত গবেষণা প্রয়োজন।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ক. পাবনার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত ভূমিজদের সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচন করা;
খ. ভূমিজ ভাষার বিপন্নতা ও এর সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপগুলো অনুসন্ধান করা ও
গ. শিক্ষা ও সচেতনতার বিস্তরণে সামাজিক উত্তরণের পথ অনুসন্ধান করা।

গবেষণার যৌক্তিকতা

পাবনা জেলা শিল্প, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি জেলা। এ অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীগুলো দেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। একইরকমভাবে, এ অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোরও রয়েছে অনন্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। কিন্তু সত্যিকার অর্থে, বিভিন্ন আলোচনা ও গবেষণায় বাংলাদেশ,

পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তরবঙ্গ, বরেন্দ্র অঞ্চল বিভিন্ন নাম অথবা দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, নওগাঁসহ বিভিন্ন জেলা বিভিন্ন শিরোনামে স্থান পেলেও পাবনা জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর প্রসঙ্গ প্রায় অন্তরালেই থেকে যায়। এমনকি প্রচলিত ধারণা এই যে, বৃহত্তর পাবনা জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাসই নেই। তাই আঞ্চলিক গবেষণাকর্মে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকারোক্তিও নেই বললেই চলে। অথচ, এই এলাকায় ভূমিজসহ বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বহুদিনের বসবাস রয়েছে। সময়ের সাথে এদের ধর্ম-সংস্কৃতি-সামাজিক আচার অনুশাসনে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে, আবার শিক্ষা ও জীবনমানের ক্ষেত্রেও তাদের পরিবর্তন লক্ষণীয়। এতদ্‌সত্ত্বেও, জীবনাচারের বৈচিত্র্যময় দিকগুলো তাদের স্বতন্ত্রবোধ ও পৃথক অস্তিত্বেরই পরিচায়ক ও প্রকাশক। এই বিষয়গুলো নিয়েও কোনো গবেষণা হয়নি। তাই পরিবর্তনের ধারায় তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সুস্বাস্থ্যসহ বিশেষত ভাষার বিপন্নতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থার একটি চিত্র তুলে আনার প্রচেষ্টা এ গবেষণায় রয়েছে। আবার তাদের জীবনবৈচিত্র্য, শিক্ষা, বিশ্বাস, তাদের যাপিত জীবনের অন্বেষণ ও স্বরূপ উন্মোচনও এই গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। গবেষণাকর্মটি একদিকে যেমন তাদের জীবন, মূল্যবোধ ও বর্তমান অবস্থার ধারণা দেবে, তেমনি তাদের জীবনমানের উন্নয়নে কর্মপন্থা নির্ণয়নেও ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটিতে তথ্য সংগ্রহের মৌলিক কৌশলগুলোর অন্যতম ছিল ব্যক্তিগত ও অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ। এক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, এফজিডি ও ঘটনা অনুধ্যান থেকে প্রাপ্ত তথ্য, সরকারি দলিল দস্তাবেজ এবং দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ভূমিজদের উপর প্রণীত গ্রন্থাবলি ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত প্রামাণিক কাগজপত্র পাবনা জেলার ভূমিজদের তথ্য আহরণে সহায়ক হয়েছে। এমনকি গবেষণা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঘুরে গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের ব্যক্তিগত জীবন পর্যবেক্ষণও এই গবেষণা পদ্ধতিতে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। সাক্ষাৎগ্রহণের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও গোপনীয়তার মানদণ্ড মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকা ও সময়

পাবনা জেলাকে মূলত গবেষণা এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নদীবিধৌত একটি উর্বর ভূভাগ নিয়ে গঠিত কৃষিনির্ভর এই জেলায় প্রায় ২০টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস, যাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অস্তিত্ব নিয়ে ভূমিজদের বসবাস এই জেলায় রয়েছে। এই জেলার চাটমোহর উপজেলার হান্ডিয়াল ইউনিয়নের বাঘলবাড়ি এলাকায় এদের প্রায় ১২টি পরিবারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, যাদের জনসংখ্যা প্রায় ১৫০ জন। এছাড়াও আটঘরিয়া উপজেলার রাধানগর ও ধলেশ্বর গ্রামে ৩০ ঘর ভূমিজ বসবাস

করে, যাদের জনসংখ্যা ২৪০ জন। তাদের নিয়ে পরিচালিত এই গবেষণাটিতে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ে তাদের সমাজ, সংস্কৃতি বা ভাষার বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ প্রণীত হয়েছে, অনেক গবেষণাকর্মও সম্পন্ন হয়েছে। এগুলোতে তাদের প্রাত্যহিক জীবন, জীবনযাপনের নানাদিক, স্থানান্তর, বিপন্নবোধ, ধর্মান্তরসহ নানা বিষয়ভিত্তিক আলোচনাও হয়েছে। কোনো কোনো গবেষক আবার এলাকাভিত্তিক গবেষণা করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা থেকে শুরু করে পাবনা জেলা সংলগ্ন নাটোর বা রাজশাহী নিয়েও জেলাভিত্তিক স্থানীয় গবেষণা হয়েছে। তবে গবেষণাকর্ম অন্বেষণে পাবনা জেলা বা এর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত ভূমিজদের নিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো গবেষণাকর্ম খুঁজে পাওয়া যায় না। নিচে গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

মোঃ হাবিবুল্লাহ্‌র 'পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি' আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার গ্রন্থগুলোর অন্যতম (হাবিবুল্লাহ্‌, ২০০৯)।গ্রন্থটিতে পাবনা জেলার সমাজ ও বসবাসরত অধিবাসীদের সংস্কৃতি নিয়ে রচিত হয়েছে। ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সালের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থটিতে পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব, জেলার অধিবাসীদের বর্ণনা, জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা, অধিবাসীদের ভাষা ও সাহিত্য চর্চা, সভা-সমিতি-সংগঠন এবং সংবাদ-সাময়িকপত্র, জেলার জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দারুণ একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। উক্ত গ্রন্থ যেহেতু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকেন্দ্রিক নয়, কাজেই এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিয়ে খুব বেশি আলোচনা নেই। বাংলা একাডেমির প্রকাশনা 'বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা পাবনা' জেলার লোকজীবনের সংগীত, উৎসব, আচার, ক্রীড়া, চিকিৎসা ও নানা লোকপেশাজীবী গ্রুপ নিয়ে আলোচনা করেছে। মুহম্মদ নূরুন্নবী পাবনা পৌরসভা কর্তৃক প্রকাশিত 'রূপে রূপান্তরে পাবনা: জনপদ ও লোক সংস্কৃতি' শতবর্ষ স্মরণিকায় পাবনা জেলার জনপদের সামাজিক জীবন ও লোক সংস্কৃতির অপরূপ একটি চিত্র এঁকেছেন (নূরুন্নবী, ১৯৭৬)। কিন্তু উপরিউক্ত গ্রন্থগুলোর কোনোটিই পাবনা জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা তাদের সমাজ-সংস্কৃতি বা ভাষা নিয়ে নয়।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিয়েও অনেকগুলো গবেষণাকর্ম হয়েছে। এগুলোর মধ্যে 'নাটোর জেলার পাহাড়িয়া আদিবাসী' অভিসন্দর্ভটি নাটোর জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপর প্রণীত পূরবী সরকারের একটি গবেষণাকর্ম, যা সংশ্লিষ্ট এলাকার পাহাড়িয়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয় তুলে ধরেছে (সরকার, ২০১৪)। আবেদা সুলতানার 'সাঁওতাল সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব: রাজশাহী জেলার পাঁচটি গ্রামের উপর একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা'

শীর্ষক অভিসন্দর্ভটিতে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাবে সাঁওতাল সংস্কৃতি যে পরিবর্তিত রূপ নিয়েছে তার প্রকৃতি অন্বেষণ করা হয়েছে (সুলতানা, ২০০২)। শাহনাজ সুলতানার 'সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন: নওগাঁ জেলার চারটি গ্রামের উপর একটি গবেষণা' অভিসন্দর্ভটিতে নওগাঁ জেলার সাঁওতাল সংস্কৃতি, বিশেষত খ্রিষ্টধর্মের প্রভাবে পরিবর্তিত রূপ নিলেও ধর্মীয় আদি ধারার সাঁওতালদের সাথে ধর্মান্তরিত সাঁওতাল ও তাদের পারস্পারিক আন্তঃসম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে (সুলতানা, ২০০৩)। সুলতানা আইরিন পারভীনের 'বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসী জীবনে পরিবর্তন: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা' অভিসন্দর্ভটি বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও জীবনের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে হলেও এখানে পাবনা জেলার বিশেষ উল্লেখ নেই (পারভীন, ২০০৯)। আধুনিকায়নের প্রেক্ষাপটে সিলেট অঞ্চলের মনিপুরী নৃগোষ্ঠীর জীবনধারার পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেছেন মিতু চৌধুরী। তাঁর গবেষণার শিরোনাম 'Impact of modernizationon the life style of Manipurs: a sociological study' (Chowdhury, 2015)। গাজী গোলাম মওলার 'পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সংস্কৃতি: পরিপ্রেক্ষিত চাকমা মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী' অভিসন্দর্ভটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দুটি নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির নানা দিক উপস্থাপন করে (মওলা, ২০১৩)। উপরিউক্ত অভিসন্দর্ভগুলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিয়ে রচিত হলেও কোনোটিই পাবনা জেলাকে নিয়ে নয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী নিয়ে রচিত গ্রন্থের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ প্রকাশিত 'বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান' উল্লেখ্য (সম্পা. হক, ২০১৫)। গ্রন্থটি বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সংকলন। তবে এটিতে বৃহত্তর পাবনা জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পৃথকভাবে বিশেষ কোনো বিবৃতি নেই। মেসবাহ কামাল, মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত 'বাংলাদেশের আদিবাসী' এথনোগ্রফীয় গবেষণার তিনটি খণ্ড বাংলাদেশের অনেকগুলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনঘনিষ্ঠ নানামুখী দিক তুলে ধরেছে (কামাল, চাকমা ও অন্যান্য, ২০১৫)। আব্দুস সাত্তার রচিত 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য' ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিশ্লেষণ ও সাহিত্যধারা পরিচায়ক এক অনন্য রচনা (সাত্তার, ১৯৭৮)। অন্যদিকে, মুহম্মদ আবদুল জলিলের 'উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য ওরাওঁ' সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকজীবন ও লোকসাহিত্য নিয়ে রচিত একটি গ্রন্থ (জলিল, ১৯৯১)। গ্রন্থটিতে পাবনা জেলার সামান্য উল্লেখ থাকলেও এটি পাবনা জেলা বা ভূমিজ নৃগোষ্ঠীকে নিয়ে উপস্থাপিত নয়। একইরকমভাবে, মিথুশিলাক মুরমু তার 'আদিবাসী অন্বেষণ' গ্রন্থে এদেশে বাসরত নানা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনাচারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেও পাবনা জেলার নৃগোষ্ঠী নিয়ে গ্রন্থটিতে বিস্তৃত কোনো আলোচনা নেই (মুরমু, ২০১১)। রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ স্বরোচিষ সরকারের সম্পাদনায় 'বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তার আত্মপরিচয়' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করে যা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে উপস্থাপিত করেছে (সরকার, ২০১৮)। গ্রন্থটিতে পাবনা জেলার কিছু নৃগোষ্ঠীর উল্লেখ থাকলেও তা কোনোমতেই পাবনা জেলাকেন্দ্রিক বা ভূমিজ সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে নয়। মুস্তফা মজিদের 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয়' নামের গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কতক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থটিতে পাবনা জেলা বা ভূমিজদের বিশেষ উল্লেখ নেই (মজিদ, ১৯৯১)। সৌরভ শিকদার কতক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে গ্রন্থ লিখেছেন, যার নাম বাংলাদেশের 'আদিবাসী ভাষা', তবে এতে ভূমিজদের ভাষার উল্লেখ নেই (শিকদার, ২০১১)। উপরিউক্ত গবেষণাকর্ম, গ্রন্থাদিসহ নানা উৎস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এগুলোর মধ্যে পাবনা জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত ভূমিজদের সমাজ-সংস্কৃতি বা ভাষা নিয়ে কোনো গবেষণাকর্ম নেই। তবে আলোচিত গবেষণাকর্ম, গ্রন্থাবলি, প্রবন্ধগুলো গবেষণাকর্মে নানাভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

পাবনা জেলা, ভূমিজ জাতিসত্তা ও পাবনা জেলায় তাদের আগমনের প্রেক্ষাপট

পাবনা জেলা

পাবনা জেলা প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গুরুত্বসমৃদ্ধ একটি জনপদ (বেগম, ২০০২)। এর রয়েছে সভ্যতার একটি ইতিহাস, যার সাথে সম্পৃক্ত এই অঞ্চলে বাসকারী নানা ধর্ম, বর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জনগোষ্ঠী। আবার এ অঞ্চলে বাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোও এই জেলারই রোদ-জল মেখে লালিত। জেলাটির উপর লিখিত গ্রন্থে এর অতীত ইতিহাসের প্রমাণ মেলে:

> পাবনা নামক প্রাচীন এ জনপদটির জন্ম কবে সে বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ১৯৩১ সালে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী শিলালিপি, সিরাজগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান জেলা) রায়গঞ্জ থানার নিমগাছিতে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর ধ্বংসাবশেষ, মুদ্রা, শিলালিপি, মাধাইনগরে (রায়গঞ্জ) প্রাপ্ত তাম্রশাসন ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, কয়েক শতকব্যাপী বৃহত্তর পাবনা অঞ্চল পর্যায়ক্রমে মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের শাসনাধীনে ছিল (হাবিবুল্লাহ্, ২০০৯)।

করঞ্জা গ্রামের মৈত্রী ব্রাহ্মণদের শাসনাদি ও মাধাইনগর গ্রামে প্রাপ্ত রাজা লক্ষণ সেনের তাম্রশাসন থেকে প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির বিবরণ থেকে পাবনা পুণ্ড্ররাজ্যের অংশ হওয়ার প্রমাণ মেলে (হাবিবুল্লাহ্, ২০০৯)। ঐতিহাসিক দুর্গাদাস লাহিড়ী পাবনা ও প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনকে এক ও অভিন্ন বলে উল্লেখ করেন। তাঁর 'পাবনার ইতিহাস' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সংযোজিত প্রাচীন ভারতের একটি মানচিত্রে গঙ্গা নদীর তীরে 'পাবনা' নামের স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় (হাবিবুল্লাহ্, ২০০৯)। যদুনন্দন রচিত 'ঢাকুর' গ্রন্থে নরসিংহদাস বংশের বিবরণে পাবনা নামের একটি গ্রামের প্রমাণ মেলে।

শ্রী কৃষ্ণচরণ মজুমদার তার 'ঢাকুর ও সমালোচনা' গ্রন্থে পাবনার উল্লেখ করেন:

> The greater part of the province of Paundrabardhana to be the north of the Ganges including Gauda and Pabna. (উদ্ধৃত, হাবিবুল্লাহ্, ২০০৯)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্মকর্তা জেমস গ্রান্টের ১৭৮৮ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৫৮০ সালে টোডরমল সম্রাট আকবরের ভূমিমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে বাংলা প্রদেশকে ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগনায় বিভক্ত করেন (সাহা, ২০০৪)। এই সময়ে বাজুহা, বারবাকাবাদ ও মাহমুদাবাদ এই তিন সরকারের অংশ নিয়ে পাবনা জেলা গঠিত হয় (হাবিবুল্লাহ্, ২০০৯)। পরবর্তীকালে বাংলায় জমিদার প্রথা প্রবর্তিত হলে এই জেলা প্রথমে সাঁওতলরাজ ও পরে নাটোর রাজার অধীন বৃহত্তর রাজশাহী জেলার জমিদারির অন্তর্গত পরগনা ভাতুরিয়ার অধীনস্ত হয় (জাহেদী, ১৯৯৯)। মেজর রেনেলের মানচিত্রে প্রমাণ মেলে যে, পাবনার অধিকাংশ ভূভাগই ছিল ভাতুরিয়ার অন্তর্গত (তালুকদার, ১৯৯১)।[২] উপনিবেশিক শাসনামলের প্রথম অংশে পাবনা বৃহত্তর রাজশাহী জেলার অংশ ছিল এবং ব্রিটিশ রাজের সময়ে এটি নাটোর রাজের অধীনে আসে (Mottalib, 2017)। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সময়ে জেলাটি প্রধানত রাজশাহীর জমিদারি ভাতুরিয়া চকের এবং অংশবিশেষ বড়বাজু ও কাগমারী জমিদারের অধীনে ছিল (O'Malley, 1923)। পরবর্তীতে ১৭৭২ সালে বাংলায় জেলা ব্যবস্থার উদ্ভব হলেও এবং সেই সময় পাবনা জেলা গঠনগত পূর্ণাঙ্গতা লাভ করলেও ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়েও পাবনা জেলার অধিকাংশ এলাকা রাজশাহী ও যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল (Mottalib, 2017)। পূর্বতন রাজশাহী জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিপূর্ণভাবে পাবনা জেলার জন্ম হয় ১৮২৮ সালের ১৬ই অক্টোবর (হাবিবুল্লাহ্, ২০০৯)। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে ১৮৭২ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত সময়কালের পাবনাকে একটি ছোটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জেলা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (Mottalib, 2017)। সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তনের বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে পাবনা জেলা ভেঙে বর্তমানের পাবনা ও সিরাজগঞ্জ নামের দুইটি পৃথক জেলার সৃষ্টি হয় (খান, ২০১৪)।

বর্তমানে পাবনা জেলায় ৯টি উপজেলা, ৭২টি ইউনিয়ন, ১৫৩৬টি গ্রাম আছে। উপজেলাগুলো হলো পাবনা, সাঁথিয়া, চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, বেড়া, সুজানগর, ফরিদপুর, আটঘরিয়া ও ঈশ্বরদী । এই জেলার উত্তরে নাটোর, রাজশাহী, বগুড়া ও ময়মনসিংহ, আর দক্ষিণে পদ্মা নদীর অবস্থান যা পাবনা জেলাকে আরো দক্ষিণের কুষ্টিয়া (নদীয়া) ও রাজবাড়ী (পূবর্তন ফরিদপুর) থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পাবনার পূর্বদিকে যমুনা নদীর অন্য পাড়ে ময়মনসিংহ, টাংগাইল, মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলা অবস্থিত। পাবনার পশ্চিম দিকের কিছু এলাকা জুড়েও পদ্মা নদী ও রাজশাহী জেলার অবস্থান লক্ষ করা যায়। ভৌগোলিকভাবে জেলাটি রাজশাহী বিভাগের দক্ষিণ পূর্বাংশে ২৩°৪৮ ́ ও ২৪°২১ ́ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৯°০৫ ́ ও ৮৯°৪৪ ́ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত (জনশুমারি ও গৃহগণনা রিপোর্ট, ২০২২: xxvii)।

ভূমিজ জাতিসত্তা ও পাবনা জেলায় তাদের আগমন

পাবনা জেলায় আগমনকারী বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ভূমিজদের একটি ক্ষুদ্র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। রিজলির মতে, এদের আদি বাসস্থান ছিল ভারতের হাজারিবাগ ও ছোটোনাগপুর। পরবর্তীতে তারা পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, শিউরীতে বিস্তৃত হয় (মুরমু, ২০১১)। কৃষিভূমিকে জীবিকা হিসেবে বেছে নেওয়ায় তারা 'ভূমিজ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পাবনা জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত রাজবংশীদের বসবাস শুরু হয় মূলত ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন আমলেই বা এর কিছুকাল পূর্বে (মুরমু, ২০১১)। তবে কবে থেকে তারা এখানে বসবাস করছে তার সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই এলাকায় তাদের বসবাস যে বহু পুরাতন এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের জমিজমার সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ থেকে (সরকারি নথি সংগ্রহ, ২০২২)। বিশ শতকের প্রথম দিকে সিলেট অঞ্চলে জীবিকার উদ্দেশ্যে এরা আসে। ধারণা করা যায়, সমসাময়িক সময়ে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পাবনা অঞ্চলেও তাদের আগমন ঘটতে পারে।

ভূমিজদের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির স্বরূপ

অর্থনৈতিকভাবে পাবনা জেলার ভূমিজদের সামাজিক অবস্থান মধ্যমানেরও নয়, তারা নিম্নবিত্ত বা এক-দুইজন নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনযাপন করে। তাদের অধিকাংশের ঘরবাড়িই গ্রামের সাধারণ অন্যান্য বাড়িঘরের মতোই। টিনের চালা, কাঁচা সেমিপাকা ঘর, কিছু ক্ষেত্রে কাঁচা ঘর তাদের গৃহস্থালির প্রকৃতি। তাদের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। অধিকাংশ পরিবারের ল্যাট্রিন সেমিপাকা। কিছু এনজিও-এর সহায়তায় তাদের বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য টিউবওয়েল দেয়া হয়েছে এবং অধিকাংশই স্যানিটেশনের আওতায় আছে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারায় ভূমিজরা নিজেদেরকে 'ক্ষত্রিয়' হিসেবে মনে করলেও বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়ে তারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মর্যাদা পেয়েছে। তাদের পরিবার কাঠামো সমতলের অন্যান্য নৃগোষ্ঠীগুলোর মতো পিতৃতান্ত্রিক হওয়ায় তাদের পরিবারে নারীর মর্যাদা পুরুষের নিচে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ভূমিজ নারীরা এখনও তেমন অগ্রসরমান নয়। তবে ভোটাধিকারের মাধ্যমে তারা রাজনৈতিক মত প্রকাশ করে থাকে। তবে পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণে তাদের ভূমিকা যথেষ্ট নয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে পুরুষদের প্রাধান্য বেশি হওয়ায় ভূমিজ নারীরা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে না। তবে শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন চলমান আছে। অতীতে ভূমিজ মেয়েরা সম্পদবঞ্চিত ছিল। তবে বর্তমানে তারা কিছু সম্পদের অধিকারী হয়। তাদের অনেকেরই নিজস্ব ভূমিও আছে।

অতীতে ভূমিজরা বিভিন্ন জঙ্গল থেকে খরগোশ, কাঁকড়া, কাছিম, বাদুর, বনবিড়াল, শূকর, শিয়াল শিকার করে ক্ষুধা নিবারণ করত। কেউ কেউ বুনো আলু

তুলে এনে খেতো। জানা যায়, মাত্র পনেরো বছর পূর্বেও মহিলারা বিল থেকে শামুক কুড়িয়ে এনে খেতো (সাক্ষাৎকারদাতা ১, ২০২৪)। বর্তমানে আধুনিক পরিবেশে অভিযোজনের কারণে তারা অতীতের খাদ্যাভ্যাস প্রায় ত্যাগ করেছে এবং তাদের খাদ্যাভ্যাসে নানা পরিবর্তন এসেছে। তাদের বর্তমান খাদ্যাভ্যাস এদেশের সাধারণ মানুষের খাদ্যাভ্যাস থেকে প্রায় অভিন্ন। অন্যদিকে আবার, তাদের পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে এদেশের সাধারণ মানুষের লুঙ্গি, প্যান্ট, জামা, গেঞ্জি, স্যান্ডেলসহ সাধারণ জামা-কাপড়কেই নির্দেশ করে। তাদের বয়স্ক মহিলারা শাড়ি পড়ে, অনেক মহিলাই হাতে বালা ও নাকে নোলক পড়ে। অল্পবয়সি মেয়েরা চুলে বেণী করে, পায়ে আলতা দেয়। বিবাহিতা মহিলারা মাথায় সিঁদুর দেয় ও হাতে সাদা শাঁখা পরে।

ধর্মগত দিক থেকে আদিতে একটা সময়ে ভূমিজদের কাছে ধরম দেওয়া, জাহুবোড়া, বরম দেওয়া, সিংবোঙ্গা পূজনীয় থাকলেও বর্তমানে তারা আদি ধর্ম ও রীতিনীতি ছেড়ে সনাতন ধর্মের অনুসারী হয়েছে। একারণে তাদেরকে বাংলাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর মূল স্রোতধারার সাথে মিশে তাদের মতোই বারোয়াড়ি পূজা করতে দেখা যায়। আবার গৃহের উন্নতির জন্য তারা সকাল ও সন্ধ্যায় মৃদু ঘণ্টা বাজিয়ে গৃহস্থালির দেবতার পূজাও করে। তাদের মাঝে লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতি পূজার প্রচলন আছে। এছাড়াও তারা শিবপূজা করে। অন্যদিকে তারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য কারমা ও টুসু ধরে রেখেছে। ভূমিজরা বেশ কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত, যেমন- ষাঁড়, কাছিম, বাউন্দ্রা, সোনা, ট্রেশা, কাইট্রা, গরুড়, ভুগল, বান, নাগ ইত্যাদি (সাক্ষাৎকারদাতা ২, ২০২৪)।

শিশু জন্মের ক্ষেত্রে ভূমিজদের নিজস্ব কিছু আচার রয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, ভূমিজ পরিবারগুলো তাদের সন্তানসম্ভবা মহিলাদের বিশেষ যত্ন নেয়। অনেক সময়ই তাদের হাতের বাহুতে মন্ত্র পড়ে তাবিজ পরানো হয়। এর মাধ্যমে অপয়া শক্তির প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলে তাদের বিশ্বাস। এসময় তাদের ভারী কাজ করতে দেওয়া হয় না। গর্ভধারণের পাঁচ-ছয় মাসে ভূমিজ সন্তানসম্ভবা মহিলারা পিতৃগৃহে যায়। এসময় তাদের ‘সাধভক্ষণ’ করানো হয় ও নানারকম উপহার প্রদান করা হয়। তাদের পুত্র সন্তানের জন্ম হলে পাঁচবার ও কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তিনবার উলুধ্বনি দেওয়া হয়। সন্তান জন্মের ছয়দিন পর ‘ষষ্ঠীপূজা’ করা হয় আর একমাস পর সন্তানের কেশমুণ্ডন ও মায়ের হাত-পায়ের নখ কর্তন করা হয়। পুত্র সন্তানের সাত বছর বয়সে ‘উপনয়ন প্রদান’ ও ‘পৈতা দেয়া’র রীতি ভূমিজদের মধ্যে আছে। এই অনুষ্ঠানে অতিথিদের জন্য ভোজের আয়োজন করা হয় এবং অতিথিরা সন্তান ও তার পরিবারের জন্য উপহার প্রদান করেন। তবে স্থানভেদে এই আনুষ্ঠানিকতার কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাঘলবাড়ির ভূমিজরা সন্তান জন্মের তিনদিন বা সাতদিন পর ‘সূর্যাহি’ বা ‘ছোটো কামান’ উৎসব করে। এই আয়োজনে তারা সন্তানের মঙ্গল কামনায় বিশেষত ছেলে শিশুর দীর্ঘায়ু কামনা করে পরিবারের সদস্যরা শিশুসহ কেশমুণ্ডন করে। এই সময়ে

প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত করে ঐতিহ্যবাহী নানা খাদ্য, যেমন- শূকরের মাংস, মুরগির মাংস বা শামুক খেতে দেয়া হয়। এই আনুষ্ঠানিকতায় পানীয় হিসেবে 'পচানি'-এর ব্যবহারও দেখা যায় (ফেরদৌসী ও গাইন, ২০১৫)।

ভূমিজদের নিজ গোত্রের মধ্যে সাধারণত বিবাহ হয় না। তবে সময়ের পরিবর্তনে বর্তমানে পূর্ববর্তী অনেক প্রথা এখন বিলুপ্ত হয়েছে। যেকোনো হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সাথেই এখন বিবাহ হচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে যৌতুক নিষিদ্ধ হলেও অধিকাংশ বিয়েতে যৌতুকের প্রচলন দেখা যায়। পাত্রভেদে পঞ্চাশ হাজার থেকে দুই লক্ষ পর্যন্তও যৌতুক দেয়া হয়, যা দিতে তাদের অনেক পরিবারই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে যায়। অন্যদিকে আবার, সরকারিভাবে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হলেও প্রশাসনের অজ্ঞাতে অনেক দরিদ্র ভূমিজ পরিবার তাদের মেয়েদের বিবাহ দিয়ে দেয় বাল্য বয়সেই।

ভূমিজরা দেওয়ালির সময় 'বন্দনা উৎসব' পালন করে। পৌষ সংক্রান্তিতে তারা 'টুক পর্ব' উদ্‌যাপন করে। এসময় তারা পিঠা-পায়েস রান্না করে। নিজস্ব বিশেষ গান বা নাচ না থাকলেও উৎসব পর্বে তারা ঢিমে তালে গান গেয়ে একসাথে বিশেষ ঢঙে নাচে। সনাতন ধর্মের অনুসারী হওয়ায় ভূমিজরা মূলত বাড়োয়ারি মন্দিরের পূজা উৎসব পালন ও ধর্মীয় কৃষ্টি অনুসারে উৎসব পালন করলেও এক্ষেত্রে তাদের কিছু নিজস্বতা পরিলক্ষিত হয়। তারা 'কারমা বা কারাম বা ডাল উৎসব' পালন করে। এসময় তাদের মাঝে একসময় কারমা গাছের ডালে পিঠা ও টাকা বেঁধে রাখার রীতি প্রচলিত ছিল, যার এখন প্রচলন নেই। তবে এখনও এ উৎসবে মেয়েরা নিজস্ব ঝুমুর গীত গায় ও ঝুমুর নাচ নাচে। তাদের এই গীত ও নাচ কারাম উৎসব পালনকারী অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায় তথা মুণ্ডা, মাহাতো প্রভৃতি থেকে আলাদা ধরনের। ভূমিজদের অন্যান্য উৎসবের মধ্যে 'সহরাই' অন্যতম প্রধান উৎসব। শ্যামাপূজা বা কালীপূজার দিনেই এই উৎসব করা হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে এরা 'টুসু পর্ব' পালনে 'টুসু গান' করে:

চলগো ললিতা যমুনায়
বাঁশি কে বাজায়, ঐ ঘাটে শোনা যায়
যখন আমি রাঁধতে বসি
তখন কালায় বাজায় বাঁশি
রাঁধা-বাড়া রেখে আমি কেমন করে আসি গো (ফেরদৌসী ও গাইন, ২০১৫)।

ভূমিজ পুরুষ বা মহিলার মৃত্যু হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্মশানে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। তবে যাদের সক্ষমতা হয়, ইচ্ছানুসারে তাদের গেড়ো দেওয়া বা চিতায় পোড়ানো হয়। তবে ভূমিজ মৃত্যুর পর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের খাওয়ানোর রেওয়াজ প্রচলিত আছে।

ভূমিজদের অনেকেই আগে ভুতে ধরা বিশ্বাস করতো। তবে সময়ের পরিবর্তনে আধুনিকতার সংস্পর্শে তাদের আদি বিশ্বাসে অনেক পরিবর্তন এসেছে (সাক্ষাৎকারদাতা ৩, ২০২৪)। আবার চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওঝা বা কবিরাজি চিকিৎসা একসময় তাদের

মাঝে প্রচলিত ছিল। এখনো আটঘরিয়া উপজেলার রাধানগর ও ধলেশ্বর গ্রামে তাদের নিজস্ব ভেষজ ও কবিরাজি চিকিৎসা দেখা যায়। তবে দারিদ্র্যের কারণে এখনো ভূমিজদের অনেকেই যথাযথ চিকিৎসা সেবা পায় না। বাঘলবাড়ি এলাকার ভূমিজরা জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারাশ সদর হাসপাতাল বা সিরাজগঞ্জ সদরে চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকে আর আটঘরিয়া উপজেলার রাধানগর ও ধলেশ্বর গ্রামের ভূমিজরা চিকিৎসায় আটঘরিয়া উপজেলা কমপ্লেক্স বা পাবনা সদর হাসপাতালে যায়। তবে উভয় এলাকাতেই ভূমিজ শিশুদের সবাই বাংলাদেশ সরকার গৃহীত 'সার্বিক টিকাদান কর্মসূচি'-এর মাঝে আছে।

পাবনা জেলা শতভাগ বিদ্যুতায়িত হওয়ায় এখানের ভূমিজ পরিবারগুলোর একটি বড়ো অংশের বিনোদনের উৎস স্যাটেলাইট টেলিভিশন। ভূমিজ পুরুষেরা ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, বাঘডাসা খেলতে পছন্দ করে। তাদের শিশুরা দোলনায় দোল খাওয়া, মার্বেল খেলা, কুতকুত, গোল্লাছুট, চাকা দৌড়ানো প্রভৃতি গ্রাম্য প্রচলিত খেলার মাধ্যমে বিনোদন লাভ করে।

ভূমিজ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

দারিদ্র্য ভূমিজদের প্রায় সবারই নিত্যসঙ্গী, খুব অল্প সংখ্যক ভূমিজ পরিবারই সচ্ছল, তবে এই সচ্ছলতার জন্য তাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তাদের শিশুরা অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে অনেকেই অভাবের কারণে বিদ্যালয় ছেড়ে দেয় (সাক্ষাৎকারদাতা ৪, ২০২৩)। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের যৎসামান্য অগ্রগতিতে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা রয়েছে। তাদের অল্পকিছু সংখ্যক উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে পৌঁছে। তাদের মাঝে উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোদের মধ্যে দুইজন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। অন্যদিকে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দশজন ছেলে শিক্ষার্থী এমএ পাশ করলেও একজন মেয়েও নেই। বর্তমানে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ মিলিয়ে প্রায় বিশজন ভূমিজ শিক্ষার্থী অনার্স পর্যায়ে শিক্ষাগ্রহণ করলেও বাঘলবাড়ি থেকে এখনো অপূর্ব ছাড়া আর কেউই অনার্স পাশ করতে পারেনি। বাঘলবাড়ির মেয়ে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই অষ্টম শ্রেণির গণ্ডি পেরিয়ে নবম শ্রেণিতে উঠতে পারে না, বর্তমান সময়ে এসে কেবল একজন মেয়ে শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। এযাবৎকালে বাঘলবাড়ি এলাকায় কেবল একজন মেয়ে এইচএসসি পাশ করেছে, তবে বিবাহ হয়ে যাওয়ায় তার শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে (সাক্ষাৎকারদাতা ৫, ২০২৩)। আটঘরিয়া উপজেলার রাধানগর ও ধলেশ্বর গ্রামে ভূমিজদের দারিদ্র্য ও শিক্ষার অবস্থা বাঘলবাড়ি থেকেও পশ্চাৎপদ। তাদের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষায় অংশ নিলে বা এই পর্যায় অতিক্রম করলেও অধিকাংশই মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোতে পারে না। পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে তারা বিভিন্ন কাজের সাথে সংযুক্ত হয়। পাবনার ভূমিজ অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে পাঠাগারের অভাব রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক

সময়ে বাঘলবাড়ির পার্শ্ববর্তী নওগাঁ বাজারে 'রোদ্ধা' নামে একটি পাঠাগার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য গড়ে তোলা হলেও ভূমিজসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজন এটা থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পাচ্ছে।

পাবনা জেলার ভূমিজদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। আগে কেউ কেউ নিজ জমিতে চাষাবাদ করলেও বর্তমানে অধিকাংশই ভূমিহীন এবং অন্যের জমি চাষ করে। ভূমিজ মহিলারাও কৃষিজমিতে কাজ করে। বছর পনেরো আগেও বাঘলবাড়ি অঞ্চলের অনেক মহিলা ব্যানাফুল এনে ঝাড়ু বানাতো যা এখন মাত্র একজন বয়স্ক মহিলা ধরে রেখেছে। এটি তার পরিবারের উপার্জনের উৎস। ভূমিজ পুরুষ-মহিলাদের অনেকেই দিনমজুরের কাজ করে। এসব কাজ করে উপার্জিত দৈনিক প্রায় তিনশ টাকা উপার্জন তাদের জন্য পরিমিত নয়। এই কারণে তাদের অনেক শিশু 'শিশুশ্রমে'র মাঝে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের অপরিমিত উপার্জন দারিদ্র্য বিলোপ ও ক্ষুধা মুক্তিতে যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে, তাদের শোভন কাজের সুযোগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভবনাও খুবই সীমিত। সাম্প্রতিককালে অপূর্ব কুমার সিং নামে একজন ভূমিজ সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া কলেজ থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং থেকে অনার্স পাশ করে নিজ উদ্যোগে বাঘলবাড়িতে কম্পিউটারের দোকান দিয়েছে। এই কাজে PCD (Programme for Community Development) নামের এনজিও থেকে সে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছে। এজন্য তাকে মাসে দশ হাজার টাকা কিস্তি ও ইচ্ছেমতো সঞ্চয় জমা দিতে হয়। তার ভাই অষ্টম শ্রেণি পাশ করে ঢাকার পূর্বাচলে একটি ভ্যাটেইনারি হসপিটালে অফিস সহকারীর পদে চাকরি করে। ভূমিজদের মধ্যে বেকারত্ব নেই, আর অধিকাংশের দৈনিক গড় আয় প্রায় ৪০০ টাকা। অনেকে দিনে প্রায় ১৫০০ টাকা পর্যন্ত গড়ে উপার্জন করে। তারা মোটামুটিভাবে সচ্ছল জীবনযাপন করে (সাক্ষাৎকারদাতা ৫, ২০২৩)।

ভূমিজ বিপন্ন ভাষা ও শিক্ষার প্রেক্ষাপট

ভূমিজদের ভাষা মূলত 'খেলওয়াল' (Kherwars or Kharwars) ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত (স্বরোচিষ সরকার, ২০১৮)। আর্যদের আক্রমণে সাঁওতালদের মতো এরাও বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। G. A. Grierson-এর *Linguistic Survey of India* গ্রন্থে ভূমিজদের উল্লেখ আছে :

> Santali, Mundari, Bhumij, Koda, Ho, Turi, and Korwa are only slight differing forms of one and the same language. All these Tribes are accounting to Santali traditions decended from the same stock and were once known as Kherwars or Kharwars. (উদ্ধৃত, স্বরোচিষ সরকার)।

ভূমিজরা মুণ্ডা ভাষায় কথা বলত। কারো কারো মতে, তাদের ভাষা 'ভূমিজ' বা 'হরকাজি' ভাষা। তাদের লিখিত বর্ণমালা ছিল যা এখনো ভারতের আসাম, বিহার,

ত্রিপুরাসহ পশ্চিমবঙ্গের অনেক এলাকায় প্রচলিত আছে। এর লিখিত রূপ অনেকটা 'মারমা'-দের অক্ষরের মতো। এর কথকরূপও আছে। ধারণা করা হয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী হয়ে ভারত থেকে এদেশে ছড়িয়ে পড়ার সময়ে স্থানান্তরের প্রভাবে তাদের ভাষার অনেক বিবর্তন হয়েছে (সাক্ষাৎকারদাতা ৩, ২০২৪)। তবে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক টানের সাথে এই ভাষার অনেকটা মিল আছে। ভূমিজদের অনেকে অবশ্য 'সাদরি' ভাষায় পারদর্শী (সাক্ষাৎকারদাতা ৩, ২০২৪)।

ভূমিজরা নিজ ভাষায় শিক্ষা নিতে পারে না। এই কারণে তাদের শিশু শিক্ষার্থীরা নিজ ভাষার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। এমনকি তারা নিজ ভাষা শিখতে আগ্রহীও হচ্ছে না, বরং বাংলা ভাষী শিক্ষার্থীদের সাথে একই শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণ করায় বাংলা ভাষায় তাদের অভ্যস্ততা বাড়ছে। তাদের জন্য বিশেষায়িত কোনো বিদ্যালয়ও নেই। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শ্রমবিষয়ক কনভেনশনের উল্লেখ পাওয়া যায় 'Indigenous and Tribal Peoples Convension, 1989 (No. 169), International Labour Organization, New York'-এ। ২০০৬ সালে ঘোষিত জাতিসংঘ কর্তৃক আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাতেও আদিবাসী শিশুদের সকল অধিকারের কথা বলা হয়েছে, যেখানে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত ২০০৮ সালের ঘোষণাটির ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের ১ নম্বর ও ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়:

> Indigenous peoples have the right to establish and control their educational systems and institutions providing education in their own languages, in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning. States shall, in conjunction with indigenous peoples, take effective measures, in order for indigenous individuals, particularly children, including those living outside their communities, to have access, when possible, to an education in their own culture and provided in their own language." (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2008).

অন্যদিকে, ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি'-এর একটি ধারা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান (শান্তি চুক্তি, ১৯৯৭)। পরবর্তীতে ২০১০ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার স্বীকৃত হয় (জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০)। এর ধারাবাহিকতায় মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে পাঁচটি ভাষায় আদিবাসী শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ পায় (ইয়াছমিন, ২০২৪)। তবে এই ভাষাগুলোর মধ্যে ভূমিজদের ভাষা অন্তর্ভুক্ত নয় বলে ভূমিজ শিশুরা তাদের অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে।

বয়স্করা 'ভূমিজ' ভাষায় কথা বলতে পারলেও নতুন প্রজন্ম বাংলাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বর্তমানে 'ভারতীয় ভূমিজ সমাজ' নামের একটি সংগঠন তাদের নিজস্ব ভাষার স্বীকৃতির জন্য ভারতে আন্দোলন করছে। আমাদের দেশে এর প্রেক্ষাপট অবশ্য ভিন্ন। পাবনা জেলার ভূমিজদের ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেলেও এর বিলুপ্তির আশঙ্কাই হয়ে উঠেছে প্রধান। এর উত্তরণে অবশ্য ব্যক্তি পর্যায়ে বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে সীমিত পর্যায়ে কার্যক্রম চলছে। বাঘলবাড়ির অপূর্ব সিং ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম চালু রেখেছে, আবার ভাষাটি অন্যদেরকে শেখানোর জন্যও সে ব্যক্তি উদ্যোগে সীমিত পরিসরে নিজ এলাকায় একটি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্যদিকে আবার, ভূমিজরা, বিশেষত তাদের শিশুরা এই ভাষা নিয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করছে। অপূর্বর ভাষ্যমতে, "ভাষা নিজে জানলে অন্যকে জানানো যাবে, আবার অন্যরা নিজস্ব ভাষা শিখতে আগ্রহী। এই আকাঙ্ক্ষাই হয়তো লুপ্তপ্রায় ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখবে এই দেশে (সাক্ষাৎকারদাতা ৫, ২০২৩)।"

ভূমিজদের শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়ক কিছু ছাত্র সংগঠন আছে। এর মধ্যে 'Bhumij Indigenous Student's Association of Bangladesh (BISAB)' উল্লেখযোগ্য। ২০২২ সালের ২৬শে আগস্ট থেকে এর পথচলা শুরু হয়। সংগঠনটির সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বাঘলবাড়ি গ্রামের ভূমিজ সন্তান অপূর্ব কুমার সিং। এটি মূলত শিক্ষা নিয়ে কাজ করলেও ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়েও এর কাজ। প্রতিবছর এর কাউন্সিল হয়, সেখানে ভূমিজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে সফলদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া দুইজন শিক্ষার্থীকে ২০২৩ সালের কাউন্সিলে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া 'Indigenous Students' Council (ISC)' বা 'আদিবাসী ছাত্র পরিষদ' নামে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর আর একটি ছাত্র সংগঠনের সাথে ভূমিজ ছাত্রদের যোগসূত্র আছে। এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অনিল গাজর নীল আর ভূমিজ অপূর্ব কুমার সিং 'আদিবাসী ছাত্র পরিষদ', পাবনা জেলার আহ্বায়কের দায়িত্বে আছে। এসব সংগঠনগুলো ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে কাজ করে (সাক্ষাৎকারদাতা ৫, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, নভেম্বর ১৭, ২০২৩)।

ভূমিজ অধিকারের অন্যান্য প্রেক্ষিত ও সংগঠনের ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯১ সালে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে (১৯৮৯) স্বাক্ষর করেছে (সৌরভ সিকদার, ২০১৯)। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৮-এর ১৬৯ নং কনভেনশনে আদিগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের পাশাপাশি ভূমি, সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসহ শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কনভেনশনের ৬ নং অনুচ্ছেদের ২৬ নং ও ২৭ নং ধারায় উল্লেখ আছে:

> Measures shall be taken to ensure that members of the peoples concerned have the opportunity to acquire education at all levels on at least an equal footing with the rest of the national community.

> Education programmes ... Appropriate resources shall be provided for this purpose. (Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989).

তথাপিও পাবনার ভূমিজরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তাসহ নানা বিষয়ে এখনও আশানুরূপ অগ্রগতি পায়নি। এর প্রমাণ মেলে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, চাটমোহর উপজেলা কমিটি বর্ধিত কমিটির সভার ব্যানার থেকে। সভায় 'আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই', 'সমতল আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন ও পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন কর' শিরোনামে নীতি-নির্ধারণী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে আবার, 'জাতীয় আদিবাসী পরিষদ' নামে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের একটি সংগঠন রয়েছে যার সাথে ভূমিজদের অনেকেই সম্পৃক্ত। তাদের নানা অধিকার আদায়ে সংগঠনটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

আটঘরিয়া উপজেলার রাধানগর ও ধলেশ্বর গ্রাম ও চাটমোহরের বাঘলবাড়িতে ভূমিজদের সমাজে নিজস্ব নেতৃত্ব আছে। তারা তাদের সম্প্রদায়ের নানা সমস্যা নিজেরাই সমাধানের চেষ্টা করে। তবে নিজেরা করতে ব্যর্থ হলে স্থানীয় কাউন্সিলর বা মেয়রের শরণাপন্ন হয়। তবে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতেই পছন্দ করে, সাধারণত নিজেদের বাইরে যেতে চায় না। পূর্বে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত এই সম্প্রদায়ে সমাজচ্যুতির বিধান ছিল। বিশেষত নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে বিবাহ বা বিবাদের কারণে তারা জরিমানা, সমাজখানা প্রভৃতি বিধান দিতো। তবে বৃহত্তর পরিসরে এই নেতৃত্বের তেমন কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি। বর্তমান নেতৃত্বও যথেষ্ট সাফল্য না পেলেও বৃহত্তর পরিসরে সম্প্রদায়ের ভাষা রক্ষা ও অধিকারের নানা প্রশ্নে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট আছে। এই সংগঠনগুলোকে সঙ্গী করে নানা আঙ্গিকে ভূমিজরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে এগিয়ে যাবার চেষ্টাও করছে। চাটমোহরের বাঘলবাড়ির ভূমিজ সমাজের তরুণ নেতৃত্ব অপূর্ব Human Rights Programme at United Nations Development Programme in Bangladesh এর ইউথ মেম্বারও হয়েছে।

উপসংহার ও সুপারিশসমূহ

জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেজ ২১শে এপ্রিল, ২০২৫ জাতিসংঘে তাঁর ভাষণে বলেন, "The world has much to learn from Indigenous Peoples' wisdom, insights and approaches." অর্থাৎ, "আদিবাসীদের প্রজ্ঞা, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও উপস্থাপন থেকে বিশ্বের শেখার আছে বহুকিছু।" মহাসচিব তাঁর ভাষণে আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অস্তিত্বের স্বীকৃতিকেই নির্দেশ করেন, যা প্রতিনিয়ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমাজে উপেক্ষিত। পাবনা জেলার ভূমিজদের অবস্থানও এর বাইরে নয়। একারণেই ধীরে ধীরে তাদের ভাষা সংস্কৃতিসহ নানা বিষয় বিপন্নতার দ্বারপ্রান্তে। এগুলোকে রক্ষা করতে রাষ্ট্র তার অধীন বিভিন্ন সংস্থাগুলোর সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, যার জন্য প্রয়োজন কৌশলী উদ্যোগের।[৩] তাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে

রাষ্ট্রীয় বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থের বরাদ্দ দিতে হবে। এক্ষেত্রে আবার দেশজ সমাজ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা তাদের উন্নয়নে গৃহীত নিজস্ব উদ্যোগের সাথে সমন্বয় করতে পারে। এভাবে তাদের বিভিন্ন সংকট উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যাপ্ত ও কার্যকরী না হলে ভূমিজদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্নতার মাঝে পড়বে। এই উদ্যোগগুলো যদি সফল হয়, তবে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি যেমন বাঁচবে, তেমনি তাদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে টিকে থাকবে।

টীকা

১ W W Hunter-এর *A Statistical Account of Brngal Vol. IX* গ্রন্থটিতে আমরা 'ভূমিজ' নামে একটি জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাই, পাবনা জেলায় যাদের জনসংখ্যা ছিল ১২৪ জন।

২ রেনেল ১৭৬৪ থেকে ১৭৭৭ সাল পর্যন্ত জরিপ পরিচালনা করেন এবং তার প্রণীত মানচিত্রের পূর্বে আরো ছয়টি মানচিত্র প্রণীত হলেও তার মানচিত্রটিকেই সর্বাধিক প্রথম সঠিক মানচিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়; পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলায় এখনও 'ভাতুরিয়া' নামের স্থানের অস্তিত্ব রয়েছে।

৩ বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৩ (ক), সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ১৪ নম্বর আইন)-এর ১৪ ধারা বলে ২৩ (ক) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান (১৯৭২ সালের আইন), ঢাকা, ২০১১ অনুসারে, 'রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বৈশিষ্টপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা করিবেন'; বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৩ (ক), সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ১৪ নম্বর আইন)-এর ১৪ ধারা বলে ২৩ (ক) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত।

তথ্য-নির্দেশ

ইয়াছমিন, উম্মে হাবিবা। (২০২৪)। *পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষা*। তাম্রলিপি: ঢাকা।

কামাল, মেসবাহ। (২০১৫)। মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পা.)। *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফীয় গবেষণা*। তিন খণ্ড। উৎস প্রকাশন: ঢাকা।

খান, শামসুজ্জামান (সম্পা.)। (২০১৪)। *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: সিরাজগঞ্জ*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ ২৩ (ক) অনুচ্ছেদ, ১৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রথম ভাগ, ৬ অনুচ্ছেদ, ৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঘোষিত প্রজ্ঞাপন (০৫ই চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৯শে মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ)।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২, জেলা রিপোর্ট: পাবনা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ২০২৪।

জলিল, মুহম্মদ আবদুল। (১৯৯১)। *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য ওরাওঁ*। ঢাকা সাহিত্য ভবন: ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০। (২০১০)। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার: ঢাকা।

জাহেদী, মনোয়ার হোসেন। (১৯৯৯)। *শতাব্দীর ছায়াপথে এডওয়ার্ড কলেজ*। পাবনা।

তালুকদার, আব্দুল মান্নান। (১৯৯১)। মনোয়ার হোসেন জাহেদী (সম্পা.)। ইতিহাসের অন্তরালে পাবনা, এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা শতবর্ষপূর্তি উৎসব স্মারক: ঢাকা।

নূরুন্নবী, মুহম্মদ। (১৯৭৬)। রূপে রূপান্তরে পাবনা: জনপদ ও লোক সংস্কৃতি। *শতবর্ষ স্মরণিকা*। পাবনা পৌরসভা। (প্রকা. আলতাফ হোসেন। চেয়ারম্যান, পাবনা পৌরসভা: পাবনা।

পারভীন, সুলতানা আইরিন। (২০০৯)। বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসী জীবনে পরিবর্তন: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা। (অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ)। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: রাজশাহী ।

ফেরদৌসী, জান্নাত-এ ও গাইন, বৃতিসুন্দর। (২০১৫)। "ভূমিজ"। মেসবাহ কামাল (সম্পা.)। *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা। তৃতীয় খণ্ড।* উৎসব প্রকাশন: ঢাকা।

বেগম, আয়শা। (২০০২)। *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন: ঢাকা।

ভূমি অফিসের রেকর্ডবুক, হাণ্ডিয়াল ভূমি অফিস: চাটমোহর, পাবনা।

মওলা, গাজী গোলাম। (২০১৩)। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সংস্কৃতি: পরিপ্রেক্ষিত চাকমা মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী। (অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ)। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: চট্টগ্রাম।

মজিদ, মুস্তফা। (১৯৯১)। *ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিচয়।* বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

মুরমু, মিথুশিলাক। (২০১১)। *আদিবাসী অন্বেষণ।* নওরোজ কিতাবিস্তান: ঢাকা।

'শান্তি চুক্তি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি'। (১৯৯৭)। শান্তিচুক্তি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়: ঢাকা।

শিকদার, সৌরভ। (২০১১)। *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

সরকার, পূরবী। (২০১৪)। *নাটোর জেলার পাহাড়িয়া আদিবাসী।* (অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ)। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: রাজশাহী।

সরকার, স্বরোচিষ (সম্পা.)। (২০১৮)। *বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তার আত্মপরিচয়।* ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: রাজশাহী ।

সাত্তার, আব্দুস। (১৯৭৮)। *আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য*। বাংলা একাডেমী: ঢাকা।

সাহা, রাধারমণ। (২০০৪)। *পাবনা জেলার ইতিহাস* (১-৬ খণ্ড একত্রে)। দে'শ পাবলিশিং: কলকাতা।

সিকদার, সৌরভ। (২০১৯)। *বাংলাদেশের আদিবাসী।* মওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

সুলতানা, আবেদা। (২০০২)। সাঁওতাল সংস্কৃতিতে খৃষ্টধর্মের প্রভাব: রাজশাহী জেলার পাঁচটি গ্রামের উপর একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা। (অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ)। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: রাজশাহী।

সুলতানা, শাহনাজ। (২০০৩)। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন: নওগাঁ জেলার চারটি গ্রামের উপর একটি গবেষণা। (অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ)। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: রাজশাহী।

হক, মোহাম্মদ নাজিমুল (সম্পা.) (২০১৫)। *বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান*। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: রাজশাহী।

হাবিবুল্লাহ্, মোঃ। (২০০৯)। *পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি।* বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

Chowdhury, Mitu. (2015). Impact of modernizationon the life style of Manipurs: a sociological study. (An unpublished Ph.D. Thesis). University of Chittagong: Chittagong.

https://www.ilo.org (Accessed: 02 January, 2023).

https://www.ilo.org (Accessed: 25 January, 2023).

http://bdlaws.minlaw.gov.bd.act (Accessed: 02 January, 2023).

https://mochta.portal.gov.bd/ (Accessed: 18 January, 2023).

Hunter, W. W. (1876). *A Statistical Account of Bengal. Vol. IX.* Trubner & Co.: London.

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989. No.169. International Labour Organization: New York.

Mottalib, Md. Abdul. (2017). *The Socio-Economic History of Pabna District 1872-1935.* UGC: Dhaka.

O'Malley, L. S. S. (1923). Bengal District Gazetteers, Pabna. Bengal Secretariat Book Depot: Culcutta.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 2008. United Nations: New York.

সাক্ষাৎকারদাতা ১ (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২২.০৬.২০২৪)।
সাক্ষাৎকারদাতা ২, (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২২.০৬.২০২৪)।
সাক্ষাৎকারদাতা ৩, (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২২.০৬.২০২৪)।
সাক্ষাৎকারদাতা ৪, (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৭.১১.২০২৩)।
সাক্ষাৎকারদাতা ৫, (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৭.১১.২০২৩)।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান: তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা

নূর নাহার শারমিন সুলতানা*

Abstract: Mother language-based teaching is considered as an important prerequisite for inclusive and effective education. The importance of mother language in improving learning outcome, reducing knowledge divide and enhancing self-consciousness of the learners is well established. However, in many parts of the world, mother languages are at risk because of the dominance of colonial languages, particularly English. Although the use of mother language is somewhat encouraged at the primary level, its use in higher education is widely discouraged. Like other countries, it is happening in Bangladesh as well, which is having a negative impact on the mental and intellectual development of students. As a result, the students are facing a number of problems because they are trying to master a foreign language without acquiring solid foundation in their mother tongue. This is undermining the effectiveness of their education. This paper explores the significance of using mother language in education in the light of research data and practical examples from around the world. It also puts forward a number of recommendations for improving the situation.

মূলশব্দ (Keyword): মাতৃভাষায় শিক্ষাদান (mother language-based teaching), উচ্চশিক্ষা (higher education), অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (inclusive education), পরিভাষা (terninology), পাঠ্যপুস্তক (textbook)

ভূমিকা

ব্যক্তির সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব তার ভাষার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এ কারণে মাতৃভাষাকে গুরুত্ব না দিয়ে জ্ঞানার্জন বা শিশুর বিকাশের যেকোনো পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা

* Dr. Noor Nahar Sharmin Sultana, Assistant Professor, Department of Bengali Language and Literature, Southeast University, Dhaka, email: nurnahar.sarminsultana@seu.edu.bd

থেকে যায়। বিভিন্ন গবেষকের তত্ত্ব ও মতামতকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে Ross (2004) মাতৃভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে– 'পরিবার থেকে আয়ত্ত করা ভাষা; যে ভাষা পরিবারে ব্যবহৃত হয়; শিশু প্রথম যে ভাষায় কথা বলে; তার সমাজে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় এবং শিশু যে ভাষায় সবচেয়ে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে। এই ভাষা তার আত্মপরিচয় গঠন করে, তার গুণাবলিকে সংজ্ঞায়িত করে।' Bloch (n.d.) মনে করেন, শিশু স্কুলে যেতে শুরু করার আগে যে ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে, তার জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সব ক্ষেত্রে যে ভাষায় আত্মবিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করতে পারে সেটিই তার মাতৃভাষা। তার পিতা বা মাতার ভাষাই যে তার মাতৃভাষা হবে সেটিও স্বতঃসিদ্ধ নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিভাষী শিশুর দুটো মাতৃভাষাও থাকতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিখনফলের উন্নতি এবং শিক্ষাদক্ষতার উন্নয়নেও এর গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষত শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে জ্ঞানবৈষম্য হ্রাস এবং শিক্ষার্থীর অনুধাবনক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে মাতৃভাষার অবদান অনস্বীকার্য। এ কারণে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বাড়লেও মাতৃভাষায় শিক্ষাচর্চা যে বাধাহীনভাবে অনুসৃত হতে পারছে তা-ও নয়। জনগণের অসচেতনতা, নীতিসংক্রান্ত দুর্বলতা, সমন্বয়ের অভাবসহ নানা কারণে এটি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক চিন্তাভাবনা এবং যথাযথ গবেষণার অভাবে সর্বস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব এখনও সমাজে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি।

জাতিসংঘের একাধিক নথি ও ঘোষণায় সবার জন্য শিক্ষা এবং শিক্ষায় সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের 'International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights'-এ শিক্ষায় মৌলিক অধিকারের মূলনীতি হিসেবে সহজলভ্যতা, অভিগম্যতা, গ্রহণযোগ্যতা ও অভিযোজনযোগ্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মাতৃভাষায় শিক্ষাসামগ্রী সহজলভ্য না হলে সেটি অবশ্যই শিক্ষার্থীর মৌলিক অধিকার ভঙ্গের শামিল যা তার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে। ১৯৫৩ সালে ইউনেস্কো-এর 'The use of vernacular language in education' শীর্ষক প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়, 'এটি স্বতঃসিদ্ধ যে শিশুকে শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম তার মাতৃভাষা'। পরবর্তীকালে গবেষকরা ইউনেস্কো-এর এই মন্তব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ব্যক্তির 'ভাষাগত মানবাধিকার'-এর ধারণার প্রবর্তন করেছেন। এই ধারণার মর্মকথা হলো, প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের মাতৃভাষার সঙ্গে খুব সহজে সম্পৃক্ত হতে পারে, সে ভাষা সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু যারই হোক না কেন। শিক্ষায় সবার সমানাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কেবল শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাসই বৃদ্ধি করে না, তার চিন্তন দক্ষতা, শ্রেণি

কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আগ্রহ, উদ্ভাবনী সক্ষমতা এবং একাডেমিক সফলতা অর্জনেও সাহায্য করে। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করেই এটি বোঝা যায়। যারা মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে না তারা জ্ঞানার্জনের পথে সবসময় অদৃশ্য একটি বাধার সম্মুখীন হয়। সেই বাধা ভাষাগত বাধা, যেটি অতিক্রম করেই তাকে প্রতিটি কার্যক্রমে অংশ নিতে হয়। বর্তমান সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বড়ো প্রতিবন্ধকতাগুলোর একটি হচ্ছে 'ড্রপ আউট' বা ঝরে পড়া। ভাষাগত সমস্যার কারণে যেসব শিক্ষার্থী শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে তাদের মধ্যে স্বভাবতই ঝরে পড়ার হারও বেশি থাকবে। মাতৃভাষা শিক্ষাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানে বড়ো ধরনের অগ্রগতি অর্জন সম্ভব।

গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যক্তির মানস গঠন, তার সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ, মূল্যবোধের গঠন ও পরিবর্তন–প্রতিটি ক্ষেত্রেই মাতৃভাষা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। ভাষা মানব-অস্তিত্বের নির্যাস হিসেবে কাজ করে। নিজের আত্মার গভীরতম প্রদেশ থেকে উদ্ভূত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর অতুলনীয় সামর্থ্য প্রদান করে ভাষা। পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের বন্ধনকে নিবিড় ও সুদৃঢ় করতে মাতৃভাষার বিকল্প নেই। কারো কারো এই ভুল ধারণা আছে যে মাতৃভাষাভিত্তিক নিজস্ব সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়ার অর্থই হলো 'বিজাতীয়' বা 'ভিন্ন সংস্কৃতি'র সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করা। আদতে এটি সত্যি নয়। একটি শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী সংস্কৃতি চরিত্রগতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেই এটি নিজ স্বাতন্ত্র্যকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। কাজেই মাতৃভাষাকে আপন করে নেওয়া মানে বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটানো নয়। বহু সংস্কৃতির মিলন ও আন্তঃবিনিময়ের পরও মাতৃভাষা ও নিজ সংস্কৃতির লালন সম্ভব।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বিশ্বায়িত পৃথিবীতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার তাড়না এবং নানাবিধ ভুল ধারণা বা ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমরা এখনও শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হইনি। আমাদের দেশে যে প্রবণতাটি ব্যাপকভাবে লক্ষণীয় তা হচ্ছে, প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের লক্ষ্য অর্জিত হলেও পরবর্তী স্তরগুলোতে এটি ক্রমশই কম মনোযোগ পাচ্ছে। ফলস্বরূপ, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার হচ্ছে বাংলা ভাষা। এর নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সমাজে। 'আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শিক্ষার পত্তন'-রবীন্দ্রনাথের সেই প্রবাদপ্রতিম উক্তিকে অবহেলা করার কারণে স্বদেশি ভাষার দুর্বল গাঁথুনি নিয়ে ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা অর্জনের প্রয়াসে ইংরেজি বা বাংলা, কোনো ভাষাতেই কার্যকর দক্ষতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে শিক্ষায়, প্রধানত উচ্চশিক্ষায়, মাতৃভাষা বাংলা ব্যবহারের সমস্যা-সম্ভাবনা বিশ্লেষণের আলোকে পরিস্থিতির ইতিবাচক উন্নতির

ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সরকারি নীতি-সহায়তা এবং যথাযথ গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

শিক্ষার নানা পর্যায়ে মাতৃভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টিতে সবার মধ্যে ঐকমত্য থাকলেও মাতৃভাষার ব্যবহার ঠিক কীভাবে শিক্ষার্জন ও অধীত শিক্ষাকে বুনিয়াদি করতে সাহায্য করে সে বিষয়ে অনেকের ধারণাই স্পষ্ট নয়। এমতাবস্থায়, নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে:

ক) উচ্চশিক্ষাসহ শিক্ষার নানা স্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা অর্জন;
খ) শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া;
গ) শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের পথ সুগম করার জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান।

গবেষণা-পদ্ধতি

গবেষণা পরিচালনার প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক আধেয় বিশ্লেষণ (content analysis) করা হয়েছে। এজন্য প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক তথ্য উৎসের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। গবেষণাটিতে যেসব আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার বৃহদাংশ মানসম্মত আন্তর্জাতিক গবেষণা সাময়িকী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যেসব মূল শব্দ দিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: 'মাতৃভাষা' 'শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রয়োগ', 'উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার', 'উচ্চশিক্ষায় বাংলা পাঠ্যবই ও সহায়ক পুস্তক', 'শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নীতিমালা', 'উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা', 'উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারের সুপারিশমালা' ইত্যাদি। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ পাঠপূর্বক গবেষণার উদ্দেশ্যাবলির সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা অন্বেষণ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধসমূহ থেকে তথ্য আহরণ করা হয়েছে।

পূর্বগবেষণা সমীক্ষণ

একুশ শতকের বিশ্বায়িত এই পৃথিবীতে নানাবিধ সংকট ও সম্ভাবনাকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলছি আমরা। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ আমাদের জীবন ও চিন্তাধারায় এনেছে আমূল পরিবর্তন। একই সঙ্গে আরেকটি ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যা হচ্ছে এক সংস্কৃতির ওপর অন্য সংস্কৃতির প্রভাব। ভাষাও এর বাইরে নয়। সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের কারণে হাতে গোনা কয়েকটি ভাষা, ইংরেজি যার মধ্যে অগ্রগণ্য, বিশ্বের বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন ও মননে এখনও প্রভাব রেখে চলেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাও ইংরেজি। ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতি-গবেষণা

ও জ্ঞানচর্চার প্রতিটি বিষয়ে ইংরেজির প্রভাব অনস্বীকার্য। বিভিন্ন সময় গবেষকরা ইংরেজির এই প্রভাবকে 'ইংরেজির সাম্রাজ্যবাদ' বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন (Finegan, 2011)। অনেকেই সর্বস্তরে ভিনদেশি ভাষা ইংরেজির ব্যবহারকে স্বদেশি ভাষাগুলোর জন্য এক ধরনের হুমকি হিসেবে দেখেছেন। ইউনেস্কোও স্বদেশি জনগোষ্ঠীর ওপর ইংরেজিসহ ঔপনিবেশিক ভাষা চাপিয়ে দেওয়াকে এসব ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে অনেক ভাষাকে সংকটাপন্ন বলেও চিহ্নিত করেছে ইউনেস্কো, যা বিশ্বের মোট ভাষার ৪০ শতাংশের মতো। ইউনেস্কোর তথ্যমতে, গড়ে প্রতি দুই সপ্তাহে একটি করে ভাষা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, যার সঙ্গে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য (UNESCO, 2025)।

শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হলে একদিকে যেমন তারা নিজ ইতিহাস ঐতিহ্যের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হতে পারে, তেমনি তাদের অধীত বিদ্যা টেকসই হয়। বিশ্বায়িত পৃথিবীতে একাধিক ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। দেখা গেছে, মাতৃভাষাকে আয়ত্ত করার পর দ্বিতীয় কোনো ভাষা শেখা তুলনামূলক সহজ হয়ে পড়ে। কারণ তখন শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে অর্জিত ভাষাশিক্ষার বুনিয়াদকে অন্যান্য ভাষা শিক্ষায় কাজে লাগাতে পারে। গবেষকদের মতে, মাতৃভাষায় দৃঢ় ভিত্তি থাকলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে প্রথম ভাষা (মাতৃভাষা) থেকে দ্বিতীয় ভাষায় শব্দ স্থানান্তর করা সহজতর হয় (Koyash, 2021)। একই গবেষণায় আফ্রিকার ১৪টি দেশে পরিচালিত এক সমীক্ষার উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষার্থী মাতৃভাষায় ভালোভাবে শিক্ষালাভ করে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার চেষ্টা করেছে তারা অন্যদের তুলনায় এ কাজে অধিক সফল হয়েছে। ভারতের ঝাড়খণ্ডে ২০১৩ সালে চালানো এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সেখানকার যেসব স্কুলে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিন্দি সেখানে প্রাথমিক স্তরের ৯৬ শতাংশ শিক্ষার্থী ক্লাসের পড়ালেখা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে না যেহেতু ঝাড়খণ্ডের গ্রামাঞ্চলে মাত্র ৪ শতাংশ শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা হিন্দি, বাকি ৯৬ শতাংশই নিজে গোত্র বা অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করে। একইভাবে, জাম্বিয়ার অ-ইংরেজি ভাষাভাষীদের জন্যও শিক্ষাদানের মাধ্যম ইংরেজি। সেদেশে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাথমিক, এমনকি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও পঠন-দক্ষতা বেশ কম। একইভাবে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা কারিগরি বিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীদের মধ্যেও পঠন-শিখন দক্ষতার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক রচনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রয়োগ সংক্রান্ত গবেষণার সিংহভাগেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সে বিচারে উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা তুলনামূলক কম গুরুত্ব পেয়েছে। তবে সংখ্যায় কম হলেও উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহারকে উপজীব্য করে বিশ্বের নানা প্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। Ahmed I Al-

Sabri (2020) আরব বিশ্বের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষার প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা করেছেন। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানগত উৎকর্ষ অর্জনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও ভাষিক পরিচয় সমৃদ্ধকরণে মাতৃভাষার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন তিনি। Wahhabi (2016) আলজেরিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় দক্ষতার অভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন। শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় অনুকূল ভাষিক-পরিবেশ (linguistic environment) বজায় রাখার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা-দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মাতৃভাষা-কেন্দ্রিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ও প্রদর্শনী আয়োজন, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ক্লাব গঠনসহ বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করেছেন এসব গবেষক।

Bialystok (2016) দেখিয়েছেন যে, দ্বিভাষিক শিক্ষার্থীরা তখনই শিক্ষাগত ও সামাজিকভাবে উচ্চতর দক্ষতার পরিচয় দেয়, যখন তারা তাদের মাতৃভাষা বা মূল ভাষার সঠিক ব্যবহার করতে পারে। মাতৃভাষায় শিক্ষাগত ও সামাজিক ও আবেগগত উৎকর্ষ অর্জন করতে পারলে শিক্ষার্থীরা সহজে সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়। ভাষিক ব্যবধানের কারণে নিজেকে প্রান্তিক বা বিচ্ছিন্ন মনে করার যে অনুভূতি, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সে অনুভূতি হ্রাস করতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন Barbaran et al (2025)। মাতৃভাষা উচ্চশিক্ষা অর্জনকে বাধাহীন ও ফলপ্রসূ করার জন্য উচ্চ মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক, ওয়ার্কবুক ও আনুষঙ্গিক তথ্যসামগ্রী প্রকাশ, শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও মানসম্মতকরণের ওপর জোর দিয়েছেন (Mehar, 2023)। এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরি বলেও মত প্রকাশ করেছেন তিনি।

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির এই যুগে মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বিদেশি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ক্ষতিকর প্রবণতা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন (ইসলাম, ২০২০)। এদেশের আদালতে, উচ্চশিক্ষায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাংলা আজ অপাংক্তেয় বলে মত প্রকাশ করেছেন তিনি। বাংলাদেশে বাংলা ভাষার অবমূল্যায়নের গতি ক্রমশ বেগবান হচ্ছে, এই বাস্তবতাকে নানা উদাহরণের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন। বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় বাংলা ভাষা ব্যবহারের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন (তপন, ২০২০)। পরিভাষা, জাতীয় প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণ, উচ্চশিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের স্বল্পতা ও নীতিসংক্রান্ত নানা দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে এসবের আশু সমাধানের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা, পরিভাষা ও আন্তর্জাতিকতা সংক্রান্ত যেসব অভিযোগ তুলে ধরা হয় সেগুলো খণ্ডন করেছেন (রফিক, ২০২০)। তাঁর মতে, ‘চীনা বা জাপানির মতো চিত্রলিপির জটিল বর্ণমালার ভাষায় যদি আণবিক গবেষণা, মহাকাশ গবেষণা পর্যন্ত চলতে পারে, তাহলে উন্নত বাংলা ভাষায় না পারার কারণ নেই।’ এক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাবকেই প্রধান সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি।

শিক্ষা ও মাতৃভাষার পারস্পরিকতা

অর্জিত শিক্ষাকে টেকসই করতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের তাৎপর্য অসীম। নিজ ভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে সাহায্য করে, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বাড়ায় এবং শিক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ইতিবাচক প্রভাব নানা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে (Nishanthi, 2020; Khan, 2014)। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থী জটিল বিষয়গুলোকে সহজে বুঝতে পারে এবং কোনো বিষয়ে সমালোচনামূলক চিন্তনের ক্ষমতা গড়ে ওঠে। গবেষকদের বিশ্লেষণ থেকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ইতিবাচক যেসব বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে সেগুলো নিম্নরূপ:

বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন: মাতৃভাষায় শিক্ষার্জনের সুযোগ পেলে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায়। মাতৃভাষায় শিক্ষণ-শিখন অধীত শিক্ষার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। এর ফলে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ ও যুক্তিপ্রয়োগের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে অধীত বিষয় যেমন সহজে বোঝানো যায়, তেমনি শিক্ষার্থীর জ্ঞানগত দক্ষতাও বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব (Dumatog and Dekker, 2003)।

ব্যক্তিগত উন্নয়ন: আত্ম-উপলব্ধি বা নিজের সম্বন্ধে জানার সুযোগ পেলে ব্যক্তিগত উন্নয়ন বা আত্মপরিচয় শনাক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। শৈশবকাল থেকে নিজের ভাষা শোনা, শেখা ও বলার ব্যক্তির আত্ম-উন্নয়নের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এর মাধ্যমে সে নিজের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি ও আবেগকেও নির্ভুলভাবে শনাক্ত করতে পারে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন: সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে বন্ধন দৃঢ় করে। মাতৃভাষা খুব সহজেই ব্যক্তির মনে তার ইতিহাস ও শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করে। বিশ্বায়নের প্রভাবে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে নিজ সংস্কৃতির সঙ্গে বন্ধন ব্যক্তির সামগ্রিক আত্ম-উন্নয়নের জন্য খুবই জরুরি (Nishanthi, 2020)।

যোগাযোগ দক্ষতা: শৈশবে আমরা পিতামাতা ও পরিবারের সদস্যদের কাছে যোগাযোগের মৌলিক দক্ষতা আয়ত্ত করি। এই যোগাযোগ মাতৃভাষাতেই সংঘটিত হয়, যা পরে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও যদি একই ভাষায় যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহলে তা শিক্ষার্থীর জন্য কার্যকর বলে বিবেচিত হয়, যা শিক্ষার্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষাদানে সহায়ক: বিশেষত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় শিক্ষাদান শিক্ষকদের

জন্যও সহজ ও কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। শিক্ষার্থীর উপযোগী ভাষায় তাকে পাঠদান করা গেলে সেই শিক্ষা বুনিয়াদি হয় (Noormohamadi, 2008)। স্পষ্টভাবে এবং কোনোরকম জটিলতা ছাড়াই শিক্ষক শিক্ষাদান করতে পারেন।

আত্মবিশ্বাসের স্ফূরণ: নিজ ভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ পেলে শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার ঘটে। মাতৃভাষায় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি কার্যকরভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বোধ কম থাকে এবং যেকোনো সমস্যা দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারে।

সমালোচনামূলক চিন্তনের সক্ষমতা: মাতৃভাষায় জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে অধীত বিষয়ের সম্পৃক্ততা গভীর হতে পারে। এটি বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নের দক্ষতা বাড়াবে। মাতৃভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশের সুযোগ পেলে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রশ্ন করতে, বিভিন্ন ধারণার আন্তঃসম্পর্ক খুঁজে পেতে ও উপসংহার টানতে সক্ষম হবে। (Cummins, 2007) মনে করেন, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ ঘটানোর জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর মাধ্যমে তারা জটিল সব ধারণার অনুধাবন ও প্রকাশে সমর্থ হয়।

ভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন: মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণ কেবল শিক্ষার্থীদের শিখন-দক্ষতা ও গভীরতাই বৃদ্ধি করে না, অন্যান্য ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও সহায়তা করে। বর্তমান বিশ্বে মাতৃভাষার পাশাপাশি দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষার্থীদের যখন নিজের ভাষায় গভীর দক্ষতা থাকবে তখন তারা অধিকতর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই দক্ষতাকে অন্য ভাষায় স্থানান্তর করতে পারবে এবং সহজেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা আয়ত্ত করতে পারবে।

সাংস্কৃতিক পরিচয় নিশ্চিতকরণ: প্রতিটি মানুষের একটি সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে। এ পরিচয় তার নিজ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করার মাধ্যমে তৈরি হয়। মাতৃভাষা ব্যক্তির স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটি তার মধ্যে আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত করে। সে সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতন হয়। পাঠক্রম, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, পাঠ্যবই–সবকিছুতেই আত্মপরিচয়ের প্রতিফলন পেতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে মাতৃভাষা, যা তার পাঠের ইচ্ছা ও প্রণোদনা বাড়ায় (Ahmad, 2020)।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা পরিবেশ: মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ তৈরি করে। এই পরিবেশ শিক্ষার্থীর ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে গুরুত্ব দেয়। বিশেষ করে ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে একাত্ম বোধ করে। ফলে তার মধ্যে প্রান্তিকতা ও বৈষম্যের অনুভূতি হ্রাস পায়। এ কারণে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করা উচিত, যাতে কোনো শিক্ষার্থীই নিজেকে বৈষম্যের শিকার বা ব্রাত্য মনে না করে।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিভিন্ন দেশ এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। (Ahmad, 2020) বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বিষয়ে অনুসরণীয় কিছু উদ্যোগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর ইউরোপীয় দেশ ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা মাতৃভাষাভিত্তিক ও দ্বিভাষিক (bilingual) শিক্ষাপদ্ধতির জন্য বিখ্যাত। সেদেশের শিশুরা তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মাতৃভাষায় শুরু করে। সেদেশে বাসকারী সুইডিশ ভাষাভাষী শিক্ষার্থীরা সুইডিশ ভাষায় এবং ফিনল্যান্ডের শিক্ষার্থীরা ফিনিশ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে। আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব স্বীকার করে কানাডার আদিবাসী শিশুদের জন্য তাদের নিজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। এসব শিশুকে তাদের মাতৃভাষায় সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। এর সুবাদে তারা মূলধারার শিক্ষায় সফলতা অর্জনের প্রস্তুতি গ্রহণের পাশাপাশি নিজস্ব ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণ করতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেদেশে প্রচলিত 'মাতৃভাষা-ভিত্তিক দ্বিভাষিক শিক্ষা কর্মসূচি'-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে তদের সাক্ষরতা ও একাডেমিক সফলতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করা এবং সময়ের পরিক্রমায় অন্যান্য ভাষা শিক্ষায় উৎসাহিত করা। গবেষণায় দেখা গেছে, এর মাধ্যমে তাদের শিখন-ফলের উন্নতির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজ সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে ওঠে। নিউজিল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় আদিবাসী মাওরি ভাষার পুনরুজ্জীবন এবং দ্বিভাষিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'The Maori Language Immersion Program' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পুরাপুরি মাওরি ভাষায় শিক্ষাদান করা হচ্ছে। এই 'immersion' বা নিমগ্নকরণ কর্মসূচির সুবাদে মাওরি ভাষাকে যেমন বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে, তেমনি মাওরি জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের একাডেমিক সফলতা ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনও সম্ভব হচ্ছে। একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ভাষিক বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং শিক্ষায় উৎকর্ষ নিশ্চিতকরণের সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাঙালি, সেই অর্থে বাংলাদেশকে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বিচারে সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট (homogenous) জনগোষ্ঠীর দেশ বলা যায়। এদেশে চাকমা, গারো, ত্রিপুরা, মারমা ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন বটে, তবে তা মোট জনগণের এক শতাংশের বেশি নয়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর শিশুরা তাদের মাতৃভাষাতেই শিক্ষাগ্রহণ শুরু করতে পারলেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণে বেশ কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে। আদিবাসী শিশুদের

মাতৃভাষায় শিক্ষার্জনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ২০১২ সালে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদরি ও গারো–এ পাঁচটি জনগোষ্ঠীর শিশুদের নিজ ভাষায় শিক্ষাদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে এটি বাস্তবায়িত হয় ২০১৭ সালে। পরে আরো বেশ কয়েকটি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও এ উদ্যোগ সেভাবে সফল হয়নি। এমনকি প্রথম যে পাঁচটি ভাষায় পাঠ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল সেটিও সংশ্লিষ্ট ভাষার প্রশিক্ষিত শিক্ষক না থাকায় পুরোদমে চালু করা সম্ভব হয়নি (খোকন, ২০১৯)। অন্যদিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করার কথা থাকলেও এ ব্যাপারে নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে প্রধান হলো ইংরেজি ভাষার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতা যা প্রকৃতপক্ষে 'ইংরেজির সাম্রাজ্যবাদিতারই ফল। বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রচলন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক ধরনের অলিখিত বাধ্যবাধকতা আছে, যা মাতৃভাষা বাংলার সর্বস্তরে প্রসারের ক্ষেত্রে বাধার দেয়াল তুলে দাঁড়াচ্ছে। অথচ ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট বাংলাদেশে শিক্ষার প্রধানতম মাধ্যম হিসেবে বাংলাই হবে প্রধান ভাষা, এটি নেহাতই যৌক্তিক চাওয়া। কিন্তু দেখা গেছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই বিশ্বায়নের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাংলাকে হেয় করে ইংরেজিকেই উচ্চে তুলে ধরার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে দীর্ঘদিন ধরেই বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশভাগের পূর্ব থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিক ও বি. এ. পাস কোর্সের পরীক্ষা বাংলা মাধ্যমে গ্রহণের নিয়ম অনুমোদন করে। দেশভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পেলে মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম ও পরীক্ষা গ্রহণ বহাল থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বাংলা মাধ্যমে পঠন-পাঠন অব্যাহত থাকে। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট অনুযায়ী যে একাডেমিক অধাদেশ প্রণীত হয় সেখানেও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা মাধ্যমকে স্বীকার করে নেওয়া হয় (রবিউল, ২০১৯)। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষাবিদ ও নেতৃস্থানীয় চিন্তকেরাও শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে বিষময় ফল সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ও বোস-আইনস্টাইন তত্ত্বের সহ-প্রণেতা সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বাস করতেন, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্বস্তরেই শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহার সম্ভব। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মাতৃভাষার বাইরে কোনো বিদেশি ভাষা এসে দাঁড়ালে এ থেকে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন। এ কারণে বিজ্ঞানসহ সমস্ত বিষয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'বিচ্ছিন্ন মনোভাবকে দূর করে সংহতি সৃষ্টির কাজ মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজেই হতে পারে। কেবল রাজকীয় মঞ্চ থেকে একতার কথা বললে চলবে না। আমাদের বলতে হবে প্রত্যেক ঘরের কোণ থেকে এই একতার বাণী। কেবল বললে চলবে না যে, আমরা শিক্ষার বিধান করেছি। সত্যি করে সকলকে

মনে করতে হবে যে এটা আমাদের সকলের দায়িত্ব। এই জন্যই মাতৃভাষার দরকার, সাধনার দরকার এবং মনকে শুদ্ধ করার দরকার (বসু, ১৩৮৭: ১১১)। চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক আবদুল হক মনে করেন 'মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে অন্য ভাষাকে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাধান্য দেওয়া অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক (হক, ২০১৪)। বহুভাষাবিদ ও পণ্ডিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মাতৃভাষা ব্যতিরেকে অন্য ভাষায় শিক্ষাদানকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতিবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন (ইসলাম, ২০১৯)।

এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রচুর অবহেলা লক্ষ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দেখা যায়, বাংলা ও ইংরেজি যেকোনো মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা মুখে বলা হলেও বাস্তবে ইংরেজিকেই একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে। ফলস্বরূপ, শিক্ষার্থীরা শিক্ষা কার্যক্রম এবং পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হয়। অভিভাবকদের মধ্যেও বাংলা ভাষা নিয়ে রয়েছে হীনম্মন্যতার বোধ। এ কারণেই সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ বাংলা ভাষা যেন ক্রমেই নিজভূমে পরবাসী হয়ে উঠেছে।

ভাষা, ভূখণ্ড এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। ১৯৭২ সালের সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। সেই সঙ্গে '১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করে, 'বাংলাই শিক্ষার মাধ্যম'। এই উদ্দেশ্যে আইন-আদালত, প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বস্তরে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সরকারি নির্দেশ জারি করা সত্ত্বেও সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না (আহমেদ, ২০২০: ৫৫)। ১৯৮৭ সালে বাংলা ভাষা সর্বস্তরে প্রচলনের জন্য আইন প্রণীত হলো। এ আইনের ৩(১) ধারায় বলা হয়েছে, 'এ আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস-আদালত, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকর্তৃক বিদেশিদের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন আদালতের সওয়াল-জওয়াব এবং অন্যান্য আইনানুগত কার্যাবলি অবশ্যই বাংলায় লিখিতে হবে।' ৩(২) ধারায় আরও বলা হয়েছে, উল্লিখিত কোনো কর্মস্থলে যদি কোনো ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় আবেদন বা আপিল করেন, তাহলে তা বেআইনি ও অকার্যকর বলে গণ্য হবে।' ধারা (৩) বলছে, 'যদি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন অমান্য করেন তাহলে উক্ত কার্যের জন্য তিনি সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধির অধীনে অসদাচরণ করেছেন বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' আদালত ও অন্যত্র সরকারি কাজে বাংলা ভাষায় নথি উপস্থাপনের কথা আইনে স্পষ্ট বলা আছে। অথচ এ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বাংলা ভাষাকে ক্রমাগত অবজ্ঞা করে চলেছি আমরা।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি অবশ্যই শিখতে হবে, তবে তা নিজের ভাষা, সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে, নিজের সমস্ত আত্মসম্মানকে বিকিয়ে দিয়ে নয়। বিদেশি ভাষায় নিজেকে গড়ে তোলার প্রয়াস কখনও সাধুবাদ পেতে পারে না। ইংরেজির প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহের অনেকগুলো কারণ রয়েছে যেমন, চাকরির বাজারে প্রাধান্য, সরকারি বেসরকারি, অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা সকল স্থানে চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়া কিংবা ইংরেজি দক্ষতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে মানুষ ইংরেজি ভাষার প্রতি অতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিশ্বায়নের প্রভাব এবং উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার তাড়নাও এক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সময়ে তরুণ সমাজের মধ্যে দেশত্যাগের প্রবণতা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে। জীবনমান উন্নত করার তাগিদে বৈধ-অবৈধ পথে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি বহির্বিশ্বে গমন করছে। এক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে নিজ দক্ষতা উন্নত করার একটি তাড়না তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধের অভাব রয়েছে আমাদের মধ্যে। দেশ ও ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকলে মাতৃভাষাকে এতোটা অবহেলা সম্ভব হতো না। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বাসগৃহ, টিভি চ্যানেল, দোকানের নামফলক, সড়কের নাম, পরিবহনের নাম, খাবার হোটেল, এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামেও ইংরেজিয়ানার ছড়াছড়ি। এই প্রবণতা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অসচেতনতা ও মানসিক দৈন্যেরই পরিচায়ক। অথচ পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা মাতৃভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। সৃজন ও মননশীলতা, গবেষণা, বাণিজ্য, শিল্প, ব্যবস্থাপনা, মানবীয় উদ্যোগের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মাতৃভাষার প্রচলন সম্ভব, যেটি বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য, ‘বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে চীনা ভাষায়। দ্বিতীয় হচ্ছে স্প্যানিশ, তৃতীয় ইংরেজি এবং চতুর্থ বাংলা। কাজেই বাংলার মর্যাদা কিন্তু কম নয়। বাংলার আসন অনেক ঊর্ধ্বে। বিশ্বের প্রায় ২৮ কোটি লোক বাংলায় কথা বলে। অনেক দেশে কেউ মাতৃভাষা ছাড়া কথা বলতে চায় না। একজন ফরাসিকে, কিংবা একজন জার্মানকে যত চেষ্টা করেন না কেন, সহসা কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলবে না। ওদের নিজের ভাষায় কথা বলবে। ... কিন্তু আমাদের হচ্ছে হীনম্মন্যতা, তাই এতো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। আমরা আমাদের গন্তব্য কী জানি না। আমরা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছি (আসাদুজ্জামান, ২০২০: ৫২)।’

বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকসহ নানাবিধ গবেষণা পুস্তকের সংখ্যাল্পতা রয়েছে। বিশেষত উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে বাংলায় লেখা গবেষণাগ্রন্থ খুবই অপ্রতুল। বাংলা পরিভাষা নিয়েও বিদ্যুৎসমাজে এক ধরনের বিভ্রান্তি রয়েছে। একটু চেষ্টা করলেই যেখানে উপযুক্ত বাংলা পরিশব্দ ব্যবহার সম্ভব সেখানেও অপ্রয়োজনে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে ভাষার সৌন্দর্য ও সুষমাকে বিঘ্নিত করা হয়। বাংলা ভাষার ব্যাপক ও কার্যকর ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে একই শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ। ১৯৯৭ সালের শিক্ষা কমিশন সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার প্রচলনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছিল, ‘শিক্ষার

সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রচলনের কোনো বিকল্প নেই এবং সেই কারণেই ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় রচিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা বাংলা ভাষায় ভাষান্তর হওয়া প্রয়োজন। এই কাজকে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।' পরিতাপের বিষয়, 'উপযুক্ত পরিভাষা নেই'– এই অজুহাতে ইংরেজি ব্যবহারের পথ প্রশস্ত হয়। অথচ বাংলা একটি শক্তিশালী ভাষা। জ্ঞানের নানা শাখায় অধিকাংশ বিদেশি শব্দেরই পরিশব্দ রয়েছে বাংলায়। কাজেই বাংলার মধ্যে যথেচ্ছ ইংরেজি বা অন্য ভাষার শব্দ অন্তর্ভুক্তির কোনো যৌক্তিকতা নেই। বস্তুত বাংলা ব্যবহারে অবহেলা ও অবজ্ঞাই এই যথেচ্ছাচারের কারণ। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা করা অবশ্যই সম্ভব। এ বিষয়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ সত্যেন বসুর উক্তি স্মর্তব্য, 'যারা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়, তারা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান জানেন না' (হাসান, ২০২৪)।

মাতৃভাষায় তথ্য প্রযুক্তি চর্চাও কোনো বাধা হতে পারে না। বরং যন্ত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের একটি গৌরবময় ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে। ১৭৭৮ সালে পঞ্চানন কর্মকার সীসার টাইপ তৈরি করেন। ১৯৬৫ সালে পূর্ব জার্মানির রেমিংটন টাইপ রাইটারের সহযোগিতায় বাংলা টাইপ রাইটারের কিবোর্ডের পুনঃনকশা প্রণয়ন করেন মুনীর চৌধুরী। ১৯৬৯ সালে তিনি তৈরি করেন মুনীর কিবোর্ড। ১৯৮৬ সালে সাইফুদ্দাহার শহীদ শহীদলিপি নামে সফটওয়্যার তৈরি করেন। এরই ধারাবাহিকতায় কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রয়োগের জন্য টাইপোগ্রাফি, কিবোর্ড, সফটওয়্যার, ডাটাবেস তৈরি হয়েছে। বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটে বাংলা ভাষার ব্যবহার আরো বেগবান করার জন্য প্রযুক্তি ও বাংলা ভাষা উভয়েই দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই।

শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের সুপারিশমালা

সার্বিক বিশ্লেষণে এবং গবেষকদের আলোচনায় শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে নানা পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশ ও জাতির টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নতি নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের বিকাশ এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক আলোচনা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য-উৎস পর্যালোচনার আলোকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রদান করা যেতে পারে:

ক. শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার ব্যবহারকে বাধাহীন করার জন্য সরকারি উদ্যোগই সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, পরীক্ষা গ্রহণ, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্যরা যাতে তাদের মাতৃ ভাষায় নির্দিষ্ট একটি পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষালাভ করতে পারে সে ব্যবস্থাও নিতে হবে।

খ. উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের ওপর যে অলিখিত বিধিনিষেধ আছে সেটি তুলে নিতে হবে। শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দেখিয়ে জনমনে এই ধারণার প্রসার ঘটাতে হবে যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনে কোনো গ্লানি নেই, বরং এটিই গৌরবের। দেশসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এই কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিতে হবে। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সবাই তখন শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা চর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠবেন।

গ. শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করতে হবে এবং সেই নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। নীতিমালা প্রণয়নে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সিভিল সোসাইটিসহ সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. শিক্ষাসহ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নানা উদ্যোগ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আলোচনা সভা, কর্মশালা, দিবস উদযাপন, বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন ইত্যাদি করা যেতে পারে। সচেতনতার প্রসারে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, সরকারি নীতিনির্ধারকসহ সকল অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ. জ্ঞানের নানা শাখায় বাংলা পরিভাষা কোষের অভাব রয়েছে। ফলে একেক শব্দের একেক পরিশব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাংলা পরিভাষার মান-সমতায়নের জন্য বাংলা একাডেমির মাধ্যমে বা সরকারি উদ্যোগে পৃথক কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এই কমিশন বানান ও পরিভাষা সমতায়নের জন্য কাজ করবে।

চ. শিক্ষা কার্যক্রমে সঠিক ও নির্ভুলভাবে মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্য শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষার্থী যাতে নির্ভুলভাবে মাতৃভাষার প্রয়োগ ঘটাতে পারে সেজন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসহ নানা উদ্যোগ হাতে নিতে হবে।

ছ. শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারের নানা দিক নিয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের সংকট ও সম্ভাবনাগুলো বেরিয়ে আসবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে যাতে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করা হয় সেজন্য গবেষক ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উদ্যোগ নিতে হবে।

জ. ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করেছি। আমরা ভাষার জন্য লড়াই করেছি এবং সেই ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। এটি ধরে রাখতে চাইলে মাতৃভাষাকে কোনো ক্ষেত্র থেকেই বাদ দেওয়া যাবে না। মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা বিদেশি ভাষা–কোনো শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ হয় না।

ঝ. উচ্চশিক্ষার প্রতিটি বিষয়ে– বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কলা, মানবিক ও অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে গবেষণাধর্মী পাঠ্যপুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করা উচিত।

ঞ. জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, দক্ষিণ কোরিয়া, চীনসহ উন্নত দেশগুলোতে মাতৃভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে সেদেশের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও তথ্যানুসন্ধানী মানুষের জন্য সহজলভ্য করে তোলা হয়। বাংলা একাডেমি ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহেরও উচিত তাদের অনুবাদ কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করা এবং বিদেশি ভাষায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বই ও তথ্যসামগ্রী বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ নেওয়া। এজন্য উপযুক্ত সম্মানির বিনিময়ে কেবল যোগ্য ব্যক্তিদেরই এ কাজে নিয়োজিত করা উচিত।

ট. চাকরির বাজারে মাতৃভাষার গুরুত্ব বাড়াতে হবে। আগে মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের পর ইংরেজি বা বিদেশি ভাষায় গুরুত্ব দিতে হবে।

ঠ. সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, এফএমরেডিওসহ সকল গণমাধ্যমে যারা কাজ করেন, তাদের ভাষা ব্যবহারে পারদর্শী হতে হবে। প্রয়োজনে বাংলা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোক নিযুক্ত করতে হবে।

ড. সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে অফিস আদালতে মাতৃভাষার ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতে হবে। দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। ভাষাকে ভালো না বাসলে প্রকৃত অর্থে দেশকে ভালোবাসা যায় না। সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে প্রশাসনের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ ও দৃঢ় অঙ্গীকার থাকা জরুরি।

ঢ. জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রয়োগ, সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রয়োগ, সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে এর প্রসার ঘটাতে হবে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বে এমন দেশ বা জাতি নেই যারা মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বিশ্বসভায় উচ্চ আসন গ্রহণ। 'মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা বা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করা গ্রহণ সম্ভব নয়'– অজ্ঞতাপ্রসূত এই ধারণাকে ভাঙতে হলে সংশ্লিষ্ট সব মহলকে উদ্যোগী হতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের সমস্যা, সম্ভাবনাসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গবেষণারও অভাব রয়েছে আমাদের দেশে। গবেষণার অভাবে মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অবস্থা জানা এবং সমস্যার সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভব হচ্ছে না। নিয়মিত গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের সংকট-সম্ভাবনা নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি সমন্বিত পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বাঙালিসহ এদেশে বসবাসকারী সব জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে শিক্ষাসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

তথ্য-নির্দেশ

আসাদুজ্জামান, এম.। (২০২০)। অতিথির বক্তৃতা। *মাতৃভাষা* (সম্পা. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও সেলু বাসিত)। বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতিঃ ঢাকা।

আহমেদ, সুফিয়া। (২০২০)। সভাপতির ভাষণ। *মাতৃভাষা* (সম্পা. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও সেলু বাসিত)। বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতিঃ ঢাকা।

ইসলাম, মোঃ রবিউল। (২০১৯)। আবদুল হকের প্রবন্ধে প্রতিফলিত ভাষা পরিকল্পনা। *বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ৬৩ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০), ৬৯-৮১*

ইসলাম, রফিকুল। (২০২০)। প্রবন্ধ। *মাতৃভাষা* (সম্পা. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও সেলু বাসিত)। বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতিঃ ঢাকা।

খোকন, সালেক। (ফেব্রুয়ারি, ২০১৯)। মাতৃভাষায় শিক্ষা ও আদিবাসী ভাষার সুরক্ষা। দৈনিক আজকের পত্রিকা, Retrieved on 15 April 2025 from https://www.deshrupantor.com/122611/

তপন, এম. শাহজাহান। (২০২০)। প্রবন্ধ। *মাতৃভাষা* (সম্পা. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও সেলু বাসিত)। প্রাগুক্ত।

বসু, সত্যেন্দ্রনাথ। (১৩৮৭ বঙ্গাব্দ)। মাতৃভাষা। *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন*। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদঃ কলিকাতা।

রফিক, আহমদ। (২০২০)। অতিথির বক্তৃতা। *মাতৃভাষা* (সম্পা. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও সেলু বাসিত)। প্রাগুক্ত।

হক, আবদুল। (২০১৪)। আরবি হরফে বাংলা। *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব*। মুক্তধারাঃ ঢাকা।

হাসান, আবীর। (২০২৪)। *মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা: অন্যরা পারলে আমরা পারি না কেন*। প্রথম আলো, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

Ahmad, S. (2020). The significance of mother tongue in the national education policy (NEP) 2020. *International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM),* Vo. 12 Issue 3

Ball, J. (2010). Educational equity for children from diverse language backgrounds: Mother tongue-based bilingual or multilingual education in the early years. Retrieved from https://ecdip.org/wp-content/uploads/2021/12/UNESCO-Summary-2010.pdf on 15 April 2025.

Barbaran, M. D. A., Huamán-Romaní , Y., Lipa, R. C., Mamani, J. C. M. and Vásquez-Alburqueque, I. (2024). The effect of mother tongue education on social performance and happiness of bilingual students in Peru. *International Journal of Society, Culture & Language*. Retrieved on 5 May 2025 from https://www.ijscl. com/article_717969.html

Bialystok, E. (2016). Bilingual education for young children: Review of the effects and consequences. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 21(6), 666–679. https://doi.org/10.1080/13670050.2016.1203859

Bloch, C. (n.d.). Implementation of mother tongue learner-centred early literacy education in Namibia. Retreived on 16 April 2025 from https://www.praesa.org.za/wp-content/uploads/2016/09/Learner-1.pdf

Cummins, J. (2007). Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual classrooms. *Canadian Journal of Applied Linguistics*, Vol. 10 Issue 2, 221-240.

Dumatog, R. C., & Dekker, D. E. (2003). First language education in Lubuagan, Northern Philippines. Retrieved on 21 April 2025 from https://www.sil.org/system/files/reapdata/10/29/31/ 102931233756000318253878776625862429291/dumatog_and_dekker_48907.pdf

Finegan, E. (2011). *Language and its structure and use.*. Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning.

Khan, M. T.. (2014). Education in mother tongue-a children's right. *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS),* Volume 2, Issue 4 (online).

Koyash, M. (2021). Mother Tongue-Based Education. Retreived on 16 April 2025 from https://www.globalbookalliance.org/news-views/mother-tongue-based-education

Mehar, S. (2020). Challenges and Outcomes of Implementing Mother Tongue as a Medium of Instruction in India's National Education Policy 2020. *International Journal of Arts & Education Research*, Vol. 12, Issue 6

Nishanthi, R. (2020). Understanding of the Importance of Mother Tongue Learning. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), Volume 5 Issue 1, November-December. p. 77

Noormohamadi, R. (2008). Mother tongue, a necessary step to intellectual development. *Journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics*, Vol. 12 Issue 2, p. 25-36.

Ross, S. (2004). The Mother Tongue in Morocco: The politics of an indigenous education (an unpublished M.A. dissertation). University of East Anglia, United Kingdom.

UNESCO. (2025). Why mother language-based education is essential. Retreieved on 15 April 2025 from https://www.unesco.org/en/articles/why-mother-language-based-education-essential

Wahhabi, N. (2016). The low level of the Arabic language among the university student: causes and solutions. *Geel Al-Oloom Journal for Literary and Intellectual Studies*, Vol. 17 Issue 18, pp. 171-183

হিজড়াদের লোকভাষা: গোষ্ঠীগত সংযোগমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের স্বরূপ

প্রদিতি রাউত প্রমা*

Abstract: The indigenous dialect used by the Hijra community is known as Ulti. Local dialects serve as carriers of social identity, group solidarity, and cultural diversity. Among the Hijra community in Bangladesh, Ulti functions as a distinctive coded language. It is composed of altered, distorted, and symbolic variations of mainstream Bengali, reflecting their strategies for social security and cultural resistance. Ulti evolved in South Asia as a secret language, developed as a survival mechanism by the Hijra community. In the face of societal dominance and marginalization, this language acts as a tool for fostering communal unity. Ulti is an innovative linguistic fusion of Bengali, Urdu, Hindi, and Persian. However, it lacks a fixed grammatical structure or standardized word formation rules. Each regional Hijra community modifies the vocabulary according to their specific needs. This paper seeks to examine how Ulti functions as a medium of internal communication and a strategy of cultural resistance among socially excluded Hijras. Drawing upon Stuart Hall's theory of representation, the study explores how meaning is produced and exchanged through this language within the community. This is a qualitative research project that applies a conceptual framework.

মূলশব্দ (Keyword): হিজড়া (Hijra), লোকভাষা (Folk Dialect), উল্টি (Ulti), সংকেত (Code), প্রতিরোধ (Resistance), রিপ্রেজেন্টেশন (Representation)

ভূমিকা

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার হিজড়া সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতার শিকার। রাষ্ট্রীয় এবং মূলধারার সাংস্কৃতিক ভাষাব্যবস্থায়

* Praditi Raut Prama, Lecturer, Department of Folklore, National Poet Kazi Nazrul Islam University, email: proditiproma255@gmail.com

তাঁদের নিজস্ব ভাষা প্রায় অদৃশ্য, অজ্ঞাত এবং উপেক্ষিত। হিজড়াদের এই ভাষা গোপনীয় কোড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হিজড়াদের নিজেদের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ লোকভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং তা একপ্রকার সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের হাতিয়ার, যা তাদের গোষ্ঠীগত পরিচয় সংরক্ষণ এবং সমাজের বৈষম্যমূলক কাঠামোর বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ হিসেবে কাজ করে। এই ভাষা একদিকে অন্তঃস্থিত গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে নিরাপত্তা দেয়, অন্যদিকে বহির্বিশ্বের প্রতি এক প্রকারের সংকেতনির্ভর প্রতিরোধী ভঙ্গি তৈরি করে। তথাপি, মূলধারার ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃতিচর্চায় এই লোকভাষার বিশ্লেষণ অনুপস্থিত অথবা ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবসিত হয়েছে। এই গবেষণা হিজড়াদের লোকভাষাকে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের স্বরূপ হিসেবে পাঠ করার মাধ্যমে; বিদ্যমান ক্ষমতা-সম্পর্ক, ভাষাগত হেয়তা এবং প্রতিরোধী সংস্কৃতির জটিলতা বিশ্লেষণ করবে।

প্রত্যয় বিশ্লেষণ

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে 'হিজড়া' শব্দটি ব্যবহারের কারণ, হিজড়াকে 'তৃতীয় লিঙ্গ' বললে পুরুষকে প্রথম ও নারীকে দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় যা সচেতনভাবে করা হয়নি। তাছাড়া পাশ্চাত্যে যাকে তৃতীয় লিঙ্গ বলা হয়, আর এদেশে যাকে হিজড়া বলা হয় তা সবসময় একই অর্থ বহন করে না। এছাড়াও হিজড়া গোষ্ঠীগুলো পরস্পরকে 'হিজড়া' বলেই সম্বোধন করে। যেহেতু লোকগোষ্ঠীর ভাষাকে 'লোকভাষা' বলা হয়; সেহেতু বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে 'হিজড়া' লোকগোষ্ঠীর ভাষাকে লোকভাষা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. হিজড়া সম্প্রদায়ের নিজস্ব লোকভাষার গঠন, ব্যবহার এবং কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা;

২. লোকভাষার মাধ্যমে কীভাবে হিজড়ারা সামাজিক বঞ্চনা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে, তা অন্বেষণ করা;

৩. হিজড়া জনগোষ্ঠীর 'উল্টি ভাষা' তার গোষ্ঠীগত সংযোগে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে এই প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করা;

৪. হিজড়াদের ভাষা কীভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের কৌশল হয়ে উঠেছে তা অন্বেষণ করা।

গবেষণা প্রশ্ন

১. হিজড়াদের ভাষা কি লোকভাষা?

২. হিজড়া সম্প্রদায়ের নিজস্ব লোকভাষার বৈশিষ্ট্য, কাঠামো এবং ব্যবহারিক রূপ কেমন?

৩. মূলধারার ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে হিজড়াদের ভাষাকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়?

৪. এই ভাষা কীভাবে সামাজিক প্রান্তিকতার বাস্তবতায় প্রতিরোধের ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে?

৫. হিজড়াদের ভাষিক চর্চা কি শুধু গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনে, নাকি তা বৃহত্তর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের অংশ?

৬. হিজড়াদের লোকভাষাকে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চেতনা হিসেবে কীভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে?

সাহিত্য পর্যালোচনা

হিজড়া সম্প্রদায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন ও সাংস্কৃতিকভাবে স্বতন্ত্র একটি গোষ্ঠী। তারা মূলধারার সমাজে অস্তিত্ব সংকটে ভুগলেও, নিজেদের অভ্যন্তরীণ চর্চায় একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে তুলেছে। এই সাংস্কৃতিক বলয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো তাদের নিজস্ব লোকভাষা। যদিও হিজড়াদের জীবনধারা, যৌনতা, এবং সামাজিক বঞ্চনা নিয়ে সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও লিঙ্গতত্ত্বের বিভিন্ন গবেষণা রয়েছে (Nanda, 1990; Reddy, 2005), তাঁদের ভাষিক চর্চাকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস এখনও বিরল।

জুলফিয়া ইসলামের *তৃতীয় লিঙ্গের অবস্থান* (২০১৫) বইটিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হিজড়াদের জীবনাচার, এমনকি রূপান্তরকামীদের অবস্থান নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। জোবাইদা নাসরিনের *লিঙ্গ বৈচিত্র্যের বয়ান* (২০১৯) বইটিতে নারী-পুরুষ এই দ্বি-বিভাজিত লিঙ্গীয় পরিচয়ের বাইরে অন্যান্য লিঙ্গীয় সত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটিতে কেস স্টাডি (Case Study) আকারে ১১ জন ভিন্ন লিঙ্গীয় সত্তার মানুষের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁরা সামনে এনেছেন লৈঙ্গিক পরিচয়ের বহুমাত্রিকতাকে। বইটিতে নিরাপত্তাজনিত কারণে কেউ কেউ নিজের আসল নাম আড়াল করেছেন। নাসিম আনোয়ারের *জেন্ডার ও সামাজিক বৈষম্য* (২০১৯) বইটিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো প্রতিপদে নারীকে কীভাবে বৈষম্যের শিকার করছে তা নিয়ে আলোচনা করেছে অথচ একই কাঠামো যে হিজড়াদের মূল সমাজের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। বেশিরভাগ জেন্ডার স্টাডিজের বই নারীর ক্ষমতায়ন এবং বৈষম্য নিয়ে কথা বলেছে। জেন্ডার পরিসীমায় যে হিজড়া জনগোষ্ঠীও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার আলোচনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেই। রোবায়েত ফেরদৌসের *বাংলাদেশের হিজড়া সমাজ: অনুধ্যান ও করণীয়* (২০১৫) গবেষণাকর্মটিতে সরকারের হিজড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থে করণীয় বিষয়ে একটি সার্বিক বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই কাজটিতেও এই জনগোষ্ঠীকে মূলধারার বাইরে রাখার প্রবণতাই লক্ষ করা গেছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সমস্যা, নির্যাতন, প্রতিকার নিয়ে যতগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে তার বেশিরভাগগুলোতেই 'যৌন সংখ্যালঘু' সম্প্রদায় অর্থাৎ হিজড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা নিয়ে তেমন কোন আলোকপাত করা হয়নি। যেমন: সালাম আজাদের *বাংলাদেশের বিপন্ন সংখ্যালঘু* (২০১৪) বা পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও তপন কুমার দে-এর *বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সংকট* (২০২০) ইত্যাদি। লৈঙ্গিক সংখ্যালঘু হিজড়াদের ভাষা দূরের কথা, জীবন ব্যবস্থাও সেখানে প্রাধান্য পায়নি।

সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের *Social life in Ancient India: in the Background of the Yajñavalkya-smriti* (1965) এবং মনোজ রাঘোবানিসর *The Third Sex* (1927) বইটিতে ভারতীয় উপমহাদেশের অতীত ইতিহাসে মূলধারার সমাজে হিজড়া জনগোষ্ঠীর যে সম্মানের জীবন ছিল, তাই বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ফজল মাহমুদের *Not born to the different* (2009) বইটিতে হিজড়া জন্মকে 'অদ্ভুত', 'অস্বাভাবিক' ভাবায় প্রতিবাদ করা হয়েছে। Amara Das Wilhem-এর *Tritiya-Prakriti: People of the Third Sex: Understanding Homosexuality, Transgender Identity and Intersex Conditions Through Hinduism* (2008) বইটিতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জৈবিক, মানসিক, সামাজিক অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সানজিদা ইসলামের *A Theoretical Analysis of the Legal Status of Transgender: Bangladesh perspective* (2019) ও লুবনা জেবিনের *Status of Transgender People in Bangladesh: a socio-economic analysis* (2019) এই দু'টি প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রতিবেশে হিজড়াদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হিজড়াগোষ্ঠী একটি লোকগোষ্ঠী এবং তার সংস্কৃতি লোকসাংস্কৃতিক প্রভাবজাত। অথচ এই গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে ফোকলোরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে এমন গবেষণা খুব বেশি চোখে পড়ে না। ফলে হিজড়াদের উল্টিভাষা কীভাবে তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ অপ্রাতিষ্ঠানিক জীবনব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে তা প্রাধান্য পায়নি। সুস্মিতা চক্রবর্তীর *ফোকলোর ও জেন্ডার: লোক-ঐতিহ্যে পিতৃতন্ত্র ও নারীর স্বতন্ত্র স্বর* (২০১৪) বইটিতেও জেন্ডারের আওতায় 'হিজড়া'-কে আনা হয়নি। ফোকলোরে নারীর স্বর খোঁজা হয়েছে। বিদ্যমান গবেষণায় দেখা যায়, হিজড়াদের ভাষা মূলত গোপনীয়তা রক্ষার কৌশল হিসেবে দেখা হয়েছে। এই ভাষা আঞ্চলিক ভাষার বিকৃত রূপ, সাংকেতিক শব্দ এবং কোড-সুইচিংয়ের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। হিজড়া ভাষা খুব বিচ্ছিন্নভাবে যে কয়েকটি গবেষণায় উঠে এসেছে অধিকাংশ বিশ্লেষণেই ভাষার এ দিকটিকে 'উপসংস্কৃতি' (Sub-Culture) বা বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের একটি সক্রিয় মাধ্যম হিসেবে নয়। কাঞ্জিরামানি (২০১৫) রচনার মাধ্যমে শব্দভান্ডার নথিবদ্ধ করলেও, সেখানে ভাষার সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুপস্থিত থেকে গেছে। একইভাবে, দেবদত্তা (২০১৭) দেখান যে, এই ভাষা বহির্বিশ্ব থেকে নিজেদের আলাদা করার কৌশল, তবে এর প্রতিরোধী

মাত্রা বিশ্লেষণে তিনি গভীরে যাননি এবং যেহেতু ভাষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই ভাষা গড়ে উঠার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট। ফলে এই কাজগুলোতে বাংলাদেশের 'উল্টিভাষার' স্বাতন্ত্র্য একেবারেই প্রকাশ পায়নি। সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের তাত্ত্বিক প্রসঙ্গে অ্যান্তোনিও গ্রামসি (১৯৭১) 'হেজেমনি' ও 'কাউন্টার-হেজেমনি'র ধারণা দিয়েছেন, যেখানে প্রান্তিক গোষ্ঠী নিজেদের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার দিয়ে আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। স্টুয়ার্ট হল (১৯৯৭) প্রতিনিধিত্ব ও পরিচয় নির্মাণের ধারণায় দেখিয়েছেন, সাংস্কৃতিক চর্চা রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হিজড়াদের ভাষাকে কেবল বিচ্ছিন্ন যোগাযোগের কৌশল হিসেবে না দেখে, একটি সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের রূপ হিসেবে দেখা জরুরি। তাঁদের ভাষা প্রতিদিনের বেঁচে থাকার, পরিচিতি সংরক্ষণের এবং বাহ্যিক দমননীতির বিরুদ্ধে সাংকেতিকভাবে লড়াই করার একটি পদ্ধতি। হিজড়া জনগোষ্ঠী যেখানে নিজেই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের শিকার সেখানে বলাই বাহুল্য যে হিজড়া ভাষাও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের শিকার। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হিজড়াদের ভাষিক চর্চা নিয়ে গবেষণা প্রায় অনুপস্থিত। হিজড়াদের ভাষা যে শুধুমাত্র এক ধরনের আত্মরক্ষার পদ্ধতি নয়, বরং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক প্রকার সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যম, এ বিষয়টি এখনো বিস্তারিত আলোচিত হয়নি। অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাঁদের ভাষাকে বাহ্যিক বৈচিত্র্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, ফলে ভাষার ভেতরকার রাজনৈতিক শক্তি অনুধাবন করা হয়নি।

উল্লিখিত সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট যে, হিজড়াদের ভাষাকে যদি শুধু 'আলাদা' বা 'বিচ্ছিন্ন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তবে তাঁদের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রকৃত রূপ আড়াল হয়। এই গবেষণায় হিজড়াদের লোকভাষাকে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে; যেখানে ভাষা শুধুই যোগাযোগের উপায় নয়, বরং বেঁচে থাকার, লড়াই করার এবং স্ব-পরিচিতি নির্মাণের একটি রাজনৈতিক কৌশল।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

গবেষণার ধরন

এই গবেষণা গুণগত (qualitative) প্রকৃতির এবং কনসেপ্টচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক বা ধারণাগত কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসাবে ক্ষেত্রসমীক্ষা ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও দলভিত্তিক ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলায়। হিজড়া সম্প্রদায়ের নিজস্ব লোকভাষার সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ভূমিকা অনুধাবনের জন্য একটি গভীর পর্যালোচনা (in-depth qualitative inquiry) করা হয়েছে। গবেষণাটি নৃতাত্ত্বিক (ethnographic) পদ্ধতির সমন্বয়ে পরিচালিত, যেখানে ভাষার ব্যবহার ও ভাষার সামাজিক অর্থ নির্মাণের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতির যুক্তি

হিজড়া সম্প্রদায়ের ভাষা একটি জীবন্ত, প্রাত্যহিক এবং সাংকেতিক চর্চা, যা পরিসংখ্যান বা সংখ্যানির্ভর পদ্ধতিতে ধারণ সম্ভব নয়। তাদের ভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ, ক্ষমতার সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের রূপ বিশ্লেষণের জন্য গুণগত পদ্ধতি সবচেয়ে উপযুক্ত। ভাষা ব্যবহারের প্রসঙ্গগত তাৎপর্য বোঝার জন্য অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (participant observation) ও গভীর সাক্ষাৎকার (in-depth interviews) ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ বা observation method ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের কৌশল

২০ জনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। আধা-গঠনমূলক (semi-structured) প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে, যাতে ভাষার গঠন, প্রয়োগ, তাৎপর্য ও প্রতিরোধমূলক বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা সম্ভব হয়। এছাড়া হিজড়ারা পরস্পরের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করে তা বোঝার জন্য ১৫ জনের একটি দল নিয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (Focus group discussion) করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Participant Observation) পদ্ধতিতে হিজড়াদের নিজস্ব মিলনস্থল, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান এবং দৈনন্দিন কথোপকথন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সেকেন্ডারি বা দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গবেষণাকর্ম, বইপত্র এবং ডকুমেন্টারির সাহায্য নেয়া হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণের কৌশল

থিমেটিক অ্যানালাইসিস (Thematic Analysis): সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নির্দিষ্ট থিম বা বিষয় অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে, যেমন ‘পরিচয়’, ‘প্রতিরোধ’, ‘গোপনীয়তা’, ‘ভাষার শক্তি’ ইত্যাদি। বিষয়ভিত্তিক সংযোগ (Contextual approach) ভাষার ব্যবহার ও সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে, যেমন হিজড়াদের ভাষার মাধ্যমে ক্ষমতাহীনতা এবং গোপনীয়তা মোকাবেলার কৌশল প্রকাশিত হয়। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য স্টুয়ার্ট হলের রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে।

লোকগোষ্ঠী ও লোকভাষা

সমাজ ভাষাতত্ত্ব (Sociolinguistics) ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে আগ্রহী। এটা দেখে ওঠার চেষ্টা করে কীভাবে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী, শ্রেণি, বয়স, লিঙ্গ, পেশা ইত্যাদির ভিত্তিতে ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্য ঘটে। যেমন: শহর ও গ্রামের মানুষের কথা বলার ধরন এবং প্রতিবেশ আলাদা।

একটি লোকগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, বিশ্বাস, সুখ-দুঃখ, আচার-ব্যবহার, পেশা, দৈনন্দিন জীবনধারণ পদ্ধতি সবই ফোকলোর বিদ্যাশাখার আলোচ্য। হিজড়াদের মূলস্রোত থেকে বিচ্যুত অবস্থায় অন্য একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে গিয়ে নিজের অবস্থান তৈরি করতে হয়। একটি হিজড়া গ্রুপের কেউ-ই জন্মগতভাবে একই গোষ্ঠীর সদস্য নয়। তারা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী থেকে এসে একই ধরনের ভাষা, ঐতিহ্য ধারণ করে একই লোকগোষ্ঠীর সদস্য হয়ে ওঠে। ফোকলোরের কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নরূপ

1. The term 'folk' can refer/ to any group of people what`s ever who shared at least one common factor. It does not matter what the linking factor is; it could be a common occupation, language or religion- but what is important is that a group formed for whatever reason will have some traditions which it calls its own (Dundes, 1980. P. 6-7).
2. In Anthropological usage, the term Folklore has come to mean variety forms of artistic expression whose medium is the spoken word (Leach, 1949, P. 13).
3. Folklore is artistic communication in small groups (Amos, 1995, P. 4).
4. The idea of "folk" beyond peasants or rural communities. For him, even a family, a university class, or people working in the same office can be a folk group (R. M, 1959, P. 1).

উল্লিখিত সংজ্ঞায়ন থেকে বোঝা যায়, কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গঠিত দলই লোকগোষ্ঠী। হিজড়া গোষ্ঠীভুক্ত একটি বিশেষ লিঙ্গ পরিচিতি, পেশাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে গঠিত গোষ্ঠী। তাদের নিজেদের বিশেষ ভাষা, পোশাক, আচার, সংগীত, নৃত্য সামাজিক নিয়মাবলি আছে- এগুলো তারা গুরুমা থেকে প্রাপ্ত হয়। Dan Ben-Amos-এর দৃষ্টিকোণ থেকে ফোকলোর হলো ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে শিল্পিত যোগাযোগ। হিজড়া সম্প্রদায়ের গুরুবাদী সম্পর্ক, গুরু-শিষ্য আচার এবং তাদের উৎসব-আচার (যেমনঃ নববর্ষে গান গাওয়া, আশীর্বাদ দেওয়া) এগুলো একান্তই তাদের মধ্যে মৌখিকভাবে বাহিত। হিজড়াদের মধ্যে সমষ্টিগত পরিচয়বোধ খুব শক্তিশালী। হিজড়াদের পেশাগত-ভাষিক-সাংস্কৃতিক সংহতি রয়েছে। তাই তারা আধুনিক সমাজের মধ্যেও একটি সক্রিয় লোকগোষ্ঠী।

হিজড়াদের পেশাগত-ভাষিক-সাংস্কৃতিক সংহতি রয়েছে। লোকগোষ্ঠীর ভাষাই লোকভাষা। লোকভাষা হলো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার ধরন, যা প্রধান বা মূলধারার ভাষা থেকে ভিন্ন হতে পারে। লোকভাষা সাধারণত কথ্য হয় এবং এতে স্থানীয় রীতি-নীতির ছাপ থাকে। যেমন বাংলাদেশের সিলেটি, চাটগাঁইয়া বা নোয়াখালীর ভাষা- এগুলো বাংলা ভাষারই ভিন্ন ভিন্ন লোকভাষা।

সমাজ ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক, লোকভাষা হলো কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিশেষ ভাষা বা কথ্য রূপ। সমাজভাষাতত্ত্ব হলো ভাষা ও সমাজের

সম্পর্কের অধ্যয়ন। এটি ভাষার ব্যবহার কীভাবে সামাজিক ভিন্নতা (যেমন: বয়স, লিঙ্গ, পেশা, জাতিগোষ্ঠী, সামাজিক শ্রেণি ইত্যাদি) অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, তা বিশ্লেষণ করে। অর্থাৎ, ভাষা কেবল ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি সামাজিক কাঠামো ও পরিচয়েরও অংশ। লোকভাষা সামাজিক পরিচয়, গোষ্ঠীগত সংহতি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বাহক। সমাজভাষাতত্ত্ব এই দৃষ্টিকোণ থেকে লোকভাষাকে বিশ্লেষণ করে দেখে ভাষা কীভাবে একটি সমাজের ইতিহাস, শ্রেণিবিন্যাস বা সামাজিক পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে।

হিজড়াদের একটি নিজস্ব ভাষা আছে এবং তাদের লোকভাষাও গোষ্ঠীগত সংযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে এই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু এই ভাষা কোনও পূর্ণাঙ্গ ভাষা নয়। এ হল সংকেত-ভাষা। বিশেষ কিছু কারণে সর্বসাধারণের সমক্ষে নিজেদের কথাবার্তাকে গোপন রাখার জন্যে তাঁরা এই ভাষা ব্যবহার করে। এই ভাষাকে 'উল্টি' ভাষা বলা হয়।

এই ভাষা শুধু হিজড়ারাই ব্যবহার করে না। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরনের সংকেত-ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত 'চর্যাপদ'-কে 'সান্ধ্য ভাষা' বলা হয়, যা সংকেত ভাষার নামান্তর। ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের শ্যেনদৃষ্টি থেকে ধর্মীয় আচার-আচরণকে রক্ষা করার জন্যে বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ হেঁয়ালি ভাষায় চর্যাগীতি রচনা করেন। কোনও সংকেত-ভাষাই চট করে অনুধাবন করা যায় না। এ-হল রহস্যাবৃত ভাষা। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন মন্তব্য করেন:

> গোপনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে দলের লোকের কাছে প্রকাশ্যে অন্যের অবোধ্য অথচ প্রয়োজনীয় সংলাপ স্বাভাবিকভাবে চালাইবার জন্য বিশেষ বিশেষ (এক বা একাধিক ভাষা হইতে গৃহীত) শব্দ বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। এরকম বাক্য ব্যবহারকে অপার্থ-ভাষা অথবা সংকেত ভাষা (Code language) বলা হয় (সেন, ১৯৯৫: ১১৮)।

হিজড়াদের লোকভাষার গঠন ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের হিজড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত লোকভাষা একটি বিশেষ সাংকেতিক ভাষা, যা মূলধারার বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপান্তর, বিকৃতি ও সাংকেতিক সংকেতের সমন্বয়ে গঠিত। ভাষার গঠন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অনেক শব্দের আভিধানিক অর্থ বদলে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে। নির্দিষ্ট শব্দ ও সংকেত, নির্দিষ্ট কাজ, অবস্থা বা মানসিকতা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভাষায় আঞ্চলিক উচ্চারণের ভিন্নতা থাকলেও এক ধরনের অভ্যন্তরীণ ঐক্য লক্ষ করা যায়, যা জাতীয় পরিচয়ের বাইরে নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তার ইঙ্গিত বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, মূল বাংলায় প্রচলিত কোনো শব্দকে বিকৃত করে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে বাইরের কেউ তা সহজে না বুঝতে পারে। এটি তার কৌশল। হিজড়াদের

ভাষা চর্চা মূলত একটি নিরাপত্তা কৌশল। সমাজ যখন তাদের প্রতি আধিপত্যশীল হয়, তখন নিজেদের ভাষার মাধ্যমে তারা নিরাপদ যোগাযোগ নিশ্চিত করে। ভাষায় সাংকেতিক সংকেত যেমন হাতের ইশারা, বিশেষ উচ্চারণ বা চোখের চাহনি যুক্ত হয়, যা কথার অর্থকে বহুমাত্রিক করে তোলে। এমনকি হিজড়াদের হাততালিও একটি অবাচনিক ভাষা। যা অন্যান্য গোষ্ঠীর হাততালি থেকে ব্যতিক্রম। কোনো অচেনা পরিবেশে নিজেদের সদস্য চেনার জন্যও বিশেষ শব্দ বা সংকেত ব্যবহৃত হয়। এভাবে ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং বেঁচে থাকার একটি রণকৌশলে পরিণত হয়।

তারা এই লোকভাষার মাধ্যমে আত্মপরিচয়ও নির্মাণ করে। এই ভাষা চর্চা কেবল লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়ের নয়, বরং সাংস্কৃতিক পরিচয়েরও প্রতিনিয়ত নির্মাণ। সমাজ যেখানে তাদের নারী বা পুরুষ কোনো পরিচয়ে স্বীকৃতি দেয় না, সেখানে নিজস্ব ভাষা তাদের ‘‘আমি কে’’ এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার শক্তি দেয়।

ভাষার মধ্যে থাকা চটুলতা, কৌতুক, বিদ্রূপ ইত্যাদির মাধ্যমে হিজড়ারা সামাজিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক যে স্টেরিওটাইপ তার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ গড়ে তোলে। তাদের প্রতিদিনের কথোপকথনই হয়ে ওঠে এক ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ– ক্ষমতাশীল ভাষাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

প্রতিরোধের বহুমাত্রিক রূপ

হিজড়াদের ভাষা চর্চার মধ্যে অন্তত তিনটি স্তরে প্রতিরোধের রূপ লক্ষ করা যায়:

ক) দৃশ্যমান প্রতিরোধ: ভাষার মাধ্যমে নিজেদের দৃশ্যমান করে তোলা, নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তার পরিচয় দেয় যেখানে ‘মূলধারার’ সমাজ তাদের সংস্কৃতিকে ‘অপর’ করে দেখে।

খ) সাংকেতিক প্রতিরোধ: এই ভাষা সামগ্রিক নয়, বরং শব্দনির্ভর– যার অর্থ কেবল হিজড়া লোকগোষ্ঠীই জানে। সমাজের চোখ ফাঁকি দিয়ে নিজেদের গোষ্ঠীগত সংহতি বজায় রাখা।

গ) সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ: মূলধারার সাংস্কৃতিক একরৈখিতার বিরুদ্ধে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখা। যেহেতু সমাজ মূলস্রোতে তাদের জায়গা দিচ্ছে না, তাই ভিন্ন ভাষিক বাস্তবতা স্থাপন করা।

এই প্রতিরোধ সরাসরি সংঘাতের নয়, বরং সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে টিকে থাকার এবং সমাজের কেন্দ্রে নিজেদের জায়গা দাবি করার এবং নিরাপত্তার এক শক্তিশালী কৌশল।

ভাষার অভিযোজন ও পরিবর্তন

বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে

হিজড়াদের ভাষায় পরিবর্তন আসছে। মোবাইল ফোনে কথোপকথনে সংকেতের পরিবর্তে কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ বাংলা ব্যবহৃত হলেও, নিজেদের মঞ্চ বা জমায়েতে ঐতিহ্যবাহী ভাষা এখনো টিকে আছে। এটি একটি সাংস্কৃতিক অভিযোজনের প্রক্রিয়া, যা ভাষার মাধ্যমে অস্তিত্ব রক্ষার নতুন কৌশল উদ্ভাবন করছে।

উল্টি ভাষা: হিজড়া সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক

বিশ্বজুড়ে বহু সংখ্যক লোকগোষ্ঠী নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য টিকিয়ে রাখতে বিশেষ ধরনের ভাষা বা উপভাষা গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশের হিজড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত উল্টি ভাষা তেমনই এক অনন্য ভাষিক নির্মাণ। এই ভাষা তাদের ইতিহাস, সংগ্রাম, বেঁচে থাকা ও সামাজিক সংহতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধটিতে উল্টি ভাষার উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারিক ক্ষেত্র, সামাজিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

উল্টি ভাষা মূলত দক্ষিণ এশিয়ায় বিকশিত একধরনের গোপন ভাষা, যা হিজড়া সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে গড়ে উঠেছে। গবেষকদের মতে, এই ভাষার প্রচলন ভারতের মুঘল আমলের সময়কাল থেকেই শুরু হয়েছে। তখন সম্রাটের দরবারে নৃত্যশিল্পী ও রক্ষী হিসেবে হিজড়াদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সময়ের পরিক্রমায়, বিশেষ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে হিজড়াদের সামাজিক মর্যাদা ক্রমাগত কমতে থাকে। সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলাদা ভাষা নির্মাণ করে নেয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল বাইরের জগৎ থেকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ গোপন রাখা এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখা। এছাড়াও সমকামী নারী-পুরুষ, মিডিয়া শিল্পী, যৌনকর্মীদের দ্বারাও এই ভাষা ব্যবহৃত হয়। ভাষাটিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গুপ্তি, দিল্লিতে ও পাকিস্তানে হিজড়া ফার্সি এবং নেপালে ইয়োব্বান বা যোব্বান বলা হয়ে থাকে।

যদিও ভাষাটি ফার্সি ভাষার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়নি, কিন্তু হিজড়া জনগোষ্ঠী দাবি করে যে ভাষাটি মূলত মুঘল সম্রাটদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আর যেহেতু মুঘল সম্রাটদের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল 'ফার্সি', অতএব এই ভাষার উপর ফার্সির প্রভাব ব্যাপক। ইংল্যান্ডেও দীর্ঘদিন 'পোলারি' নামক একটা গোপন ভাষার প্রচলন ছিল। অতএব, এই সকল গোপন ভাষার ব্যবহার কোন নতুন বিষয় নয়। নতুন বিষয় যেটি আমাদের সকলের অজানা, তা হলো কীভাবে এটির উৎপত্তি হলো সেটা। মুঘল আমলে হেরেমের নারীদের পাহারা দেওয়ার জন্য খোজা বা খাজা সেরা নামের কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হতো। এরা ছিল মূলত পাহারাদার। খোজাদের নিয়োগের পূর্বে অন্ডকোষ কেটে ফেলা হতো যেন তারা হেরেমের নারীদের সাথে যৌন সঙ্গম করতে না পারে। মুঘল আমলে এসব খোজা, নপুংসক এবং মেয়েলি ছেলেদের বেশ কদর ছিল রাজপ্রাসাদে। সে যুগে খোজা ও নপুংসকদের একটা বলয় তৈরি হয় এবং পরে এর সাথে যুক্ত হয় হিজড়া,

নর্তকী বা বাইজি, যাত্রাপালার সঙ্গে যুক্ত বারাঙ্গনা, ভাঁড়, যারা মুঘলদের রংমহলে মনোরঞ্জন করত। এদের এই বলয়ে স্থানীয় খারিবোলি হিন্দুস্তানি ভাষার সাথে ফার্সি ও অন্যান্য শব্দের সংমিশ্রণ করে একটা গোপন ভাষার উদ্ভব ঘটে যা পরবর্তীতে 'হিজড়া ফার্সি' নামে পরিচিতি পায়। মূলত এই কারণেই ভাষাটিকে কোড ল্যাঙ্গুয়েজ বা গোপন সাংকেতিক ভাষা বলা হয়। যেহেতু খোজা এবং প্রাসাদে বাসরত গুপ্তচর, হিজড়া, বারাঙ্গনা বা বাইজি, দেহোপজীবী নর-নারী, মনোরঞ্জনকারী ভাঁড়, সম্রাটের উপপত্নী ও দাসীসমূহ এবং প্রাসাদে কর্মরত সকল কর্মচারী যেন প্রাসাদের গোপন খবরাখবর বহিরাগত মানুষের কাছে প্রকাশ না করে ফেলে, তাই সাংকেতিক ভাষার প্রচলন করা হয় সম্রাটদের উদ্যোগেই (পথিক, ১৯৯৪: ৪৩)।

গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার স্বার্থে; অনেক হিজড়া উপরিউক্ত মতামতকে এই ভাষার উদ্ভবের কারণ হিসেবে সমর্থন করে। যদিও তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণসিদ্ধ নয়, তবে এই বিষয়ে তেমন একটা গবেষণা করা হয়নি, তাই পুরোপুরি অবহেলাও করা যায় না।

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সময়কালে এসব প্রাসাদের কর্মচারীদের হত্যা করা হয়; নতুবা বিতাড়িত করা হয়। এই সকল বিতাড়িত জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এরা অনেকে ভারতে মন্দিরভিত্তিক কমিউনিটি গড়ে তোলে। অনেকে আবার ভ্রাম্যমান হিসাবে নাচ-গানের সাথে জড়িয়ে পড়ে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। ভারতবর্ষের হিজড়ারা পেটের তাগিদে বাচ্চা নাচিয়ে, ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে ও যৌনকর্মের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ও জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশরা এই সকল হিজড়া ও প্রাসাদে বাসকারী লোকদেরকে তাদের নিরাপত্তার হুমকি হিসাবে মনে করত ও সন্দেহের চোখে দেখত। কেননা, এরা যেহেতু ছিল ভ্রাম্যমাণ, সেহেতু একস্থানের খবর অন্যস্থানে এদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারতো। ফলে তাদেরকে কোণঠাসা করার জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়:

> ১৮৬০ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক প্রণীত পেনাল কোড বা দন্ডবিধি। কিন্তু ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান সমাজে এই জনগোষ্ঠীর সমাদর সব সময় ছিল। বিশেষ করে হিন্দু সমাজে পূর্ব হতেই "বৃহন্নলা", "শিখণ্ডী", "অর্ধ-নারীশ্বর", "বহুচারা মাতা" ইত্যাদি বিষয়গুলি বহুল প্রচলিত ছিল। সেকারণে তারা বেছে নেয় ঘরে ঘরে গিয়ে নবজাতকদের ও নবদম্পতিদের আশীর্বাদ দেওয়ার বিনিময়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তির কাজ। এভাবে তারা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতো আর সংমিশ্রিত হতো তাদের কথ্য বুলি। এর সঙ্গে বৈষ্ণব ভাববাদ ও ভক্তিবাদ, সুফিবাদ ও বাউল সহজিয়া দর্শনের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় (পথিক, ১৯৯৪: ৮)।

আবার শাক্ত দেবীর অর্চনা ও আচার-প্রথা এবং তন্ত্রবাদের প্রভাবও লক্ষণীয়। যাহোক, এভাবে ধীরে ধীরে উল্টি ভাষা হয়ে ওঠে নিরাপদ যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই ভাষা পরবর্তীতে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ভারতবর্ষের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। যেমন: থাইল্যান্ডে 'কোতি' শব্দটিকে বলা হয় ক্যাথোইচ।

বাংলাদেশে উল্টি ভাষার ব্যবহার মূলত হিজড়া ডেরার (বসবাস কেন্দ্র) অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ। উল্টি ভাষা সাধারণ পরিবারের কাছ থেকে শেখা হয় না; বরং নবাগত সদস্যরা যখন ডেরায় প্রবেশ করে, তখন গুরুমা বা অভিজ্ঞ সদস্যদের কাছ থেকে শুনে শুনে ও ব্যবহার করে করে ভাষাটি আয়ত্ত করে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার বাক্য কাঠামো ঠিক রেখে উল্টি শব্দের প্রয়োগ করা হয়। যেমনঃ গোতিয়া, তুমসি চিশশা (মজুমদার, ১৯৫৪: ২২)।

> একইভাবে ভারতবর্ষের প্রায় সব এলাকায় সব ভাষা এবং উপভাষার বাক্য কাঠামোর উপর গড়ে উঠেছে ‘‘স্থানীয় উল্টি’’ উপভাষা। এমনকি একেক জেলার উল্টি শব্দের প্রয়োগের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। যেমনঃ বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলে মল বা পায়খানাকে উল্টি ভাষায় বলা হয় ‘‘গাইনী’’ বা ‘‘গাণ্ডী’’। কিন্তু ঝিনাইদহ জেলায় বলা হয় ‘‘ঘান্নী’’। খুলনা ও যশোর অঞ্চলে রক্তকে বলা হয় ‘‘নিরখা’’ কিন্তু পটুয়াখালী জেলায় বলা হয় ‘‘লক্ষর’’ (হোসেন, ২০০১: ৩২)।

এরকম স্থানীয় অনেক অনেক শব্দ নিজে থেকেও সৃষ্ট হয়েছে; যা উল্টিভাষার শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছে। উপরন্তু ভাষাকে করেছে গতিশীল, সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। এই ভাষাটি ব্যাকরণ তেমন একটা মেনে চলে না। এটি খুবই নমনীয়। আর সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, এই ভাষার একটা শব্দ কমপক্ষে দশটা অর্থ প্রকাশ করতে পারে বা দশ রকম অর্থে ব্যবহার করা যায়।

ভাষার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে অল্প শব্দ ব্যবহারে সহজভাবে অনেক অর্থ প্রকাশ করা যায়; ফলে শব্দভান্ডারে বেশি শব্দের প্রয়োজন হয় না তেমন একটা। তবে সেই অর্থে, এই ভাষার যে ঠিক কতগুলি শব্দ আছে তার হিসাব কখনো বের করা হয়নি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে কয়েকজন ব্রিটিশ গবেষকের করা গবেষণা থেকে একটা আনুমানিক হিসাব জানা যায় যে, কমপক্ষে ১০,০০০ শব্দ থাকতে পারে এই ভাষার শব্দ ভান্ডারে। কিন্তু এই সকল শব্দ বা শব্দভান্ডার কখনো লিপিবদ্ধ করা হয়নি। মৌখিক ভাবে শুধু শ্রুতি ও স্মৃতির মাধ্যমে এই ভাষাটি গুরু-চেলা পরম্পরায় শিক্ষা দেয় হিজড়ারা এবং নৃত্যশিল্পী ও কোতিরা। আর অল্প দু'চারটে শব্দ যা হিজড়ারা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে তা কখনই বহিরাগত মানুষদের কাছে প্রকাশ করা হয়নি। হিজড়া-গুরুরা চায় না যে, বহিরাগত মানুষেরা এটা সম্পর্কে জানুক।

উল্টি শব্দগুলো রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রূপকের ব্যবহার আধুনিক, উল্টিতেও দেখা যায়। যেমন: কাউয়ার চরকি (অর্থঃ বিমান বা উড়োজাহাজ)। সবসময় গোপন করে রাখার ফলে এবং শব্দভান্ডার লিপিবদ্ধ না করার ফলে এবং প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এই ভাষার চর্চা কমে যাওয়ার কারণে এই ভাষাটি হুমকির সম্মুখীন এবং যে কোনো সময় এটি হারিয়ে যেতে পারে। তাই এই ছোট্ট নিবন্ধের মাধ্যমে এই ভাষার বিষয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

উল্টি ভাষার শব্দ

১. ছিবড়ি- হিজড়া

২. নেহেরুনু নারী/স্ত্রী

৩. পান্থি- পুরুষ/প্রেমিক

৪. পারিখ- প্রেমিক/ স্বামী

৫. ধূরানি- যৌনকর্মী/ Slut/ Whore/ Prostitute/ Sex-worker

৬. নিল্কি- স্তন

৭. চিপটি- যোনী

৮. বাটলি- Butt

৯. লিগাম- Penis

১০. ঝোক- চুল/ লোম/ Pubic Hair

১১. টুন্না- ছেলে/যুবক

১২. টুন্নি- মেয়ে/যুবতী

১৩. ছুড্ডা- বৃদ্ধ/বয়স্ক পুরুষ।

১৪. ক্ষমা- চিশশা (ধফল)- কাচ্চি (ধফল)

১৫. হৃদরানি- বয়স্ক পুরুষ প্রেমিক- কমবয়স্ক পুরুষ প্রেমিক

১৬. মুখ- দাড়ি/ গোফ, সুন্দর/ সেক্সি/ ভালো/ সহজ, খারাপ/ অসুন্দর/কঠিন

১৭. গিরিয়া- Husband/ Permanent Lover

১৮. সিয়া-সাট্টা- বিবাহ/বিয়ে-শাদি

১৯. সিয়া- সাট্টা করা (Verb)- বিয়ে করা

২০. চৈতাল/টেতন মাসি- হিন্দু

২১. তিন কাঠি- মুসলমান

২২. চুল্লি- মুসলমান

২৩. চারকাঠি- খ্রিস্টান

২৪. সেইটুকনি- হুজুর/মৌলবি/Religious

২৫. আড়িয়াল (adj)/আড়িয়াল সে খাড়িয়াল- অনেক বড়, অনেক বেশি, অনেক ব্যাপক

২৬. ছুদ্রানি- সিমেন

২৭. লাহা লাহা (ঠ)- আড্ডা

২৮. ভেলকি (ধফল)- মিথ্যা
২৯. নেহারুন- স্ত্রী
৩০. খুটনি- কথা
৩১. ছিবরি- গাইনী
৩২. ঝলকা- টাকা
৩৩. ঝুট মাসি- চুল/উইগ
৩৪. ডেঙ্গু মাসি- পুলিশ
৩৫. গতিয়া- বন্ধু/বান্ধবী
৩৬. ছিতনা- বিয়ে
৩৭. পাতিয়া- টাকা
৩৮. ছল্লা মাঙ্গা- ভিক্ষা করা
৩৯. দোপাট্টা/দোপারাঠা- Bisexual
৪০. ঠসক- মেকআপ
৪১. ঠসক ঝিরা- মেকআপ করা
৪২. সাদ্রা- পোষাক
৪৩. নেহেরুন সাদ্রা- নারীদের পোশাক
৪৪. নেহেরুন সাদ্রা ঝিরা- নারীদের পোশাক পরা
৪৫. ছমকা-ছমকি করা- নাচা
৪৬. ছমকা-ছমকি- নাচ-গান
৪৭. ধুকনি- সিগারেট
৪৮. টাকনি- খাবার
৪৯. পাথার- দাঁত
৫০. পাতা মাসি- পা

(ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত, তারিখঃ ২০শে জানুয়ারি ২০২৫- ২৩শে জানুয়ারি, ২০২৫)

উল্টি ভাষার বৈশিষ্ট্য

উল্টি ভাষা বাংলা, উর্দু, হিন্দি এবং ফারসি শব্দের এক অভিনব মিশ্রণ। তবে এ ভাষায় ব্যাকরণ বা শব্দ গঠনের নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। প্রত্যেক অঞ্চলের হিজড়া সম্প্রদায় নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দ পরিবর্তন করে নেয়। বাংলাদেশের উল্টি ভাষার গঠন বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক কাঠামোর কাছাকাছি হলেও শব্দভান্ডারে রয়েছে প্রচুর

বিকৃতি ও সংক্ষিপ্তকরণ। (পিনি, ১৯৯২) হিজড়া সমাজের বাস্তব চিত্রকে আড়াল করতেই ওরা উল্টি ভাষার আশ্রয় নেয়। এছাড়া নানা ভাষাভাষী হিজড়া দলের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে মানসিক সাজুয্য ও ভাষাগত ঐক্য রক্ষার জন্যেও এই ভাষার ব্যবহার অনেক সময় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

উল্টি ভাষাকে পরিপূর্ণ ভাষা হিসাবে গণ্য না করার সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো, সব শব্দের প্রতিশব্দ এই ভাষায় নেই। শুধুমাত্র যে বিষয়গুলিকে গোপন করার দরকার হয়, সেইগুলিকে আশ্রয় করে কিছু শব্দ গড়ে উঠেছে। এই ভাষায় জীবনের সবদিক নিয়ে কথা বলা সম্ভব নয়। এর শব্দ ভান্ডার সীমিত। যে অঞ্চলে বা প্রদেশে উল্টি-ভাষা ব্যবহৃত হয়, সেই আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব এর ওপর এসে পড়ে। বিশেষ করে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। ধাতুর সঙ্গে যে অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয়ে বিভক্তির সৃষ্টি করে, তার অধিকাংশই আঞ্চলিক ভাষা দ্বারা প্রভাবিত। একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে, তবে তা নির্ভর করে বাক্য প্রসঙ্গের উপর। যেমন, 'কামারা' বলতে কোনো ব্যক্তি, স্থান, এমনকি অনুভূতিকেও বোঝানো হতে পারে। কখনো কখনো একটি নির্দিষ্ট ডেরা বা গোষ্ঠী তাদের সুবিধা অনুযায়ী শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে নেয়, যাতে বাইরের কেউ ভাষা বুঝতে না পারে।

উল্টি ভাষার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

ক. গোপনীয়তা: বাইরের মানুষ যেন বুঝতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে ভাষাটি বিকশিত।

খ. কোডিং বা সাংকেতিক ব্যবহার: নির্দিষ্ট শব্দ বা সংকেতের মাধ্যমে অর্থ প্রকাশ করা।

গ. লচিং বা শব্দ বিকৃতি: বাংলা বা হিন্দি ভাষার প্রচলিত শব্দকে বিকৃত করে ব্যবহার করা।

ঘ. আঞ্চলিকতা: একই শব্দের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন অর্থ হতে পারে।

ঙ. কথ্যভিত্তিকতা: ভাষাটি একেবারেই কথ্য, এর কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি বা রূপ নেই।

উল্টি ভাষা হলো চলমান জীবিত সংস্কৃতি, যা প্রতিনিয়ত বদলায় এবং সম্প্রদায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন অর্থ ধারণ করে।

উল্টি ভাষার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

উল্টি ভাষার গুরুত্ব কেবল গোপনীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি হিজড়া সম্প্রদায়ের এক প্রকার প্রতিরোধের ভাষা- এক সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার হাতিয়ার। সমাজ যখন তাদের অসম্মান ও অবহেলার চোখে দেখে, তখন নিজেদের মধ্যে দৃঢ় সংহতি বজায় রাখার জন্য উল্টি ভাষা আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়।

উল্টি ভাষার মাধ্যমে হিজড়া সম্প্রদায় নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে। এটি তাদেরকে নিজেদের মধ্যে একটি আলাদা সমাজ গঠনে সহায়তা করে, যা বাইরের সমাজকাঠামো থেকে আলাদা ও সংহত। অধিকাংশ সময় হিজড়াদের নানা সামাজিক বৈষম্য ও হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয়। উল্টি ভাষা ব্যবহার করে তারা প্রয়োজনীয় সংকেত আদান-প্রদান করতে পারে, যা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। উল্টি ভাষা হলো হিজড়া সংস্কৃতির মৌলিক অনুষঙ্গ। নৃত্য, গান, আচার-অনুষ্ঠান ও দৈনন্দিন জীবনে উল্টি ভাষার ব্যবহার তাদের সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ডেরার অভ্যন্তরে এবং অন্য ডেরার সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগে উল্টি ভাষার ভূমিকা অপরিসীম। এই ভাষার মাধ্যমে তারা নিজেদের অনুভূতি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ভাগ করে নেয়।

উল্টি ভাষার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। উল্টি ভাষা হিজড়া সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয়ের একটি প্রধান উপাদান। এটি তাদের আলাদা পরিচয় ও অস্তিত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেকটি ভাষার মতোই উল্টি ভাষা তাদের ইতিহাস, স্মৃতি ও সংগ্রামের ধারক-বাহক। ভাষার ভিতর দিয়েই একেকটি গোষ্ঠী নিজেদের পৃথিবী নির্মাণ করে। উল্টি ভাষা হিজড়াদের সেই নিজস্ব পৃথিবীর এক অদৃশ্য মানচিত্র (বসু, ১৯৯৭)।

প্রতিনিয়ত বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হওয়া এই জনগোষ্ঠীর জন্য উল্টি ভাষা এক রকম আত্মরক্ষার ঢাল। বাইরের মানুষের অজান্তে নিজেদের প্রয়োজনীয় বার্তা আদান-প্রদান করতে পারা তাদের নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। উল্টি ভাষার মধ্য দিয়ে হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে গভীর বন্ধন গড়ে তোলে। একই ভাষা ব্যবহার মানে একই পরিবারের সদস্য হওয়া, একই সংগ্রামের সঙ্গী হওয়া। নতুন কেউ ভাষা আয়ত্ত করলে সে 'আপন' হয়ে ওঠে। একজন গুরুমা জানান: ''ভাষা জানলে তবেই তুমি আমাদের। ভাষা জানো না, মানে এখনো বাইরের মানুষ।'' (চন্দ্রিমা হিজড়া, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, জানুয়ারি ২৩, ২০২৫)

উল্টিভাষার সাধারণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো:

ক. শব্দের উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটে । যেমন, 'টাকা'-কে বলা হয় 'তিপ্পি'।

খ. সম্পূর্ণ নতুন শব্দ তৈরি হয়, যার অস্তিত্ব মূল ভাষায় নেই। যেমন– ছুড্ডা (অর্থ: প্রবীণ)

গ. ইশারাভিত্তিক বা শরীরী ভঙ্গির মাধ্যমে অর্থ সম্প্রসারণ।

ঘ. ভাষায় হাস্য, বিদ্রুপ, সাংকেতিকতার উপস্থিতি।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো ভাষাটিকে একটি 'কোডেড ডিসকোর্স' (Coded Discourse)-এ পরিণত করে, যা শুধু সদস্যরা বুঝতে সক্ষম। হিজড়াদের উল্টি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলোকে সাধারণত পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি:

১. যৌনতা বিষয়ক: হিজড়ারা জনসমক্ষে নিজেদের অ-যৌন হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চায়। ফলে যৌনজীবন ও যৌন-অঙ্গ সম্পর্কিত সমস্ত কথাই ওরা ব্যক্ত করে উল্টি ভাষার মাধ্যমে। লিঙ্গচ্ছেদন সম্বন্ধে কথাবার্তাও হয় উল্টি ভাষায়।

২. শারীর বিষয়ক: যৌন-অঙ্গ ছাড়াও আরও কিছু-কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা উল্টিভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেসব অঙ্গের সঙ্গে যৌনতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, সেগুলো উল্টি ভাষায় প্রকাশ করার জন্যে কৃত্রিম শব্দের উদ্ভব হয়েছে। হিজড়ারা মুখকেও যৌনাঙ্গ ভাবে। ফলে মুখের জন্যে স্বতন্ত্র প্রতিশব্দ সৃষ্টি হয়েছে- খোমর। কিন্তু শরীর বিষয়ক অন্য শব্দগুলোর ক্ষেত্রে মূল শব্দের সঙ্গে মাসি ও মাছিয়া যুক্ত করা হয়, যেমন: হাত + মাসি > হাতমাসি; কানমাসি > কানমাসি; গোর + মাছিয়া > গোরমাছিয়া।

৩. দুষ্কর্ম ও অর্থ বিষয়ক: হিজড়ারা নানান ধরনের দুষ্কর্মের সঙ্গে যুক্ত। যেমন– চাঁদাবাজি। ফলে দুষ্কর্ম সম্পর্কিত অনেক শব্দই হিজড়াদের উল্টি ভাষায় স্থান পেয়েছে। এছাড়া টাকাপয়সার বিভিন্ন পরিমাণ বোঝাতেও ওরা নানা প্রকার কৃত্রিম শব্দ ব্যবহার করে।

৪. আত্মীয়-স্বজন বিষয়ক: হিজড়া লোকগোষ্ঠীতে এক সদস্যের সঙ্গে অন্য সদস্যের বিভিন্ন রকম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একে অন্যকে বিভিন্ন নামে সম্বোধন করে। আবার স্বাভাবিক জীবনের মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতির কথা নানা প্রসঙ্গে উঠে আসে বলে, অথবা এই সম্পর্ক বিষয়ে কোনো-কোনো কথা গোপন রাখার প্রয়োজনে উল্টি ভাষায় ভিন্নভাবে ব্যক্ত হয়।

৫. ক্রিয়াবিষয়ক: উল্টি ভাষায় ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্য কম। এখানে একই ক্রিয়াকে একাধিক অর্থে ব্যবহার করা হয়।

গোষ্ঠীবদ্ধ সংযোগের কৌশল হিসেবে উল্টিভাষা

গোষ্ঠীর সামগ্রিকতা (Communal Cohesion): উল্টিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে হিজড়ারা নিজেদের একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে অনুভব করেন। এই ভাষার মাধ্যমে সদস্যরা একে অপরের প্রতি আস্থা ও সংহতি গড়ে তোলে। ভাষা শেখা মানে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মূল্যবোধ, আচরণবিধি ও সংস্কৃতি আত্মস্থ করা।

গোপনীয়তার কৌশল: প্রকাশ্য সমাজে নিজস্ব আলাপচারিতা বজায় রাখার জন্য উল্টিভাষা ব্যবহৃত হয়। বাইরের মানুষ তাদের সংলাপ বুঝতে পারে না, ফলে এটি এক ধরনের 'সামাজিক আবরণ' (Social Shield) হিসেবে কাজ করে। মিশেল ফুকোর 'Subjugated Knowledges' ধারণার সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, এটি সামাজিকভাবে দমনকৃত গোষ্ঠীর নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার গোপন ভাষা।

প্রতিরোধের ভাষা: উল্টিভাষা শুধু নিরাপত্তার নয়, আত্মমর্যাদার প্রতিরোধও। এটি সামাজিকভাবে অদৃশ্য করে রাখার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্বের প্রকাশ। জেমস স্কটের "Weapons of the Weak" তত্ত্বে যেমন বলা হয়েছে, প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো কখনো সরাসরি সংগ্রাম করে না; বরং নীরব ও সাংকেতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। হিজড়াদের উল্টিভাষা সেই গোপন প্রতিরোধের মাধ্যম।

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বাহক: উল্টিভাষার মধ্য দিয়ে গোষ্ঠীর ইতিহাস, আচার-অনুষ্ঠান, আনন্দ-বেদনা, এমনকি রাজনৈতিক চেতনা প্রজন্মান্তরে সংরক্ষিত ও প্রেরিত হয়। এর মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র হিজড়া সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা বৃহত্তর সমাজের ভাষাগত কাঠামোর বাইরে দাঁড়িয়ে নিজস্ব জগৎ তৈরি করেছে।

বিশেষ আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সংকেত ভাষার জন্ম হয় এবং ধীরে ধীরে তা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের অভ্যন্তরে বিস্তার লাভ করতে থাকে। বহুল ব্যবহারের ফলে অনেক সময় কোনো কোনো শব্দ শিষ্টজনের ভাষাতেও স্থান পায়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বর্তমান শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সংকেত ভাষা নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করে ভাষাবিজ্ঞানী হ্যালিডে দেখাতে চেয়েছেন,

> বিভিন্ন সংকেত-ভাষার প্রয়োগ, সৃষ্টি ও তার পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। তাই এর থেকে বলা যেতে পারে, সংকেত ভাষা ও কৃত্রিম ভাষার জন্ম রহস্য নিহিত রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু কারণের মধ্যে, যা সব দেশেই মোটামুটি একরকম (হ্যালিডে, ১৯০৫: ২০)।

রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্ব ও হিজড়াদের লোকভাষা

স্টুয়ার্ট হল (Stuart Hall) রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক, যিনি বলেছেন- রিপ্রেজেন্টেশন মানে শুধু কোনো কিছুর প্রতিচ্ছবি তৈরি করা নয়, বরং নতুন অর্থ নির্মাণ করা। ভাষা, প্রতীক, চিত্র- সবই সাংস্কৃতিক অর্থ গঠনের হাতিয়ার। এখানে রিপ্রেজেন্টেশন ক্ষমতা, রাজনীতি এবং পরিচয়ের প্রশ্নের সাথে জড়িত।

রিপ্রেজেন্টেশন মানে কেবল বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি নয়। এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভাষা, প্রতীক, চিত্র, শব্দ ইত্যাদির সাহায্যে নতুন অর্থ (meaning) সৃষ্টি হয়। ভাষা (Language) শুধু ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়, বরং ভাষাই বাস্তবতার ধারণা তৈরি করে। ভাষা ছাড়া কোনো কিছুর নির্দিষ্ট অর্থ থাকে না। আমরা কোনো কিছুকে যেমন আছে তেমন করে দেখাই না। আমরা সাংস্কৃতিক চিহ্ন (sign) ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করি, গঠন করি। ফলে, রিপ্রেজেন্টেশন সর্বদা রাজনৈতিক ও আদর্শিক (ideological)।

"Representation is the production of meaning through language" (হল, ২০১৫: ৪)। অর্থাৎ, রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে ভাষার মাধ্যমে অর্থ নির্মাণ। উল্টি ভাষা প্রচলিত অর্থ ও কাঠামোকে সরাসরি অনুসরণ করে না। বরং প্রচলিত 'কোড'-কে (সংকেত বা অর্থবোধক নিয়ম) চ্যালেঞ্জ করে। স্টুয়ার্ট হলের মতে, ভাষা যদি অর্থ তৈরি করে, তাহলে ভাষার নিয়ম ভাঙলে নতুন অর্থ বা নতুন পাঠের সম্ভাবনা তৈরি হয়। উল্টি ভাষা প্রভাবশালী অর্থ বা সামাজিক মান্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করে। উল্টি ভাষার মাধ্যমে বলা যায়: "ভাষা আমাদের উপর চাপানো নয়; ভাষা আমরা নিজেরা নির্মাণ করি।" (হল, ২০১৫: ২০) এই ধারণা স্টুয়ার্ট হলের রিপ্রেজেন্টেশনের মূল বক্তব্যের সাথে মেলে- যে ভাষার ব্যবহার মানেই অর্থ তৈরি ও ক্ষমতার খেলা। "Representation connects meaning and language to culture, and it is deeply implicated in questions of power" (হল, ২০১৫: ২৪)

অর্থাৎ, রিপ্রেজেন্টেশন ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে অর্থকে যুক্ত করে এবং এটি ক্ষমতার প্রশ্নের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। অর্থ কখনোই চূড়ান্ত বা স্থায়ী নয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অর্থ পরিবর্তিত হয়। 'সংকেতলিপি বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিতে অর্থ সম্পর্ক সুস্থিত করে, (ইমরান, ২০১০: ৮৪) যার মাধ্যমে প্রচলিত ভাষাগত অর্থের কাঠামো ভেঙে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়, নতুন পরিচয় নির্মিত হয় এবং প্রভাবশালী সংস্কৃতিকে প্রশ্ন করা হয়। হিজড়াদের উল্টি ভাষাও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নিজস্ব অর্থ সুস্থিত করে।

রিপ্রেজেন্টেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতির সদস্যদের মধ্যে অর্থ উৎপন্ন ও বিনিময় হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে ভাষা, চিহ্ন ও ইমেজের ব্যবহারসূত্রে বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ নির্দেশ ও উপস্থাপন হয়। ভাষার প্রধান গুণ হচ্ছে অর্থ তৈরি করা। রিপ্রেজেন্টেশন ভাষা ও এর অর্থকে সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত করে। হিজড়া গোষ্ঠীর লোকভাষা নিজেরাই তৈরি করে, নিজেরাই এই শব্দগুলোর ওপর অর্থ নির্দেশ করে যার কোনো লিখিত রূপ নেই। কন্টেক্সট ও সংস্কৃতি অনুযায়ী অর্থ ভিন্ন হয়ে যায়। একই উল্টি ভাষার যে অর্থ বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয় তা অন্য কনটেক্সটে হয় না। আবার, বাংলাদেশেও সব ভৌগোলিক অবস্থানে একই উল্টি শব্দের একই অর্থ রিপ্রেজেন্ট হয় না। যেমন: 'বিয়ে' শব্দের উল্টি ভাষা কোথাও 'ছিতনা', কোথাও 'ছেতনা' আবার কোথাও 'সিয়া' বা 'সাট্টা'। 'মুখ' শব্দটি দিয়ে এক অঞ্চলের হিজড়া গোষ্ঠী মনে করে দাড়ি, কোথাও মনে করে অসুন্দর। অর্থ একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হিজড়াগোষ্ঠীতে ভিন্ন অর্থ উৎপাদন ও রিপ্রেজেন্ট করে।

গবেষণা ফলাফল

হিজড়াদের ভাষা একটি স্বতন্ত্র লোকভাষা– যা তাদের নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভাষাটি মৌখিক ও অনানুষ্ঠানিক। এই ভাষা সাধারণ কথ্য বা আঞ্চলিক ভাষা থেকে ভিন্ন এবং 'উল্টি ভাষা' হিসেবে পরিচিত লোকভাষা। ভাষাটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের হাতিয়ার– এই ভাষার মাধ্যমে হিজড়া সম্প্রদায় নিজেদের পরিচয় রক্ষার পাশাপাশি মূলধারার সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। উল্টি ভাষা গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার মাধ্যম– বাইরের মানুষ যাতে বুঝতে না পারে, সেই লক্ষ্যেই ভাষার গঠন ও ব্যবহার। তাই এটি একটি কোড ভাষা, যা স্টুয়ার্ট হলের রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্ব দিয়ে বোঝা যায়। এই ভাষা হিজড়াদের পারস্পরিক সংযোগ, আত্মপরিচয়ের বোধ এবং যৌথ সাংস্কৃতিক প্রতিরোধকে সমুন্নত রাখে। ভাষাটির রূপান্তরশীলতা ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যময়তা রয়েছে– একই শব্দ বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। এই প্রক্রিয়ায় উল্টি ভাষা বৈচিত্র্যময়তা লাভ করছে, জীবন্ত প্রবহমান এবং পরিবর্তনশীল থাকছে। তবে এ ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দভাণ্ডার তৈরি, নথিভুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এতে হিজড়াদের ভাষা পরিবর্তনের রূপ বিশ্লেষণ ও অধিকতর গবেষণার করার সুযোগ তৈরি হবে।

উপসংহার

হিজড়া জনগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র লোকগোষ্ঠী। উল্টিভাষার মধ্য দিয়ে গোষ্ঠীর ইতিহাস, আচার-অনুষ্ঠান, আনন্দ-বেদনা, এমনকি রাজনৈতিক চেতনা প্রজন্মান্তরে সংরক্ষিত ও প্রেরিত হয়। এর মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র হিজড়া সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা বৃহত্তর সমাজের ভাষাগত কাঠামোর বাইরে দাঁড়িয়ে নিজস্ব জগৎ তৈরি করেছে। উল্টি ভাষার গুরুত্ব কেবল গোপনীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি হিজড়া সম্প্রদায়ের এক প্রকার প্রতিরোধের ভাষা- এক সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার হাতিয়ার। তাই, বলা যায়, এ ভাষা কেবল কথোপকথনের মাধ্যম নয়; বরং এটি হয়ে উঠেছে একটি প্রতিরোধমূলক সংস্কৃতি, যা মূলধারার সমাজে তাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার শক্তি জোগায়। সময়ের প্রেক্ষিতে ভাষার রূপ বদলালেও, এর প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য ঠিকই অটুট থাকে। যদিও সমাজ উল্টি ভাষায় প্রচলিত অর্থ ও কাঠামোকে স্বীকৃতি দেয় না, বরং প্রচলিত ‘কোড’-কে (সংকেত বা অর্থবোধক নিয়ম) চ্যালেঞ্জ করে। ফলে সমাজ যখন উল্টি ভাষাকে অবহেলার চোখে দেখে, তখন হিজড়ারা উল্টি ভাষার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে দৃঢ় সংহতি বজায় রাখে এবং এটিকে নীরব প্রতিবাদের একটি হাতিয়ার রূপে দাঁড় করায়। এই ভাষার মাধ্যমে হিজড়া সম্প্রদায় নিজেদের স্বাজাত্যবোধ বজায় রাখে। এটি তাদেরকে নিজেদের মধ্যে একটি আলাদা গোষ্ঠী গঠনে সহায়তা করে, যা বাইরের অন্য গোষ্ঠী থেকে আলাদা ও সংহত। এটি একটি স্বতন্ত্র লোকভাষা, যা মূলধারার ভাষাব্যবস্থার বাইরে গড়ে ওঠা একটি সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

তথ্য-নির্দেশ

ইমরান, মাসউদ। (২০১০)। *ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা*, মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

গুহ, পথিক। (১৯৯৪)। *ছেলে কিংবা মেয়ে ইচ্ছে মতোন*, *দেশ পত্রিকা*, ৩।

দাশগুপ্ত, পিনি। (১৯৯২)। হিজড়া কথা, উৎস মানুষ: ঢাকা।

বসু, নিলয়। (২০১১)। *ভারতের হিজড়া সমাজ*, দীপ প্রকাশন: কলকাতা।

সেন, সুকুমার। (১৯৯৫)। *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা।

হোসেন, সেলিনা। (২০১৯)। *হিজড়া শব্দকোষ*, সময় প্রকাশন: ঢাকা।

Dorson, R. M. (1959). *American Folklore.* Chicago Press.

Dundes, Alan. (1980). *Interpreting Folklore.* Indiana University Press.

Hall, Stuart. (1997). *Representation, Cultural Representations and Signifying practices.* Sage publication.

Halliday, Michael. (1996) *Introduction to Functional Grammar*. London Press.

Leach, Maria. (1949). *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend.* Funk and Wagnalls.

ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যদাতাঃ

২০শে জানুয়ারি ২০২৫, তথ্যদাতার নাম- শিমু, বয়স- ২১, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- নেত্রকোনা।

২০শে জানুয়ারি ২০২৫, তথ্যদাতার নাম- নূরি, বয়স- ২৩, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- নেত্রকোনা।

২০শে জানুয়ারি ২০২৫, তথ্যদাতার নাম- অভাগী, বয়স- ২৬, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- নেত্রকোনা।

২১শে জানুয়ারি ২০২৫, তথ্যদাতার নাম- রুবিনা, বয়স- ২২, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- নেত্রকোনা।

২১শে জানুয়ারি ২০২৫, তথ্যদাতার নাম- সাবিনা, বয়স- ২৮, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- নেত্রকোনা।

২২শে জানুয়ারি ২০২৫, তথ্যদাতার নাম- শাম্মী, বয়স- ৩০, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- ময়মনসিংহ।

২৩শে জানুয়ারি ২০২৫, তথ্যদাতার নাম- ফুল, বয়স- ২৭, পেশা- হিজড়াবৃত্তি, ঠিকানা- ত্রিশাল।

পাঁচবিবি উপজেলার ওরাওঁ নৃগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনমনে ভাষাগত পুঁজির প্রভাব

মনসুর আহমেদ*

Abstract: Bangladesh has achieved recordable success in education, available information and economic opportunity, but these are yet dreams to the ethnic Oraon community in Pachbibi Upazila of Joypurhat district. Due to their lack of linguistic capital, the Oraon community could not embrace these opportunities. The study has explored the influence of linguistic capital on the deterioration of linguacultural and socio-economic conditions. For extracting the objectives, the study has employed observation, formal and informal in-depth interviews, and secondary sources. Their traditional language Kurukh was used only in the tribe, family and community. Consequently, they could not communicate freely with the economic, social and political structure of the larger community where 'Bangla' is a common language. They have no scope to avail education, information and economic opportunity. Even they are often exploited by the dominant community due to the lack of enough Bangla words and jargon during the exchange of commodities and assets. However, they are now used to Bangla, but their accent, tone, posture, and physical gestures do not suit the current market. Their kids could not access and adapt to the existing education settings due to the linguacultural gap. Unfortunately, there is no government policy or step to upgrade their language skills and uplift their socio-economic status.

মূলশব্দ (Keyword): ভাষাগত পুঁজি (linguistic capital), ভাষা-সংস্কৃতি (linguacultural), প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি (institutional credential) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (ethnic minority), পৃষ্ঠপোষক-মক্কেল (patron-client relation), অভিগমন (access)

* Mansur Ahmed, Assistant Professor, Political Science, Attached: Bogra Government College, email: monsurahmed79@gmail.com

ভূমিকা

ভাষা সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর ভাষাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতি বহমান থাকে। পৃথিবীব্যাপী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সেই ভাষাই আজ হুমকির সম্মুখীন। ইউনেস্কোর তথ্যমতে (UNESCO, 2024), পৃথিবীর সাত হাজার ভাষার মধ্যে চল্লিশ শতাংশ ভাষা আজ বিপন্ন এবং গড়ে প্রতি দুই সপ্তাহে একটি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। ভাষার এই বিপন্ন অবস্থানের পেছনে কাজ করে বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর সামাজিক ক্ষমতার বিস্তরণ ও সরকারের নীতি-উদ্দেশ্য। বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠী তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কারণ, ভাষার আগ্রাসনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণের পথ উন্মুক্ত হয়; যেমন ১৯৪৭ পরবর্তী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। তাতে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল শাসন ও শোষণের পথ দীর্ঘ করা। কিন্তু বৃহৎ বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর সামাজিক সক্ষমতা ও প্রতিরোধের কারণে তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পক্ষে এই ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন কৌশলে নিজেদের ভাষা চাপিয়ে দেয়, ক্ষমতা চর্চার মাধ্যমে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ভাষা বিকাশের পথ বন্ধ বা সংকুচিত করে। সুতরাং, বাধ্য হয়ে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভাষাকে রপ্ত করে তাদের টিকে থাকতে হয়। মাতৃভাষা ছেড়ে অন্য ভাষা রপ্তকালে হারিয়ে যেতে থাকে নিজস্ব সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা। তারা বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাষা দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। অর্থাৎ ভাষাগত পুঁজির সংকটে তারা যোগাযোগ, সম্পর্ক ও বিনিময়ে ব্যর্থ হয়। ফলে শিক্ষা, তথ্য সংগ্রহ ও কাজের সুযোগ এবং নাগরিক সুবিধাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়।

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির খাজনা নীতি, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবতর্নের পূর্বে বিহারের ভূমি জরিপ এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ওরাওঁরা ব্যাপক ভূমি সংকট ও শোষণের শিকার হয়। পরবর্তীতে ওরাওঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে (জাকারিয়া, ২০২২)। তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক সত্তা। তাদের এই স্বতন্ত্র সত্তার জন্য ঔপনিবেশিক শাসক, জমিদার, মহাজন ও মধ্যস্বত্ব ভোগকারীদের দ্বারা বারবার নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশই আজ ভূমিহীন ও নিঃস্ব (Islam, 2022)। তাদের এ শোচনীয় অবস্থার অন্যতম কারণ ভাষাগত পুঁজির সংকট। তাদের কুঁড়ুখ ভাষা বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্বীকৃত নয়, ফলে এটি আজ বিপন্ন ভাষা। সেই সাথে হারিয়ে যেতে বসেছে তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। তাদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী এখন বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু বাংলার উচ্চারণ ভঙ্গি, ব্যবহারের সাবলীলতা, তথ্য সংগ্রহ, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে সাংস্কৃতিক ব্যবধান, প্রচলিত কাঠামো ও কমিউনিটির কাঠামো বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য, যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বড়ো বাধা। এই প্রবন্ধে পাঁচবিবি উপজেলার ওরাওঁ নৃগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনমনে ভাষাগত পুঁজির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভাষাগত পুঁজির ধারণাগত প্রত্যয়

ভাষাগত পুঁজি প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী পিয়েরে বোর্দিউ। তিনি পুঁজির বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ প্রত্যয় ব্যবহার করেন। তাঁর মতে (Bourdieu, 1986), ভাষাগত পুঁজি সাংস্কৃতিক পুঁজির এক অন্যতম রূপ যা একজন ব্যক্তির ভাষাগত দক্ষতার সমষ্টিকে নির্দেশ করে। যার দ্বারা সমাজে তার অবস্থান পাকাপোক্ত হয়; যদি তা বিদ্যমান শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ, ভাষা যোগাযোগ দক্ষতা তার অবস্থানকে সমাজে শক্তিশালী করে। ভাষা দক্ষতা সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যখন একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভাষা সামাজিক বৈধতা দ্বারা নির্ধারিত হয়, তখন তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধার ক্ষেত্রগুলো উন্মোচিত হয়; যেমন বাজারে কাজের সন্ধান, সেবা, সম্পর্ক, রাষ্ট্রীয় সুবিধা গ্রহণ ইত্যাদি। আবার যদি ব্যক্তির নিজস্ব ভাষা দক্ষতা সামাজিক ও বাজার ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্যতা না পায়, তখন সে ক্ষমতা কাঠামোর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে না। অর্থাৎ, পশ্চাৎপদ সংস্কৃতির জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হন। অর্থনৈতিক পুঁজির ন্যায় ভাষাগত পুঁজির প্রভাব সর্বত্র কিন্তু তা কাজ করে ব্যক্তির দক্ষতা ও স্বীকৃতির শর্তাধীনে। মরিস ও লুই (Morrison & Lui, 2000: 473) এর মতে, "Linguistic capital can be defined as fluency in, and comfort with, a high-status, world-wide language which is used by groups who possess economic, social, cultural and political power and status in local and global society." ইয়োসো (Yosso, 2005) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ভাষাগত পুঁজির অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, সমাজে বিদ্যমান যে প্রতিষ্ঠানের কাঠামো থাকে তা সাধারণত প্রভাবশালী ভাষা কাঠামো দ্বারা নির্মিত। সেক্ষেত্রে প্রভাবশালী ভাষাগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েরা ঐ কাঠামোর সাথে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে এবং ভাষাকে রপ্ত করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য নয়, সে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে না। কারণ তার নিজস্ব সম্প্রদায় ও সংস্কৃতি থেকে বিদ্যমান কাঠামোর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ শব্দ ও ধারণা লাভ করে না। শৈশব থেকে প্রাপ্ত শব্দ ভান্ডার সমাজ দ্বারা স্বীকৃত নয়। কার্যত, সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। কোথাও কোথাও উন্নত প্রযুক্তিগত ভাষা আধিপত্য বিস্তার করে। সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ভাষাগোষ্ঠী বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়। যদিও ক্ষুদ্র ভাষাগোষ্ঠীর উন্নত বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা গ্রহণের সুযোগ থাকে তথাপি ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণকালে অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়।

গবেষণার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ৫০টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১৬ লাখ ৫০ হাজার ৪৭৮ জন । তার মধ্যে ওরাওঁদের সংখ্যা ৮৫ হাজার ৮৫৮ জন (জনশুমারি, ২০২২)। ভাষাকে কেন্দ্র

করে ওরাওঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। নৃবিজ্ঞানীরা তাদেরকে দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর কুরখার হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা ঐতিহাসিকভাবে কাল্পনিক রাজা কারাক এর সাথে সম্পৃক্ত (Tirkey, 2015)। বলা হয়, এক সময় ওরাওঁরা কারুস-ডেশ রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন, যা বর্তমান ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের শাহাবাদ জেলা। দ্বাদশ শতকের শেষে ছোটো নাগপুর মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। ধারণা করা হয়, এতদঞ্চলে প্রচুর মূল্যবান খনিজ সম্পদ আছে। সম্পদ লাভের আশায় ১৫৮৫ সালে সম্রাট আকবরের শাসনামলে নবাব শাহবাজ নাগপুরে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি কোনো মূল্যবান সম্পদ পান না। কিন্তু ওরাওঁ ও মুণ্ডাদের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করেন। পরবর্তীতে ১৬১৬ সালে ইব্রাহীম খাঁন আবার ছোটো নাগপুর আক্রমণ করেন এবং নতুন করে আবার কর চাপিয়ে দেন। এই সময় কিছুসংখ্যক ওরাওঁ নিবাসচ্যুত হন বলে গবেষকদের অভিমত (জাকারিয়া, ২০২২)।

পরবর্তীকালে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পূর্বেই বিহারে ভূমি জরিপ হয়। সেই সময় স্থানীয় ক্ষমতাসীনরা ওরাওঁদের অনেক জমি নিজেদের নামে রেকর্ড করে নেন। তাদের দখলকৃত জমির ৩,৬১৪ বর্গমাইলে ভূমি থেকে নেমে আসে ১৪৪ বর্গমাইলে। বিনা রসিদে খাজনা আদায় থেকে শুরু করে নানা শোষণমূলক অত্যাচার চলতে থাকে ওরাওঁদের ওপর। চালু করা হয় গোল্লাবিট্টী অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে পালাক্রমে জমিদারকে শ্রমদান (জাকারিয়া, ২০২২)। তখন থেকে ওরাওঁরা ছোটো নাগপুর থেকে উচ্ছেদ হয়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করে। তখন উত্তর বাংলার বাহক ভাষা ছিল সাদরি। সাদরি ভাষার অনেক উপাদান কুঁড়ুখ ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ওরাওঁরা দ্বি-ভাষী হিসেবে অভ্যস্ত হন, যে কারণে অনেকে ওরাওঁদের কুঁড়ুখ ভাষার সাথে সাদরি মিলিয়ে ফেলে। বাংলাদেশ অংশে বাংলা ভাষার প্রভাবে অধিকাংশ ওরাওঁরা বাংলা ব্যবহার করেন। কিছু ওরাওঁ আছেন যারা বাংলা ও কুঁড়ুখ উভয় ভাষাই ব্যবহার করতে পারে। তবে এই সংখ্যা খুবই কম। কুঁড়ুখ ভাষার নেই নিজস্ব লিপি, যা ভাষা সংরক্ষণ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অন্যতম বাধা (আহমেদ, ২০১১)। অন্যান্য ভাষার মতো ইহাও প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি বা দেবনাগরী লিপির ধ্বনি ও প্রভাব দ্বারা উচ্চারিত হবার সক্ষমতা রাখে। ওরাওঁ ভাষার মধ্যে তিনটি ব্যাবহারিক রূপ দৃষ্ট হয়, যথা– বিহারিয়া, নাগপুরিয়া ও পারগনিয়া (আলী, ২০০২)। ওরাওঁদের বিশ্বাস, অতীতকালে তাদের লিপি বা বর্ণমালা ছিল। তার নাম ছিল তলংসিকি (মুরাদ, ২০১৫)।

জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবির ওরাওঁ কৃষি পরিবারগুলো ছিল সচ্ছল, কিন্তু আজ তারা ভূমিহীন ও কৃষি শ্রমিক। তাদের এই দুরবস্থার অন্যতম কারণ ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্থান দুটি পৃথক দেশ হওয়ার সময় দাঙ্গা এবং নতুন করে স্থানান্তর। অতপর; ১৯৫১ সালে পাকিস্থানে জমিদারি ব্যবস্থা বাতিল হয়। ফলে অনেক ওরাওঁ তাদের আবাদি জমি হারায়। সেই সাথে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক ওরাওঁ উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ফিরে অনেকে নিজস্ব বাড়ি-

ঘর, মালামাল ও জমিজমা দখলে পাননি। মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির প্রেক্ষিতে ওরাওঁদের এই অবস্থা (Islam, 2022)। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ধনী মুসলিম ও মহাজনদের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে পৃষ্ঠপোষক-মক্কেলের (patron-client) ন্যায়। তাদের ভাষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেই কোনো সরকারি নীতি ও পদক্ষেপ। তাদের সমৃদ্ধ ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। এখানকার তরুণ ওরাওঁরা কুঁড়ুখ ভাষা ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু কুঁড়ুখ ভাষার উন্নয়নের জন্য যেমন নেই কোনো পদক্ষেপ, তেমনি বাংলা ভাষায় দক্ষ করে তোলার জন্যও নেই কোনো পদক্ষেপ। তারা যতটুকু বাংলা রপ্ত করেছে, সেইটুকুরও নেই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। কার্যত ওরাওঁরা ভাষাগত পুঁজির অভাবে জাতীয় উন্নয়নে যেমন অংশগ্রহণ করতে পারছে না, তেমনি নিজেদের উন্নয়নও করতে পারছে না।

পাঁচবিবি উপজেলায় ওরাওঁদের বসতি তুলসী গঙ্গা নদীর কোল ঘেঁষে আটপুর ইউনিয়নের উচাই মৌজার ১৪টি গ্রামে। এই গ্রামগুলোতে প্রায় ২০০টি ওরাওঁ পরিবার বসবাস করে। তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সত্তা গড়ে ওঠেছে কুঁড়ুখ ভাষা ও কৃষিকে কেন্দ্র করে। কতিপয় বয়স্ক ছাড়া এখনকার ওরাওঁরা কুঁড়ুখ ভাষা ব্যবহার করতে পারে না। তাদের বাংলা ভাষা উচ্চারণ ভঙ্গি, স্বর, সাবলীলতা ও শারীরিক সাযুজ্যে রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি। তাদের ভাষা শিক্ষার জন্য নেই কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। ভাষাগত পুঁজির অভাবে তারা সরকারি-বেসরকারি সেবা যেমন গ্রহণ করতে পারছে না, তেমনি কর্মস্থানের জন্য বাজারে অভিগমন করতে পারছে না। অন্যদিকে, কমিউনিটির সাংস্কৃতিক ব্যবধানের কারণে প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। কারণ তাদের ছেলে-মেয়েরা যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ভাষা শিখে বেড়ে ওঠে স্কুলের প্রচলিত কাঠামোতে তা প্রযোজ্য নয়। ফলে স্কুলের পঠন-পাঠনের সাথে তারা সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে না, আনন্দ পায় না। একটা পর্যায়ে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। এই পরিবারগুলো দিন দিন ভাষাগত পুঁজির অভাবে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, পাঁচবিবির ওরাওঁ নৃগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও ভাষাগত পুঁজির সংকটের প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই গবেষণা প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য পাঁচবিবির ওরাওঁ নৃগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি ও ভাষাগত পুঁজির অভাবে সৃষ্ট সমস্যার স্বরূপ সন্ধান করা। এই উদ্দেশ্যকে ধারণ করে দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: (১) পাঁচবিবির উচাই মৌজার ওরাওঁ নৃগোষ্ঠীর বর্তমান ভাষা-সংস্কৃতির অনুসন্ধান এবং (২) ওরাওঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অবনমনে ভাষাগত পুঁজি সংকটের প্রভাব বিশ্লেষণ। গবেষণার উদ্দেশ্য যেহেতু ভাষা-সংস্কৃতি ও ভাষাগত পুঁজি। সেহেতু গবেষণায় গুণগত পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার এবং মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বর্ণনামূলক পদ্ধিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

পাঁচবিবির ওরাওঁ পরিবারগুলো শত শত বছর থেকে বসবাস করছে। সেখানকার মুসলিম ও হিন্দু জনগোষ্ঠী উন্নয়নের স্রোত ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে। কিন্তু ওরাওঁরা ভাষাগত পুঁজির অভাবে শিক্ষা, তথ্য, নাগরিক হিসেবে সরকারি-বেসরকারি সুবিধা গ্রহণ এবং কর্মসংস্থানের নতুন বাজারে প্রবেশ করতে পারেনি। আবার সংস্কৃতির ব্যবধান ও দারিদ্রের কারণে তাদের ছেলে-মেয়েরা প্রচলিত প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। আজ অধিকাংশ ওরাওঁ পরিবার ভূমিহীন ও কৃষি শ্রমিক। কতিপয় বয়স্ক ওরাওঁ ব্যতীত সকলে এখন বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু তাদের ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নেই কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা সরকারি নীতি। আবার বিশেষ প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা না থাকায় তারা যতটুকু বাংলা ভাষা রপ্ত করেছে সেইটুকুরও নেই কোনো স্বীকৃতির ব্যবস্থা। কার্যত, সরকারি-বেসরকারি নীতিসহায়তা ও পদক্ষেপের অভাবে যেমন তাদের ভাষা-সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে বসেছে তেমনি তারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। পাঁচবিবির ওরাওঁদের ভাষাগত পুঁজির এই সংকট নিয়ে নেই কোনো গবেষণা। এই গবেষণাটি নীতি নির্ধারণে বিশেষ করে তাদের ভাষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ওরাওঁদের বিপন্ন ভাষা-সংস্কৃতি

পাঁচবিবিতে বসবাসরত ওরাওঁদের সংস্কৃতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা তাদের ভাষাগত ঐতিহ্য, কৃষি চর্চা এবং বংশানুক্রমিক প্রথার সাথে সম্পর্কিত। তাদের প্রতিটি লোককাহিনি, ধাঁধা, নৃত্য এবং গান পৃথক বৈশিষ্ট্য বহন করে। তারা নৃত্য ও গানে মাদল, করতাল, ঝুমকি, নাগরা, ঢাক ব্যবহার করে। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা বাদ্যযন্ত্রের সুর ধ্বনি পরিবর্তন করে থাকে। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ওরাওঁ পরিবারগুলো এখনো কৃষি উৎসব পালন করে; যেমন ধানবুনি, ধানগাড়ি এবং খালিহান। এসব উৎসব পালনের সময় তারা কুঁড়ুখ ভাষায় গান করে (কিশপট্টা, ২০০৯)। এরূপ দুটি সংগৃহীত গান নিম্নে দেওয়া হলো। ওরাওঁদের মধ্যে যিনি বাংলা লিখতে পারে এমন একজন গানগুলো লিখে দিতে সহায়তা করেছিল। তারা গানে উড়নি, টেঁড়াহ এবং গরিয়ার বলার সময় বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ তাল ও সুর দিয়ে থাকে।

(১)

গরিয়ারে কেতনা দিন মুই তো
কু য়াওে রহবউ, কেতনা দিন মুই তো
দুয়ারে রহবউ।

নেই লে ওর মেটারগাড়ি

নেই লেওব বায়াতি,
মুই তোকে ভাইগ যাবোউ লেইকে আধাবাতি
গরিয়ারে ...

ম চলতো গৈয়া চলতো মুই
আচার করব রে

গাধি বিহা ছৈড়কে বিচার করব রে/২
নেই মোটর গাড়ি নেই লেওর
বারাতি মুই
তোকে ভাইগ যাবোউ
নেইকে আধাবাতি
গরিয়ারে ...

(২)
গল তর চিকন চিকন
ওঁ ঠ গোলাপ রে
তর তো নেখউ হিয়া
কয়ি জবাব রে।

উড়নি গিরথে সমেরাও হায়রে
দেখিকে হুস উড়ি যায়/২
লজুক লজুক তর কমর লবদয়
পায়ের মে পায়েল তর হাত মে কংকন/২
উড়নি ---------------

হরণি তেরি চল তোর
দিও য়ানা বানই
রাপ দেখি মুই তোর
পিছু পিছু যায়/২
উড়নি ------------------

ডুরে কাটল চুল তর
সুন্দর চেহেরা
রোজ দিনা তর লগান পাহারা-২।
উড়নি -------------------

ওরাওঁদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ধার্মেশ (সৃষ্টিকর্তা)। তারা মনে করে সর্বশক্তিমানের অবস্থান সূর্যে। তাই তাদের অধিকাংশ ধর্মীয় উৎসব সূর্যকে কেন্দ্র

করে (মুরাদ, ২০১৫)। এছাড়া, তারা যৌথভাবে কারাম উৎসব পালন করে, যেখানে গাছকে পবিত্রতার প্রতীক ধরা হয় এবং মনে করা হয় এর মাধ্যমে প্রকৃতি ও দেবতার সাথে সংযোগ সম্ভব। তারা অনেকে নিজেদের সনাতন ধর্মালম্বী বলে পরিচয় দেন। তবে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর ন্যায় ওরাওঁরা গৃহে উপাসনালয় তৈরি করে না। তবে বসতি এলাকায় প্রার্থনার জন্য উপাসনালয় আছে। তারা নিজস্ব গোত্র প্রথাই বেশি অনুসরণ ও চর্চা করেন। ওরাওঁ পরিবারগুলোর মধ্যে দশটি গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়; যথা এক্কা (কচ্ছপ), মিনজ (এক প্রকার মাছ), তিগ্যা (এক প্রকার ছোটো বানর), টপ্য (লম্বা লেজ বিশিষ্ট ছোটো পাখি), তির্কি (ছোটো আকারের ইঁদুর), খালখো (এক প্রজাতির মাছ), কুজুর (এক প্রকার ফল), বাড়োয়া (সারস পাখি), আড্ডু (গরু)। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তন লক্ষণীয়। বিশেষ করে দরিদ্র ওরাওঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে। ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করলেও কিছু কিছু উৎসব তারা একত্রে পালন করে, যা তাদের যৌথ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব ও দারিদ্র্যের কারণে কিছু সংস্কৃতি-চর্চা বিলুপ্ত হয়েছে, আবার কিছু রূপান্তরিত হয়েছে।

এখানকার ওরাওঁদের সমাজ সংগঠন এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় ভাষা-সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষণীয়। তাদের বাড়িঘর স্থানীয় মুসলমান ও হিন্দুদের বাড়িঘরের রীতি বা স্থাপত্য থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। তারা উর্বর ভূমি ও জলাশয় থেকে একটু উঁচু জায়গায় ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। উদ্দেশ্য চাষাবাদের জন্য উর্বর ও জলাশয় ভূমি ব্যবহার করা। তাদের অধিকাংশ ঘরই মাটির ও বাঁশের। স্থানীয়ভাবে কাঁদামাটি দিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেয়াল নির্মাণ করে তার উপরে বাঁশ, কাঠ ও ছন দিয়ে ছাউনি এবং মাটির লেপন। এ ধরনের ঘর বেশি দেখা যায় অতি দরিদ্র পরিবারে। আর যাদের আর্থিক অবস্থা একটু ভালো তারা মাটির তৈরি ঘরের উপরের টিনের ছাউনি দেয়। প্রতিটি ঘরের উপরিভাগের অংশ বিভাজিত। উপরিভাগে কেউ থাকে না, ব্যবহৃত বাসন-কোসন, হাড়ি-পাতিল, লেপ-তোষক এবং নিত্যপণ্য সংরক্ষণ করে। বসতঘর সংলগ্ন ক্ষুদ্র পরিসরে মাটির দেয়াল নির্মাণ করে রান্নাঘর নির্মাণ করে। রান্নাঘরে ব্যবহৃত হয় মাটির চুলা। বসতবাড়ির উঠানে সচ্ছল ওরাওঁরা গোশালা স্থাপন করে। বর্তমানে সচ্ছলরা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। কিন্তু যারা নিঃস্ব তারা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে পারে না; তবে গৃহ থেকে দূরে খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ ও আর্বজনা ফেলে।

ওরাওঁদের সমাজ প্রক্রিয়া গোত্র ভিত্তিক। অর্থাৎ, একই ধরনের ভূমিতে বসবাসরত মানুষ মিলে গড়ে তোলে গোতার। এটাকে তাদের ভাষায় ভুঁইহার খালে বা ভূঁইহার খেত বলে। নিজেদের গোষ্ঠী বা ভূঁইহারকে পরিচালনার জন্য নিজেদের মধ্যে হতে মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজ কাঠামো গড়ে তোলে। পরিচালনাকারী সবাই একই গোত্রের। অন্য ভূঁইহারের কোনো প্রকার কর্তৃত্ব থাকে না। ভূঁইহার প্রথার মূল গ্রামকে

পাড়ুহা বলে। প্রত্যেক পাড়ুহায় স্থায়ী কমিটিকে পাঞ্চ বলে। এ ধরনের সমাজ কাঠামোর চর্চা এখন আর নেই বলেই চলে। তাদের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতোই ওরাওঁরা বৃদ্ধদের লালন-পালন করে থাকেন। পরিবারের ছেলে সন্তান ও তার স্ত্রী এ দায়িত্ব নিয়ে থাকে। সন্তান না থাকলে নিজ গোত্রের লোকেরা লালন-পালন ও যত্ন করে থাকে। অধিকাংশ পরিবারই আর্থিক সংকটের কারণে ঠিক মতো সেবা যত্ন করতে পারে না। মৃত্যুর পর অধিকাংশ ওরাওঁরা পুড়িয়ে ফেলার পরিবর্তে কবর দিয়ে থাকে। শ্রাদ্ধের দিন তারা গান-বাজনা ও মদ পান করে থাকে।

ওরাওঁদের মধ্যে গোত্র ভিত্তিক ট্যাবুপ্রথা (নিষিদ্ধ প্রথা) বিদ্যমান। গোত্রভেদে এ প্রথা ভিন্ন ভিন্ন। তারা মনে করে, গোত্র প্রথা না মানলে অমঙ্গল হয়; যেমন তির্কি গোত্রের ছোটো আকারের ইঁদুর খাওয়া, কুজুর গোত্রের খেজুর গাছের তৈল খাওয়া এবং সে গাছের ছায়ায় বসা, বেক গোত্রের আঙুলে চিমটি দিয়ে লবণ খাওয়া, টপ্য গোত্রর কাঠঠোকরা পাখির মাংস খাওয়া, তিগ্যা গোত্রের বানরের মাংস খাওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ। মুসলমান ও হিন্দুদের শক্তিশালী সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের কারণে তাদের চর্চিত প্রথাগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে।

ভাষাগত পুঁজি ও আর্থ-সামাজিক অবনমন

পাঁচবিবি উপজেলায় ওরাওঁদের আগমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর। তাদের অধিকাংশ এসেছিল ছোটো নাগপুর থেকে যা বর্তমান ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের শাহাবাদ জেলা। তারা বনজঙ্গল কেটে অনাবাদী জমিকে চাষাবাদ করে সচ্ছল জীবন-যাপন করে আসছিল। পাশাপাশি বসবাসরত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর উৎপাদন পদ্ধতিও ছিল কৃষি। কালের পরিক্রমায় মুসলিম জনগোষ্ঠী উন্নয়নের স্রোত ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করছে। কিন্তু ওরাওঁ জনগোষ্ঠী নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারেনি। বরঞ্চ আজ তারা ভূমিহীন ও নিঃস্ব। সংখ্যায় কম, আলাদা ভাষা ও সাংস্কৃতিক সত্তার কারণে তারা পৃথক থেকে গেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা যা হাট-বাজার, সামাজিক ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র স্বীকৃত ও প্রচলিত। অন্যদিকে তাদের কুঁড়ুখ ভাষা নিজেদের গোত্র, পরিবার ও পাড়ুহা ছাড়া অন্য স্থানে গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, কুঁড়ুখ ভাষা অপ্রচলিত যা সমাজের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য নয়। সেই কারণে ওরাওঁরা সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক কাঠামো বিন্যাসে যোগাযোগ, সম্পর্ক, বিনিময় ও অবস্থানে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী। অর্থাৎ এখানে ভাষাগত পুঁজির অভাব অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। এখন অধিকাংশ ওরাওঁরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করছে। কিন্তু বাংলা ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গি, স্বর, সাবলীলতা ও শারীরিক সাযুজ্যে তারা এখনো দক্ষ নয়। আবার তারা যতটুকু রপ্ত করেছে তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নাই। অর্থাৎ, তাদের ভাষা দক্ষতায় নেই সার্টিফিকেট, যা কর্মসংস্থানের অভিগমনের জন্য প্রয়োজন।

এখানকার ওরাওঁরা যুগ যুগ ধরে জমি পরিমাপের জন্য বাঁশের লগি ব্যবহার করতো। কিন্তু সরকারিভাবে জমির পরিমাপ করা হয় শতাংশ অনুসারে। আবার প্রচলন আছে বিঘা ও কাঠার হিসাব। কত শতাংশে বিঘা ও কাঠা তা অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন ওরাওঁদের কুঁড়ুখ ভাষায় বারো অর্থ দুই আর বাংলা ভাষায় বারো অর্থ সংখ্যা ১২। ভাষা শব্দের তারতম্য ও বোধগম্যতার কারণে তারা পণ্যের লেনদেন ও জমির পরিমাণে প্রায়ই প্রতারিত হয়েছে। অনেকের দখলে থাকা জমি বিঘার দাম দিয়ে প্রভাবশালীরা নিয়েছে একরের হিসেবে। যেখানে ৩৩ শতকে বিঘা আর ১০০ শতকে একর। বাংলা ভাষা রপ্ত না থাকার কারণে নিজের অধিকৃত সম্পত্তি যেমন ধরে রাখতে পারেনি, তেমনি রাষ্ট্র প্রদত্ত শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এখনো প্রবীণ ওরাওঁরা বাংলা ধ্বনি উচ্চারণে অভ্যস্ত নয়। পরবর্তী প্রজন্ম অনেকটাই রপ্ত করেছে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে। কিন্তু ভালো কর্মসংস্থানে প্রবেশে যে ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন; তা তাদের নেই। বিদ্যমান বাংলা ভাষা স্কুলগুলোতে শিক্ষা গ্রহণে ওরাওঁ ছেলে-মেয়েরা পিছিয়ে। এর অন্যতম কারণ গোত্রকেন্দ্রিক যে ভাষা-সংস্কৃতির তারা চর্চা করে, তার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-সংস্কৃতির বিন্যাস ভিন্ন। ফলে তাদের ছেলে-মেয়েরা সহজেই প্রতিষ্ঠানের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। অন্যদের তুলনায় তারা পিছিয়ে থাকে, পড়া-লেখায় আনন্দ পায় না। একটা পর্যায়ে তারা ঝরে পড়ে। কার্যত, তারা ভাষা দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারছে না।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও স্থানীয় মহাজনদের সাথে তাদের বর্তমান অবস্থা গড়ে উঠেছে প্রভু-ভৃত্যের ন্যায় (Islam, ২০২২)। দরিদ্র ওরাওঁরা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য বিত্তশালী মুসলমান ও মহাজনদের কাছ থেকে অর্থ ধার করে। সেই ধার পরিশোধ করার পূর্বে আবার তাদের অর্থের প্রয়োজন হয়। বাধ্য হয়ে তারা সস্তায় অগ্রিম শ্রম বিক্রি করে। এর বাইরে রয়েছে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ, যা তাদেরকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। দরিদ্র ওরাওঁরা আজ ঋণের এক দুষ্ট চক্রে বন্দি। প্রয়োজনীয় বন্ধকের (mortgage) অভাবে তারা প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন না। এই ক্ষেত্রে সরকারের নেই কোনো নীতি ও ব্যবস্থা। মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি ওরাওঁদের ভূমিহীন এবং কৃষি শ্রমিকে পরিণত করেছে (Islam, ২০২২)। যাহোক, চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও তারা গৃহ-অর্থনৈতিক বিনিময় প্রথা বিদ্যমান রেখেছে, একজনের বিপদে আরেকজন এগিয়ে আসে। শিক্ষা ও তথ্যে অভিগমনের অভাবে তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজ বিপন্ন।

উপসংহার

পাঁচবিবির উচাই মৌজার ওরাওঁ পরিবারগুলো আজ চরম দারিদ্রের শিকার। তাদের এই দারিদ্র্যের পিছনে প্রধানত দুটি বিষয় দায়ী: (ক) তাদের ভাষা দক্ষতার অভাব অর্থাৎ ভাষাগত পুঁজির সংকট এবং (খ) সরকারি নীতি ও ব্যবস্থাপনার অভাব। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পেরিয়ে গেলেও এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাগত পুঁজি বৃদ্ধির জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। দারিদ্রের কারণে তাদের ছেলে-মেয়েরা যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে না। আবার যে সকল ছেলে-মেয়ে প্রতিষ্ঠানে যায়, তাদের অনেকে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। কেন তারা ঝরে পরে তার কারণ অনুসন্ধানে নেই কোনো গবেষণা ও পদক্ষেপ। এছাড়া, প্রভাবশালী বাংলা ভাষা তারা যতটুকু রপ্ত করে, সেইটুকুর জন্য নেই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। ফলে তারা বাজারে অভিগমনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভাষাগত পুঁজির অভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠী দ্বারা তারা শোষিত ও প্রতারিত হচ্ছে। নাগরিক হিসেবে ন্যূনতম সরকারি-বেসরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। একই সমতলে বসবাসরত অন্য জনগোষ্ঠী উন্নয়নের স্রোত ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারলেও, এই পরিবারগুলো উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে যোজন যোজন দূর।

ওরাওঁদের ভাষাগত পুঁজি ও জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজন: (১) দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কুঁড়ুখ ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চার ব্যবস্থা করা। কারণ কুঁড়ুখ ভাষার চর্চার ব্যতীত তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা সম্ভব না। (২) প্রাপ্ত বয়স্ক ওরাওঁরা যতটুকু বাংলা ভাষা রপ্ত করেছে তার স্বীকৃতি প্রদান, যাতে তারা সহজে কর্মসংস্থানে অভিগমন করতে পারে। সেই সাথে বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের বাংলা ভাষা লিখতে ও পড়তে সহায়তা করা। (৩) ওরাওঁ গ্রামগুলোতে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও পঠন-পাঠনে ওরাওঁ সংস্কৃতিক ও মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে করে ওরাওঁ ছেলে-মেয়েরা সহজে খাপ খাওয়াতে পারে। (৪) তথ্যের ঘাটতির অভাবে তারা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না। সেই জন্য ওরাওঁদের বসবাসরত গ্রামগুলোতে তথ্যের সহজ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা। মূলত, সরকারি নীতি-সহায়তা ও পদক্ষেপ ব্যতীত হাজার বছরের গড়ে উঠা ওরাওঁ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেমন সংরক্ষণ সম্ভব নয়, তেমনি উন্নয়নের স্রোতধারায় তাদের সম্পৃক্ত করাও সম্ভব নয়।

তথ্য-নির্দেশ

আলী, মেহরাব। (২০০২)। *দিনাজপুরের আদিবাসী*। মেহেরাব আলী: দিনাজপুর।

আহমেদ, মনসুর। (২০১১)। জয়পুরহাটের পাঁচবিবি ওরাওঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি। *আমার উত্তরাধিকার* (সাময়িকী), পঞ্চম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

কিশপট্টা, লুকাশ। (২০০৯)। ওরাওঁদের গোত্রপ্রথা। *আদিবাসী জনপদের কথা*, দিনাজপুর, ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (এপ্রিল-জুন)।

জাকারিয়া, হাবিব (২০২২)। *ওরাওঁ নৃগোষ্ঠী নাট্য: কারাম*। দ্যু প্রকাশন: ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। (২০২২)। জনশুমারি ও গৃহগণনা। *ন্যাশনাল রিপোর্ট* (ভলিয়ম ১), ঢাকা: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়: ঢাকা। https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/

মুরাদ, নাজমুল আহসান। (২০১৫)। বরেন্দ্র অঞ্চলের ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান। না. হক (সম্পা.), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আচার অনুষ্ঠান*, সেমিনার ভলিউম ১৩, (৫৭-৮৭)। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson, (Ed.) *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education.* Westport, CT: Greenwood, (241-58).

Islam, R. (2022). Economy and Identity: The Oranons' perspective in Northwest Bangladesh. *Social Science Review (The Dhaka University Studies, Part-D*, special issue*)*, vol.39, no.2, (39 – 57).

Morrison, K. & Lui, I. (2000). Ideology, Linguistic Capital and the Medium of Instruction in Hong Kong. *Journal of Multilingual and Multicultural Development,* vol. 21, no.6, (471-486).

Tirkey, B. J. (2015). Cultural Dimension of Ethnic Identity: A Study on the Oraon Tribe of North Bengal. *Journal of the Department of Sociology of North Bengal University*, vol. 2 no. 1, (103 -110).

Yosso, T. (2005). Whose Culture has Capital? A Critical Race Theory Discussion of Community Cultural Wealth. *Race, Ethnicity and Education,* vol. 8 no.1 (69 – 91).

UNESCO (2024). Multilingual education, the best to preserve indigenous languages and justice. https://www.unesco.org/en/articles/multilingual-education-bet-preserve-indigenous-languages-and-jus

বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার প্রাসঙ্গিকতা ও সীমাবদ্ধতা

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান*, **জেনিফার জাহান****

Abstract: Anthropological linguistics is the discipline that deals with language and culture. As a field of study, anthropolinguistics is a relatively recent discipline, and its practice in Bangladesh is even more recent. In Bangladesh, there is a need to examine this subject from both theoretical and practical perspectives, as the nature of a community can be explored through its language and culture. However, notable books or articles have not been written on the requirements and limitations of this discipline from a linguistic standpoint. This article seeks to address this gap.The textual research was conducted using a descriptive method, relying on secondary data sources, which were analyzed using information from various books, articles, and magazines. Through this discussion, it is concluded that while anthropological linguistic research in Bangladesh holds significance, certain research limitations have occasionally slowed its progress.

মূল শব্দ (Key Words): ভাষাবিজ্ঞান (linguistics), নৃভাষাবিজ্ঞান (Anthropolinguistics), সমকালীন নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চা (Contemporary anthropological practice), প্রাসঙ্গিকতা (relevance), সীমাবদ্ধতা (limitation)

ভূমিকা

নৃভাষাবিজ্ঞান বা Anthropological Linguistics ভাষাবিজ্ঞানের একটি প্রায়োগিক শাখা যেখানে ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। হাইমস নৃভাষাবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করে বলেছেন যে, এটি একটি জ্ঞানশাখা যা নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে

* Dr. Muhammad Ashaduzzaman, Professor, Department of Linguistics, University of Dhaka, Corresponded Author: email: ashad01zaman@gmail.com

** Jennifer Jahan, Associate Professor, Department of Linguistics, University of Dhaka

ভাষা ও কথন নিয়ে আলোচনা করে (১৯৬৪)। তিনি আরও বলেন যে, নৃভাষাবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করে বলেছেন যে, নৃভাষাবিজ্ঞান এমন একটি জ্ঞান শাখা যা দৈনন্দিন জীবনে ভাষা কীভাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ভাষা কীভাবে একীভূত হয়, তা অধ্যয়ন করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, নৃভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বা পরিধি হলো- ভাষা, সংস্কৃতি এবং মানবজীবনের অন্যান্য দিক অধ্যয়ন। তবে দুরান্তি (২০০৬) উল্লেখ করেছেন যে, নৃভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। আদি অধিবাসীদের ভাষাগুলোর ব্যাকরণ ডকুমেন্টেশন থেকে আদি যাত্রা শুরু করে বর্তমানে প্রতিদিনের কথোপকথন বিশ্লেষণ পর্যন্ত এ দীর্ঘ যাত্রা অনেকটাই বৈচিত্র্যময়। সিবারানি (২০১৮)-এর মতে নৃভাষাবিজ্ঞান ভাষার আলোচনা করে নৃবৈজ্ঞানিক কাঠামো অনুসরণ করে, ভাষাবৈজ্ঞানিক কাঠামোর আলোকে সংস্কৃতি অধ্যয়ন করে এবং মানবজীবনের অন্যান্য আনুষঙ্গিক দিকগুলো আলোচনা করে নৃবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের সম্মিলিত ধারণাগুলোকে আশ্রয় করে।

বর্তমান প্রবন্ধে সুসংগঠিতভাবে বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারা ও পরিস্থিতি উপস্থাপন করে এর সাথে সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিকক্ষেত্রগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নৃভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা, সমাজ, জাতি ও সংস্কৃতিবিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করে এক্ষেত্রে উদ্ভূত সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি

নৃবিজ্ঞান এবং ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস এবং ভিন্ন ধারা রয়েছে। নৃবিজ্ঞান মূলত সামাজিক দর্শন (social philosophy)-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, অন্যদিকে, ভাষাবিজ্ঞান প্রাথমিকভাবে ইউরোপিয়ান ভাষাগুলো বিশ্লেষণ দিয়ে শুরু করেছে এর পদযাত্রা। তবে লক্ষ করে দেখা গেছে, ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হলেও এ দুটি জ্ঞানশাখা আলোচনাক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় প্রতিচ্ছেদ (intersect) করেছে যেমন, উনিশ শতকের পল ব্রোকা (Paul Broca) আলোচিত নৃবিজ্ঞান। এছাড়াও বড়ো আকারে এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রতিচ্ছেদ শুরু হয় বিশ শতকের শুরুর দিকে, যা মূলত আমেরিকান আদিবাসী (American Indigenous) ভাষাগুলোর চর্চাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।

প্রাথমিক পর্যায়ে নৃভাষাবিজ্ঞানীরা তিনটি ধারায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। প্রথমত, আমেরিকান ধারা যা কোনো একক ভাষার বর্ণনামূলক ও ভাষাবৈজ্ঞানিক সংগঠন বিশ্লেষণ করে। এ ধারার পথিকৃৎ হলেন- ফ্রানজ বোয়াস (১৯১১), লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড (১৯১৪), এডওয়ার্ড স্যাপির (১৯২১), ডেল হাইমস (১৯৬৪), মরিস সোয়াদেশসহ (২০১৭) প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক। দ্বিতীয় ধারায় পূর্বোক্ত পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের আলোকে আমেরিকান ইন্ডিয়ান ভাষাগুলোকে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়। এ পর্যায়ে জন ওয়েসলি পাওয়েল (১৮৯১) সর্বপ্রথম ভাষা শ্রেণিবিন্যাস উপস্থাপন করেন

এবং পরবর্তীকালে আদিবাসী ভাষা এবং তাদের সংস্কৃতি অধ্যয়নের মাধ্যমে পাওয়েল ও ক্লদ লেভিস্ত্রাউস এ ধারার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন (লেভিস্ত্রাউস, ১৯৬৪)। তৃতীয় পর্যায়ে পূর্বোক্ত ধারা দুটির তুলনায় নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চা পদ্ধতিগতভাবে অনেক বেশি সংগঠিত ছিল। এখানে ভাষাচর্চা ছিল সম্পূর্ণরূপে সাংগঠনিক; ভাষাকে এর গাঠনিক উপাদানে ভেঙে বিশ্লেষণ করা হতো এবং ভাষার উদ্ভাবন ইউনিট তৈরি হতো, যার ফলে পরবর্তীকালে ভাষাটির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণও করা সহজ হতো। বোয়াস এবং স্যাপির যে জ্ঞানচর্চা শুরু করেছিলেন পরবর্তীকালে তা সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হয় এবং ১৯১৪ সালে এডওয়ার্ড স্যাপির রচিত 'An Introduction to the Study of Language' গ্রন্থটিতে তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। এরই ধারাবাহিকতায় এডওয়ার্ড স্যাপির এবং তাঁর ছাত্র বেঞ্জামিন লি হোর্ফ তাঁদের বিখ্যাত স্যাপির-ওয়ার্ফ হাইপোথিসিস প্রদান করেন, যা নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চা

গবেষণার ধারা: নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসকে প্রাথমিকভাবে নৃবিজ্ঞান (Anthropology) চর্চার অন্তর্ভুক্ত করেই আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের নৃবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসকে গবেষকবৃন্দ প্রাক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ পরবর্তীযুগ, গঠনযুগ, আধুনিক যুগ ইত্যাদি বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন (রশিদ এবং শাফি, ২০১৭)। প্রাক সাম্রাজ্যবাদ যুগে প্রাপ্ত আলোচনাগুলো সম্পর্কে মূলত পরিব্রাজক এবং মিশনারিদের কাছ থেকে জানা যায় (রহিম, ১৯৬৩)। এ সময় সাম্রাজ্য বিস্তার এবং ধর্মীয় কারণে জনজীবন, বসতি, ধর্ম, ব্যাবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হতো। তবে মনে করা হয়, ধর্মীয় কারণেই এসময় সংস্কৃত, পালি এবং পরবর্তী সময় বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করা হয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সময় ভাষা বিষয়ক গবেষণা ব্রিটিশ শাসক এবং মিশনারিরা সম্পন্ন করেছেন। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, জাতি, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক গোষ্ঠীর বসবাস পদ্ধতিই ছিল এ সময় মূল গবেষণার বিষয় যা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের জন্য প্রয়োজন ছিল। এ সময়কালে ভাষাবিষয়ক গবেষণার ফলস্বরূপ বাংলাসহ অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার কিছু ব্যাকরণগ্রন্থ ও অভিধান পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদ পরবর্তী সময়ে (১৯৪৭ পরবর্তী) বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার বেশ অগ্রগতি সম্পন্ন হয়। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি প্রাপ্তির ফলে বাংলাদেশে ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। ইউনেস্কোর (UNESCO) পক্ষ থেকে ১৯৫৭ সালে বিখ্যাত ফরাসি সমাজনৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভিস্ত্রাউসকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাঠ-গবেষণা করতে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি আরও কিছু বিদেশি নৃবিজ্ঞানীদের সাথে নিয়ে নৃ-জাতিসত্তা, গ্রামীণ জীবন, শ্রমজীবী

মানুষদের নিয়ে মাঠ গবেষণা সম্পন্ন করেন (করিম, ১৯৭৪)। পরবর্তীকালে ডেভিড সোফার নামে (১৯৬৩ এবং ১৯৬৪) একজন বিখ্যাত দক্ষিণ এশীয় সাংস্কৃতিক-ভূগোলবিদ চট্টগ্রাম পাবর্ত্য এলাকার নৃতাত্ত্বিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেন। সোফার তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন যা পরবর্তী সময়ে *American Geography and the Geographical Review* (১৯৮১) জার্নালে প্রকাশিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়েই মূলত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে সুসংগঠিতভাবে নৃবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়: বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে। বিভাগটির প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকদের মাঝে নৃবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং পরিসংখ্যানবিদ ছিলেন; তাঁদের মধ্যে ব্রিটিশ পরিসংখ্যানবিদ ডব্লিউ. ফ্লিক (১৯৫৭- ১৯৭০) এবং খ্যাতিমান গ্রামীণ সমাজবজ্ঞানী এ. কে. নাজমুল করিম (১৯৫৭- ১৯৮০)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৬ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো নৃবিজ্ঞান পৃথক বিভাগ হিসেবে চালু হয়, যা পরবর্তীতে অর্থনীতিবিদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারডু বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধ্যাপক নুরুল আলম গৌরবের সঙ্গে এগিয়ে নেন। ১৯৯২ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রথিতযশা নৃবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে চট্টগ্রাম, শাহজালাল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগ যাত্রা শুরু করে।

উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম : এক্ষেত্রে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার উল্লেখ করা যেতে পারে- সামাজিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগে অধ্যাপক এ. এফ. সালাহউদ্দিন আহমেদ-এর (১৯৬০) *Social Ideas and Social Change in Bengal: 1818–1835* প্রবন্ধটি ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি তুলে ধরে। একইভাবে, অধ্যাপক এম. এ. রহিমের *The Muslim Society and Politics in Bengal* গ্রন্থে (১৯৭৮) গ্রামীণ সমাজ কাঠামো ও শ্রেণি রাজনীতির বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক নুরুল আলম এবং অধ্যাপক রাশিদা আক্তারের *Problem of Ethnic Identity and National Integration: A Case Study from Chittagong Hill Tracts of Bangladesh* (১৯৯২) একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীর গ্রন্থ *Ethnic Identity and Social Mobilization in Bangladesh* (১৯৯৬) উল্লেখযোগ্য; তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা প্রভৃতি আদিবাসীদের উপর দীর্ঘমেয়াদি মাঠ-গবেষণার ধারা প্রবর্তন করেন এবং জাতিগত পরিচয় ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানকে সংযুক্ত করেন এছাড়াও অধ্যপাক জোবেদা নাসরীন এবং অধ্যাপক

রাশিদা আক্তারের *The Representation of Chittagong Hill Tracts: An Overview (২০০২)* প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। উপরিউক্ত আলোচনাগুলো মূলত বিশুদ্ধ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারা অনুসরণ করেছে।

পরবর্তীকালের গবেষণাগুলোতে নৃভাষাবৈজ্ঞানিক চর্চার স্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এ পর্যায়ে গবেষণাগুলোর মধ্যে মিখাইল নেস্তুর্খ রচিত *Races of Mankind* গ্রন্থটি দ্বিজেন শর্মা (২০০০) অনুবাদ করেন; যেখানে মানবজাতির সংজ্ঞার্থ, জাতিসমূহ উদ্ভব, জাতি ও জাতিবৈষম্যবাদ প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজসংস্কৃতি ও আচারব্য*বহার বিষয়ক গ্রন্থ (২০০০) রচনা করেন সুগত চাকমা, সঞ্জীব দ্রং ২০০১ সালে রচনা করেন *বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী* নামে একটি গ্রন্থ। মংবাঅং (মংবা) রচিত *বাংলাদেশের রাখাইন সম্প্রদ্রায় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা* শীর্ষক গ্রন্থটি ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়, যেখানে রাখাইন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। একে এম শাহনেওয়াজ (২০০৪) *বাংলার সংস্কৃতি বাংলার সভ্যতা* নামক গ্রন্থটি রচনা করেন; প্রাচীন ও মধ্যযুগব্যাপী যে বাঙালি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এবং যেভাবে বাংলা সভ্যতার বিস্তার ঘটেছে, তা এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান সিলেটের বিপন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা পাত্র সম্প্রদায়কে নিয়ে গবেষণা করেন এবং *সিলেটের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা পাত্র: ভাষা সংস্কৃতি* (২০০৬) শীর্ষক বাংলা এবং ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যেখানে পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতিসহ জীবনযাত্রার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরেছেন। ফিলিপ গাইন ও পার্থ শঙ্করের সম্পাদনায় (২০০৭) প্রকাশিত হয় *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি* গ্রন্থটি, যেখানে আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মোট দশটি প্রবন্ধ রয়েছে এবং প্রায় এক দশক সময় ধরে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা, তথ্য-উপাত্ত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে রচিত হয়েছে এ বইটিতে। অধ্যাপক সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ দীর্ঘদিন বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন; *খাসিয়াদের অবস্থান-নির্দেশ ও খাসি ভাষা-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ* (২০০৯) প্রবন্ধটি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য; আদিবাসীদের সংখ্যা, খাসিয়া সংস্কৃতি, খাসি ভাষা, খাসি ভাষার ব্যাকরণ প্রভৃতি গুরুতপূর্ণ বিষয় প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। তাঁর রচিত *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা (২০১১)* গ্রন্থটিতে চাকমা, কুরুখ, সাঁওতাল, খাসিয়াসহ বেশ কিছু জাতিসত্তার ভাষিক পরিস্থিতি, সংস্কৃতি, জীবনাচরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশে এ বিষয়ে আরও যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হেলালউদ্দিন খান আরেফিন অন্যতম; তিনি প্রথমে কানাডার মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান বিষয়ে লেখাপড়া করেন। আদিবাসী ও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার, বঞ্চিত মানুষের জীবিকা ও শিক্ষা-সুরক্ষা নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করেন।

নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার আধুনিক যুগ বা বর্তমান সময়ে আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে 'নৃজাতিভাষাবিজ্ঞান' (ethnolinguistics), যেখানে বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ, সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক গতিশীলতা এবং এর সাথে জড়িত সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে নৃভাষাবিজ্ঞানীর আন্তঃশৃঙ্খলা পদ্ধতি (interdisciplinary method) অনুসরণ করেন। এর সাথে ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের ধ্যান-ধারণা সম্পৃক্ত থাকে। এ ধারার আলোচনায় ভাষা কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং কীভাবে ভাষা সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও বিশ্বায়ন, অভিবাসন এবং প্রাযুক্তিক যোগাযোগের ফলে ভাষা কীভাবে পরিবর্তিত, প্রতিসরিত হয় তা বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চায় গুরুত্ব পেয়েছে এবং একইসাথে ভাষা সংরক্ষণের প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি একটি গুণগত (qualitative) ও ব্যাখ্যামূলক (interpretive) গবেষণা, যা অনুসরণ করে বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব, পটভূমি, সম্ভাব্যতা, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং সংপ্রশ্নগুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন প্রকাশিত ও প্রামাণ্য দ্বৈতীয়িক তথ্য (secondary data), যা নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার ঐতিহাসিক ও প্রতিষ্ঠানগত প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে সহায়ক হবে। বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার সাথে সম্পর্কিত প্রকাশিত বই, গবেষণা প্রবন্ধ, কেইসস্টাডি এবং বিভিন্ন অনলাইন উৎস থেকে সংগৃহিত তথ্য-উপাত্তগুলো বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ (thematic analysis) পদ্ধতি অনুসরণ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা বর্তমানে বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করবে।

ভাষা ও সংস্কৃতি একটি পরস্পরনির্ভর কাঠামো হিসেবে কাজ করে, তাই নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চার সীমাবদ্ধতা অধ্যয়নের জন্য সমাজ-সংস্কৃতি, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, সাংস্কৃতিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষানীতি নির্ধারণের সাথে ভাষার সম্পর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণার স্বরূপ ব্যাখ্যামূলক তাই দ্বৈতীয়িক উৎসগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং তা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো থেকে বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চার সম্ভাব্যতা ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আরও সূক্ষ্ম ধারণা পাওয়া যাবে।

এছাড়াও গবেষণার সাথে জড়িত নৈতিকতা ও বিশুদ্ধতা এটাও নিশ্চিত করবে যে, গবেষণাটিতে সাম্প্রতিক তথ্য, উদ্ধৃতি ব্যবহার করে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রবন্ধের শেষ অংশে সঠিকভাবে তথ্যপঞ্জি উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণা ফলাফলগুলো বিস্তারিতভাবে এবং সুসংগঠিত উপায়ে উপস্থাপন করে বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই গবেষণাটি মূলত গবেষণালবদ্ধ ও

প্রকাশিত দ্বৈতীয়িক তথ্যকেন্দ্রিক, ফলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ গবেষণার এ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার গতি-প্রকৃতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা। নৃভাষাবৈজ্ঞানিক অন্বেষণের গুরুত্ব ও এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। একইসাথে নৃভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, ঐতিহাসিক পরিবর্তন এবং নৃভাষাবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান শাখা হিসেবে এর যথার্থতা ও প্রাসঙ্গিকতা উপস্থাপন করা হবে এ প্রবন্ধে। বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষায় নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনার পাশাপাশি এ প্রবন্ধে বাংলাদেশে সমকালীন নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক প্রতিবন্ধকতাগুলোও সূক্ষ্মভাবে পর্যলোচনা করা হবে। ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষায় এ ধরনের বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়নি, ফলে এ ধরনের গবেষণার যৌক্তিকতা সহজেই প্রতিভাত হয়।

বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের ভাষা, সাংস্কৃতিক চর্চা, সামাজিক বৈচিত্র্য, শিক্ষার বিকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে; নিচে বিস্তারিতভাবে বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো-

ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত দিক থেকে বাংলাদেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ যেখানে বাংলা ভাষা ও জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিক ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষাও বিদ্যমান (ব্লেঞ্চ, ২০০৭)। এই বহুভাষিকতা (multilingualism) এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা কর্তৃক ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশীয় ঐতিহ্য (heritage) রক্ষা করা সম্ভব, অন্যদিকে চাকমা, মারমা, সাঁওতালি, গারো, ম্রো, বম ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যবর্তী সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এদের বৈশিষ্ট্যান্বিতও করা যায়। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, বাংলাদেশে অবস্থানরত বেশ কিছু ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর ভাষা বিপন্নতার সম্মুখীন এবং তাদের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, ভাষাগুলি নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি; যেমন– প্রতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাব, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভাষিক দক্ষতার হ্রাস ইত্যাদি; নৃভাষাবৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে এসব বিপন্ন ভাষাগুলোকে চিহ্নিত করে ভাষা নথিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে ভাষা বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

এছাড়াও ভাষা এবং সংস্কৃতির সম্পর্ক অধ্যয়ন নৃভাষাবিজ্ঞানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাক্ষেত্র; গবেষকরা বিশ্লেষণ করেছেন কীভাবে ভাষা বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীর

মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠন করে, এ বিষয়ক গবেষণা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় ভাষার ভূমিকা প্রকাশ করে (হাইমস, ১৯৬৪; ফলি, ২০১৮)। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ছিল, যা ভাষা-সংস্কৃতি এবং জাতিগত পরিচয়ের মধ্যবর্তী গভীর সম্পর্কের একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম ভাষাগত পরিচয়ের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও সংহতি

আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে নৃভাষাবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিতে পারে। একটি দেশে বসবাসরত ভিন্ন ভিন্ন ভাষিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃসম্প্রীতি বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে বহুভাষিক এবং সাংস্কৃতিক একটি দেশে বসবাসরত ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীগুলোতে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে, ভাব বিনিময় এবং সম্পর্ক তৈরি হয় তা বিশ্লেষণ করতে পারলে সামাজিক বন্ধন এবং সমষ্টিগত পরিচয় শক্তিশালী করা সহজ হয় (স্মিথ, ২০১৫; জনসন, ২০১৮)। এছাড়াও সাংস্কৃতিক বা ভাষিক গোষ্ঠীর মধ্যে যেকোনো সংঘাত বা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে, এসব অনাহুত সমস্যাগুলো সমাধান করে বিভিন্ন ভাষাগত ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যাতে করে তাদের মাঝে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার আনা সম্ভব হয়; এক্ষেত্রে নৃভাষাবৈজ্ঞানিক ধারণা ও কর্মপদ্ধতির সাহায্য নিয়ে ঐতিহ্যগতভাবে সংলাপ, মধ্যস্থতা এবং সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধান করা যেতে পারে (পাটেল, ২০১৭; আহমেদ, ২০২০)।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এক্ষেত্রেও একটি আদর্শ উদাহরণ হতে পারে, যা দেখায় ভাষা কীভাবে সাংস্কৃতিক এবং জাতিগত পরিচয়ের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত হয়। পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে পরিচালিত করে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা ভাষাগত পরিচয়ের (language identity)-র মাধ্যমে রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

ভাষা ও শিক্ষা পরিকল্পনা

একটি দেশে বহুভাষিক পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলে সেখানে শিক্ষা, সরকারি ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত ভাষা পরিকল্পনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়; যেমনটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখা প্রয়োজন যে, অর্থনৈতিক অভিবাসন, নগরায়ণ এবং জাতীয় নীতিতে বাংলা ভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য জনগোষ্ঠী অথবা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর ভাষা পিছিয়ে পড়তে পারে অথবা প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এর উত্তরাধিকার স্থানান্তর করতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে (আহমেদ, ২০২০)। নৃভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি

অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা কারিকুলাম বিকাশ এবং একটি দেশের সার্বিক ভাষিক বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষম শিক্ষা পরিকল্পনা করা সম্ভব।

এছাড়াও ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশে বসবাসরত যেসকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় লিপি আছে তাদের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং যে ভাষাগুলোর লিপি নেই তাদের ক্ষেত্রে লিপি প্রণয়নের যথার্থতা, প্রয়োজনীয়তা, সম্ভাব্যতা যাচাই করে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই নৃভাষাবিজ্ঞানের প্রচলিত জ্ঞান ও বিশ্লেষণের আশ্রয় নেয়া প্রয়োজন; বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (unique) ভাষাবৈজ্ঞানিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সংগৃহীত জ্ঞান বৈশ্বিক শিক্ষাক্ষেত্র উন্নয়নে পথনির্দেশনাও দিতে পারে এবং অন্যদেশের বহু সাংস্কৃতিক ও বহুভাষিক পরিস্থিতির সাথে প্রয়োজনে তুলনামূলক আলোচনাও উপস্থাপন করা যেতে পারে।

নৃভাষাবিজ্ঞান ভাষা ও শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি সুপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত বৃহৎ তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করতে পারে যা ভাষাবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞান উভয় জ্ঞান শাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করতে পারবে।

স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা

বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য ও নৃভাষাবিজ্ঞানের সংযোগ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এদেশে ভাষাগত বৈচিত্র্য ও আঞ্চলিক স্বাস্থ্যবৈষম্য বিদ্যমান। কার্যকর স্বাস্থ্য যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হলে বিভিন্ন ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কীভাবে রোগ, লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলে, তা বোঝা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আঞ্চলিক ও আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর স্থানীয় ভাষা ও চিকিৎসাবিদ্যার পরিভাষার বৈষম্য রোগের উপলব্ধি ও প্রতিবেদনকে প্রভাবিত করে এবং অনেকক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ের গতি মন্থরও করতে পারে; যেমন– সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত সিলেটি উপভাষা প্রমিত বাংলার থেকে যথেষ্ট ভিন্ন, যা স্বাস্থ্য যোগাযোগে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি এবং রোগ পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে (রহমান, ২০২০)। জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনায় নৃভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করলে এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবধান দূর করা সম্ভব এবং একইসাথে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রচারণা, চিকিৎসা নির্দেশনা ও মহামারী সংক্রান্ত জরিপকে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগতভাবে প্রাসঙ্গিকও করে তোলা সম্ভব (চৌধুরী ও হক, ২০১৮)। এছাড়াও, স্থানীয় ভাষায় নিহিত ঐতিহ্যবাহী লোকজ চিকিৎসা সম্পর্কিত পরিভাষা ও নিরাময় পদ্ধতিগুলি বোঝার মাধ্যমে আধুনিক চিকিৎসার সাথে উপকারী জ্ঞানচর্চার সমন্বয়ও ঘটানো সম্ভব। এটি বিশেষত বাংলাদেশের মতো দেশে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে অনেক মানুষ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি ইউনানি, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ওপর নির্ভর করে থাকে (ইসলাম ও অন্যান্য, ২০১৭)।

জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য বাংলাদেশকে বহুভাষিক স্বাস্থ্য যোগাযোগ কৌশল অবলম্বন করতে হবে, স্বাস্থ্যকর্মীদের সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল সেবা

প্রদানের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে ভাষাগত বৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নৃভাষাবৈজ্ঞানিক ও মহামারীবিদ্যা (epidemiology) সমন্বয়ের মাধ্যমে নীতিনির্ধারকরা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমাজকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন, যা দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যসমতার উন্নতি করতে সহায়ক হবে।

লক্ষণীয়, কোনো জনগোষ্ঠীর ভাষিক ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি জানা থাকলে তাদেরকে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন এবং এ সংযোগ পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন হতে পারে। নৃভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও গবেষণালব্ধ ধারণাগুলো ভাষিক ও সামাজিক জনগোষ্ঠীর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ধারাবাহিকতায় সুবিধা বঞ্চিত বা পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বা অন্যকোনো জনগোষ্ঠীর কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা প্রদান করা সম্ভব।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ

ভাষা ব্যক্তি ও তার সমাজের মধ্যে একটি গভীর সংযোগ তৈরি করে। একটি জাতি এমনকি একজন ব্যক্তির পরিচয় গঠনে ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ভূমিকা অপরিসীম। এটি ব্যক্তি পর্যায়ে শুরু হলেও ক্রমশ পারিবারিক ও সামাজিক পরিসর থেকে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরেও বিস্তৃত হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সংযোগ বিশেষভাবে দৃঢ়, যেখানে ভাষা কেবল যোগাযোগের উপায় নয়, বরং একটি প্রতিরোধের প্রতীক ও সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আবারও তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ, যেখানে জনগণ মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার মাধ্যমে নিজেদের জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছে, যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা যুদ্ধকেও অনুপ্রাণিত করেছে (হুমায়ুন, ১৯৯৫)। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষা এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সহাবস্থান জাতিগত পরিচয় তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও ভাষিক বৈচিত্র্যের রূপও তুলে ধরে, যা নৃভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাক্ষেত্র (উইলস, ২০১৭)।

একইভাবে লোকসাহিত্য, লোকগান (যেমন: বাউল, ভাটিয়ালি), প্রবাদ-প্রবচন, লোককাহিনি এবং মৌখিক ইতিহাস মানুষের সাংস্কৃতিক বোধ এবং চেতনা গঠনে সহায়ক হয়। এইসব উপাদান ব্যক্তি পরিচয়ের ভিত শক্ত করে, যা একটি বৃহৎ সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে (কবির, ২০১৩)। একইসঙ্গে, বিশ্বায়নের এই যুগে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে মাতৃভাষা, সংস্কৃতিচর্চা ও নিজস্ব ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়াস

নতুনভাবে জাতিগত পরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ করছে; এই প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল মিডিয়া, আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে (গার্ডনার, ১৯৯৫)।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় ভাষা ও পরিচয় নিয়ে গবেষণা, নীতিনির্ধারণ, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম এ বিষয়ে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারে। এতে জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুমাত্রিক পরিচয়ের উদযাপনও সম্ভব হয়ে ওঠে। সুতরাং, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক উপাদানগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই জাতিগত কাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি এইসব জটিল প্রক্রিয়া ও পারিপার্শ্বিকতাকে অনুধাবন করতে হলে সমাজভাষাবিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন আন্তঃবিষয়ক গবেষণা অপরিহার্য।

বাংলাদেশে নৃভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিবন্ধকতা

তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সংস্কৃতি তথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবন এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক অধ্যয়নের নিমিত্তে কিছু পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে, যা মানুষ এবং তাদের জীবনধারা বিশ্লেষণের জন্য একটি সাধারণীকরণ তৈরি করে। নৃবিজ্ঞান তেমনই একটি শৃঙ্খলা, যার বিষয়বস্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতোই অনেক পুরোনো; তবে এর আনুষ্ঠানিক আবির্ভাব বিভিন্ন কারণে বিলম্বিত হয়েছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলির উপর নিবিড় ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণায় জন্য মাত্র দুই শতাব্দী আগে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত একটি উদীয়মান শৃঙ্খলা হিসাবে নিজেদেরকে নৃবিজ্ঞান চর্চার অভিমুখী করেছিলেন। বাংলাদেশেও এ জ্ঞানশাখার উত্থান এবং বিকাশের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যদিও কিছু প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বিলম্বিত হয়েছিল। ১৯৫০-এর দশকে দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) অঞ্চলে বেশ কিছু বিদেশি গবেষক কিছু মূল্যবান গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে, আদিবাসী অধ্যয়ন সেই সময়ে স্থানীয় গবেষকদের ততটা আকৃষ্ট করতে না পারলেও দুই দশক আগে থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অনেক শিক্ষাবিদ ও গবেষক আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছেন। গ্রাম অধ্যয়নের রেডফিল্ডের 'মেক্সিকান মডেল' (১৯৩০) বাংলাদেশে একটি কাঙ্ক্ষিত নৃতাত্ত্বিক কৌশল ছিল এবং এর অংশ হিসাবে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপর কয়েকটি মূল্যবান গ্রামভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণা বাংলাদেশে সম্পন্ন করা হয়েছে। গ্রামীণ গবেষণার এই ধারা এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে; প্রতিবছর গ্রামীণ মানুষের বিভিন্ন দিক নিয়ে কয়েকটি গ্রামভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক ও একাডেমিক গবেষণা পরিচালিত হয় এবং এক্ষেত্রে নৃভাষাবিজ্ঞান বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে। তবে, নৃভাষাবিজ্ঞানের মতো এমন একটি বিস্তৃত জ্ঞানশাখার চর্চার ক্ষেত্রে এ অবদান অপর্যাপ্ত।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হলেও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের

মাতৃভাষা স্বতন্ত্র, বাংলাসহ ৪১টি ভাষার ভাষীর সংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। এসব জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি পৃথক এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বাংলার ন্যায় একইভাবে চর্চাও হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি অফিস-আদালতেও তারা মাতৃভাষা ব্যবহার করতে পারে না। ফলে ভাষা চর্চায় তাদের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। নিচে বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার প্রধান ক্ষেত্র অর্থাৎ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার কিছু স্বরূপ তুলে ধরা হলো-

ক) **আদিবাসী বিতর্ক:** বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ দীর্ঘদিন যাবৎ এ অঞ্চলে বাস করে আসছে, ফলে তারা নিজেরা 'আদিবাসী' নামে পরিচিতি পেতে আগ্রহী। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পাহাড়ি, জুমা, জুম্মা, আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, উপজাতি প্রভৃতি নামে তাদেরকে অভিহিত করা হয় এবং এসব নামকরণের পেছনে অনেকটা রাজনৈতিক কারণ সক্রিয় রয়েছে (সুমন, ২০২২)। নাম নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কে অনেকসময় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও দাবি পূরণের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। তাই বাংলাদেশ সরকার ২০১০ খ্রিস্টাব্দে তাদেরকে সাংবিধানিকভাবে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' বলে সম্বোধন করার প্রজ্ঞাপন জারি করেন; এর মাধ্যমে দীর্ঘদিনের নাম বিষয়ক জটিলতা হ্রাস পেলেও তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো প্রতিফলন ঘটেনি (সুমন, ২০২২)।

খ) **শিক্ষার মাধ্যম এবং মাতৃভাষায় পুস্তক রচনায় জটিলতা:** ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ তাদের ভাষায় পাঠদান করতে পারে না। তারা বাংলাভাষায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পেয়ে থাকে। ফলে মাতৃভাষাকেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব তাদের কাছে প্রতিভাত হয় না। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য সরকার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করেছে। সরকারিভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক অপ্রতুলতার কারণে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিতে অনাগ্রহী হওয়ায় এ জটিলতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ফলে, মাতৃভাষার মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না।

অপরদিকে, মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হলে প্রয়োজন মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশে কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যেমন– চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে। কিন্তু বাকি ৩৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদান করতে পারলে একটি শিশুর শিক্ষাগ্রহণ পূর্ণাঙ্গ এবং সফল হয়, তাই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করতে পারলে এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে পারলে এসব সম্প্রদায়ের শিশুরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভে সমর্থ হবে এবং দেশের সার্বিক শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পাবে।

গ) **সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় ধীরগতি:** সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়েই একটি জনগোষ্ঠীর সার্বিক

বিকাশ সম্ভব। সংস্কৃতি বিকাশ মানে তাদের জীবনাচরণের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন এবং সাহিত্য, সংগীত, কলা প্রভৃতির চর্চা। কিন্তু বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ তাদের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে রাখলেও অধিকাংশই তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি সঠিকভাবে অনুশীলন করতে পারে না, যার অন্যতম কারণ হলো পরিবেশ, পরিস্থিতি ও আর্থিক দৈন্য। নতুন প্রজন্মের মধ্যেও ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির প্রসার অপ্রতুল, বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়ার ফলে নতুন প্রজন্মের অনেকেই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিচর্চা বাদ দিয়ে অন্য সংস্কৃতি (বিশেষত বাঙালি) চর্চায় মনোনিবেশ করেছে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নয়নের প্রতি আগ্রহ কম থাকায় বেশিরভাগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সুষম বিকাশে অন্তরায় দেখা দিয়েছে।

এছাড়াও সাহিত্য রচনা এক ধরনের সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের উপায়। মুখে মুখে সাহিত্যচর্চা হলে তা একসময় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সেই সাহিত্য পুস্তক আকারে প্রকাশিত হলে তা বছরের পর বছর সংরক্ষিত থাকে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সাহিত্য সৃষ্টি তুলনামূলকভাবে অনেক কম, আবার কোনো কোনো ভাষায় কেবল মৌখিক সাহিত্য আছে কিন্তু লিখিত আকারে নেই। এরূপ পরিস্থিতির ফলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাহিত্যচর্চায় বিঘ্ন ঘটে এবং ভাষাচর্চায় সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

ঘ) **তথ্য ও তথ্যদাতার অপ্রতুলতা:** বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাগুলো নিয়ে গবেষণালবদ্ধ উল্লেখযোগ্য তথ্যভাণ্ডার নেই। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো কোনো গবেষক কিছু কাজ করলেও তা যৎসামান্য। সরকারি পৃষ্টপোষকতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের জাতিসত্তাদের নিয়ে কাজ করলেও এ প্রতিষ্ঠান থেকেও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত। এছাড়াও কিছু এনজিও বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেছে। কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এসব কাজ সম্পন্ন হয়েছে ফলে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। কাজেই বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণায় তথ্যের অপ্রতুলতা লক্ষণীয়। ভবিষ্যতে এজাতীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এমনকি ব্যক্তি পর্যায়ে আরও বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে অধিক সাফল্য পাওয়া সম্ভব।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, গবেষণা কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন তথ্যদাতা। নৃভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষকগণ যখন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত হন, তখন উদ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সদস্যগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানান। তথ্য ও উপাত্ত যথাযথ পাওয়া যায় না বলে গবেষকদের পক্ষে সঠিকভাবে গবেষণা করা সম্ভব হয় না। ফলে, গবেষণায় নির্ভুল ও তথ্যবহুল উপাত্ত পাওয়া যায় না বলে গবেষণা পূর্ণাঙ্গ হয় না। আবার, কোনো কোনো সম্প্রদায়ের সদস্যগণ বাংলা সঠিকভাবে বলতে ও বুঝতে পারে না বলে অনেক সময় তথ্য দিতেও ইতস্ততবোধ করেন, ফলে গবেষণার জন্য কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়া যায় না, যা গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

ঙ) **গবেষক এবং তথ্য-সহায়কের অভাব:** বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা গবেষণার অনেকগুলো প্রতিকূলতার মধ্যে আরেকটি হলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, যোগ্য ও সৎ গবেষকের অভাব। অত্যল্প নিষ্ঠাবান গবেষক ব্যতিরেকে অধিকাংশ গবেষকই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যয়নের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নয়। ফলে বেশ কিছু গবেষণা পাওয়া গেলেও মানসম্মত, বিস্তৃত এবং বিশ্লেষণধর্মী গবেষণাকর্ম তুলনামূলকভাবে কম পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও নৃভাষাবিজ্ঞান একটি গুরুগম্ভীর জ্ঞানক্ষেত্র যেখানে গবেষণায় সময় এবং ধৈর্য্য দুটোরই প্রয়োজন হয়, একইসাথে সদিচ্ছা ও কর্মক্ষেত্রে সততা থাকতে হয়। এ কারণে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা গবেষণার জন্য আগ্রহী গবেষকের অভাব দেখা যায়। তাছাড়া প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের গবেষণাকর্মে যুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়াও গবেষণা সহায়ক বা গবেষণা তথ্য-সহায়কের ধারণা এখনও এখানে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি; ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার ক্ষেত্রে কথাটি আরও বেশি প্রযোজ্য। এসব সম্প্রদায়ের ভাষা জানা লোকের অভাব রয়েছে, আবার যারা মোটামুটি তথ্য দিতে সক্ষম তাঁরা ব্যস্ততার দরুন সময় দিতে পারেন না, যা গবেষণার কাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই বলা যেতে পারে, বাংলাদেশে এখনও নৃভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়নি।

চ) **অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অভাব:** যেকোনো গবেষণার জন্যই প্রয়োজন অর্থ সহায়তা। অর্থের অভাব গবেষণাকর্ম বিলম্বিত হয় এবং নেতিবাচক প্রভাবও পরে। গবেষণাকর্মে অর্থনৈতিক প্রণোদনা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে এখনো গবেষণার ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি না হওয়ার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকট বড়ো ভূমিকা পালন করে থাকে। উন্নত বিশ্বে গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রণোদনা দিয়ে থাকে। সরকার এ ব্যাপারে বেশ তৎপর থাকে এবং ভাষা অধ্যয়ন, অনুশীলন ও গবেষণাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সরকারি, বেসরকারিভাবে গবেষণার জন্য পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে এ ধারা চালু হয়েছে কিন্তু তা খুবই সীমিত আকারে। ফলে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং একইসাথে দীর্ঘমেয়াদি ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালিত করাও অত্যন্ত জরুরী।

ফলাফল

বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চা একটি সম্ভাবনাময় ও বিকাশমান শাখা এবং একাধিক মানদণ্ডের উপর এর বাস্তবতা নির্ভরশীল। যার মধ্যে রয়েছে জ্ঞানার্জনের আগ্রহ, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা, বিষয়গত অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশা।

নৃভাষাবৈজ্ঞানিক জ্ঞান শুধু পঠন-পাঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি গবেষকদের চিন্তা ও মানসিক কাঠামোকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে সাহায্য করে। ইতিবাচকভাবে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষার বহুভাষিক বাস্তবতা, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, তাদের ভাষা ও শিক্ষাব্যবস্থা, গ্রামীণ সমাজ, লিঙ্গভিত্তিক ভাষাবৈচিত্র্য, ধর্ম, লিঙ্গ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক একটি শক্তিশালী আন্তঃবিষয়ক (interdisciplinary) গবেষণার সম্ভাবনা তৈরি করছে। বর্তমানে অনেক গবেষক ব্যক্তি উদ্যোগেই নৃভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজ করছেন, যার ফলে গবেষণায় বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এতে করে নৃভাষাবিজ্ঞান একটি বিকল্প বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা কাঠামো হিসেবে বিকশিত হচ্ছে।

অন্যদিকে, দুঃখজনক হলেও সত্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৃভাষাবিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হলেও, এটি একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী গবেষণা শাখা হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চা যথাযথ স্বীকৃতি লাভ করেনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অধীনে পরিচালিত গবেষণাতেও অনেক সময় জড়তা ও সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। সরকারি ও নীতিনির্ধারক পর্যায়ে এর গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে উপেক্ষিত, যার ফলে গবেষণা কাঠামো ও তহবিল দুটি ক্ষেত্রেই অভাব দেখা যায়। গবেষণার ক্ষেত্রও তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ, যেখানে মূলত জাতিগত ভাষা, গ্রামীণ সমাজ বা লিঙ্গভিত্তিক ভাষা ব্যবহার প্রাধান্য পেলেও আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং অঞ্চলভিত্তিক ভাষার বৈচিত্র্য নিয়ে তথ্যনির্ভর গবেষণা ও দলিলায়নের ঘাটতি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে, যা নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় সীমাবদ্ধতা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, প্রবীণ ও নবীন গবেষকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রজন্মগত বিভাজন রয়েছে; প্রবীণরা নৃভাষাবিজ্ঞানকে মূলত নৃবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের একটি সহায়ক শাখা হিসেবে দেখলেও, নবীন গবেষকেরা ভাষাকে একটি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও প্রান্তিক প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করছেন। যদিও কিছু কাজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্ব পেয়েছে, তবুও সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণা এখনো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে কাঠামোবদ্ধ ও তাত্ত্বিকভাবে পরিপক্কতা পায়নি। ফলে বলা যায় যে, জ্ঞানচর্চা ও পেশাগত দিক থেকে নৃভাষাবিজ্ঞান এখনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছায়নি। মাতৃভাষায় শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিকাশ সাধনসহ বেশ কিছুক্ষেত্রে রয়েছে বৈষম্য, অসামঞ্জস্যতা। তাছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি খাতে কাঠামোগতভাবে নৃভাষাবিজ্ঞানীদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান নেই, যা তাঁদের অনুৎসাহিত করছে। অনেকে এনজিও ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পেলেও, সেটা পর্যাপ্ত নয় বলে গবেষকরা অভিমত দিয়েছেন। এছাড়া, শিক্ষাজীবনে হাতে-কলমে গবেষণার অভাব, সীমিত ফিল্ডওয়ার্ক এবং আর্থিক ও কাঠামোগত সহায়তার অভাব তাদের বাস্তব দক্ষতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে যার সরাসরি প্রভাব পরছে নৃভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর, ফলে মানহীন ও অপ্রতুল হয়ে পরছে এ জ্ঞানচর্চার ধারা।

এসব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার টেকসই অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, গবেষণা সহায়তা, আন্তঃবিষয়ক সহযোগিতা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষাকে গবেষণার কেন্দ্রে আনা ভবিষ্যতের জন্য অত্যাবশ্যক। তবে, বাংলাদেশে নৃভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়োজিত ভাষাবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীরা এর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী; পাঠ্যক্রমে বাস্তবমুখী পরিবর্তন, যেমন– প্রশিক্ষণ, ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম, অধিকতর মাঠগবেষণার সুযোগ এবং সরকারি-বেসরকারিভাবে গবেষকদের অর্থ প্রণোদনা প্রদানসহ তাদের বিভিন্নক্ষেত্রে সক্রিয় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে একটি কার্যকর পেশাগত পরিসর গড়ে তোলার ব্যাপারে নৃভাষাবিজ্ঞানীরা ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে প্রাপ্ত ফলাফল নৃভাষাবৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চার বর্তমান পরিস্থিতি অনুধাবনে সহায়ক এবং ভবিষ্যৎ গবেষণাকে আরও বিস্তৃত ও অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে পরিচালনার প্রেরণা যোগাবে।

ভবিষ্যৎ পরামর্শ

বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চাকে আরও সুসংহত ও সময়োপযোগী করে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন; কারণ ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে এই শাখাটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশে এখনও এ বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা ও গবেষণা সীমিত হলেও, বহুভাষিক সমাজ বাস্তবতা, জাতিগোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষাগত অধিকার রক্ষার প্রেক্ষাপটে নৃভাষাবিজ্ঞান কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং মানবিক ও নৈতিক প্রয়োজনেও পরিণত হয়েছে। বিশেষত, প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাভিত্তিক পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু ভাষার সংরক্ষণ এবং বহুভাষিক ভাষানীতির উন্নয়নে নৃভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণা অপরিহার্য। তাই বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ ও কার্যকর করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে- প্রথমত, ভাষাগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করতে হবে, বিশেষ করে বিলুপ্তপ্রায় আদিবাসী ভাষাগুলোর তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৃভাষাবিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তৃতীয়ত, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নীতি-সহায়তা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এছাড়াও, ভাষা ও প্রযুক্তির সংযোগ স্থাপনে যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় স্থানীয় ভাষার অন্তর্ভুক্তি, স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ, বা স্পিচ টেকনোলজির বিকাশে এই শাখার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গবেষণা প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন এবং ক্ষেত্রসমীক্ষার সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষকদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়িয়ে ভাষাবৈচিত্র্য, ভাষার বিবর্তন এবং ভাষার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে গবেষণার পরিধিও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। সর্বোপরি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল আর্কাইভ ও ভাষাগত ডেটাবেস

তৈরি করা হলে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ আরও কার্যকর হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞান একটি সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধ গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে আরও উন্নত এবং বিকশিত হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশে নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তুলনামূলকভাবে নবীন গবেষণাক্ষেত্র, যা ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিগত পরিচয়ের গভীর সম্পর্ককে অনুসন্ধানের সুযোগ করে দেয়। দেশের বহুভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নৃভাষাবিজ্ঞানের জন্য একটি সমৃদ্ধ গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। তবে সঠিক গবেষণা পরিবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং নীতিগত উদ্যোগের অভাবে এর যথাযথ বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। লক্ষণীয় যে, বহুভাষিক সমাজ বাস্তবতা, জাতিগোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষাগত অধিকার রক্ষার প্রেক্ষাপটে নৃভাষাবিজ্ঞান কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং মানবিক ও নৈতিক প্রয়োজনেও পরিণত হয়েছে। বিশেষত, প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাভিত্তিক পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু ভাষার সংরক্ষণ এবং বহুভাষিক ভাষানীতির উন্নয়নে নৃভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা অপরিহার্য। তাই বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ ও কার্যকর করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে- প্রথমত, ভাষাগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করতে হবে, বিশেষ করে বিলুপ্তপ্রায় আদিবাসী ভাষাগুলোর তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৃভাষাবিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তৃতীয়ত, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নীতি-সহায়তা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এছাড়াও, ভাষা ও প্রযুক্তির সংযোগ স্থাপনে যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় স্থানীয় ভাষার অন্তর্ভুক্তি, স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ, বা স্পিচ টেকনোলজির বিকাশে এই শাখার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গবেষণা প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন এবং ক্ষেত্রসমীক্ষার সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষকদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়িয়ে ভাষাবৈচিত্র্য, ভাষার বিবর্তন এবং ভাষার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে গবেষণার পরিধিও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। সর্বোপরি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল আর্কাইভ ও ভাষাগত ডেটাবেস তৈরি করা হলে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ আরও কার্যকর হবে।

এসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য ভাষাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের মধ্যে আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে, এই ক্ষেত্রে গবেষণা ও নীতিগত উদ্যোগ আরও সম্প্রসারিত হলে নৃভাষাবিজ্ঞান বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

নৃভাষাবিজ্ঞানকে শুধুমাত্র একাডেমিক পরিসরে সীমাবদ্ধ না রেখে এর প্রয়োগিক দিকগুলোকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞান একটি সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধ গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে আরও উন্নত এবং বিকশিত হবে। ভবিষ্যতের জন্য গবেষকদের মধ্যে যে আশাবাদ ও প্রত্যাশা বিদ্যমান, তা যথাযথ দিকনির্দেশনা ও সহায়তার মাধ্যমে প্রতিফলিত হলে বাংলাদেশে নৃভাষাবিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের পথ তৈরি করা সুগম হবে।

তথ্য-নির্দেশ

আসাদুজ্জামান, মুহাম্মদ । (২০০৬)। *সিলেটের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা পাত্র: ভাষা সংস্কৃতি*। বাংলা একাডেমি পত্রিকা বর্ষ ৫০, সংখ্যা ২০০৭, ১২৪-১৩৯।

চাকমা, সুগত। (২০০০)। *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার*। নওরোজ কিতাবিস্তান।

মংবাঅং (মংবা)। (২০০৩)। *বাংলাদেশের রাখাইন সম্প্রদায় (ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা): চট্টগ্রাম।*

শাহনেওয়াজ, এ কে এম। (২০০৪)। *বাংলার সংস্কৃতি ও বাংলার সভ্যতা।* দিব্য প্রকাশ: ঢাকা।

Ahmed, A. F. S. (1960). *Social Ideas and Social Change in Bengal: 1818–1835*. Asia Publishing House.

Ahmed, S. (2020). *Cultural dynamics and language preservation in Bangladesh*. Dhaka University Press.

Ashaduzzaman, M. (2013). Language and Culture of Patro Community. *The Dhaka University Studies*, 141-156.

Azad, H. (1995). *Bangla Bhasha Andolon o Bangladesher Muktijuddho*. Mowla Brothers.

Blench, R. (2007). *Archaeology, Language, and the African Past*. AltaMira Press.

Bloomfield, L. (1914). *An Introduction to the Study of Language.* NeweYork: Henry Holt and Company.

Boas, F. (1911). *Handbook of American Indian Languages* (Vol. 40). Bureau of American Ethnology.

Chowdhury, A. (1996). Ethnic Identity and Social Mobilization in Bangladesh. University of Chittagong Press.

Chowdhury, M., & Haque, M. (2018). Language and health communication in Bangladesh: Challenges and strategies. *Dhaka University Press*.

Duranti, A. (2006). *Anthropological linguistics: A reader*. Wiley-Blackwell.

Foley, W. (2018). *Linguistics and cultural heritage: A case study*.

Cambridge University Press.

Gain, P., & Saha, P. S. (Eds.). (2007). *Bangladesher khudra jatishattar sangskriti*. Bangladesh SEHD.

Gardner, K. (1995). *Global migrants, local lives: Travel and transformation in rural Bangladesh*. Oxford University Press.

Hymes, D. (1964). *Language in culture and society*. Harper & Row.

Islam, S., Rahman, M., & Karim, R. (2017). Traditional medicine practices in rural Bangladesh: Ethnolinguistic perspectives. *Journal of Public Health Research*, 6 (2), 45–58.

Johnson, P. (2018). *Intercultural communication in diverse societies*. Routledge.

Kabir, A. H. (2013). *Language, identity and education in Bangladesh*. Peter Lang Publishing.

Karim, A. Z. (2014). Anthropology in Bangladesh: Its Emergence in relevance to global contextual. *The Anthropologist*, *17* (3), 957-965.

Levi-Strauss, C. (1963–1964). *Structural anthropology* (Vols. 1–2). Basic Books.

Murshed, S. M. (2009). The Khasis: Language situation. *Journal of The University of Dhaka*, Vol.90 , 53-66.

Murshed, S.M. (2011). Indigenous Languages of Bangladesh. Dhaka: Bangla Academy.

Patel, R. (2017). *Conflict resolution and cultural awareness in multicultural communities*. Oxford University Press.

Powell, J. W. (1891). *Indian linguistic families of America, North of Mexico* (No. 1). Createspace Independent Publishing Platform.

Redfield, R. (1930). Tepoztlan: a Mexican village; a study of folk life. Chicago: The University ogf Chicago Press.

Rahim, M.A. (1963). Social and cultural history of Bengal. Pakistan Historical Society.

Rahim, M. A. (1978). The Muslim Society and Politics in Bengal. Dacca: University of Dacca.

Rahman, T. (2020). Sylheti language and health literacy: Implications for public health initiatives in Bangladesh. *International Journal of Linguistic Anthropology*, 12 (1), 78–95.

Rasheda Akhtar and Zobaida Nasreen (2002), The Representation of

Chittagong Hill Tracts: An Overview, S.M. Nurul Alam (eds), In Contemporary Anthropology: Theory and Practice, Jahangirnagar University and The University Press Limited, Dhaka.

Rashid, S., & Shafie, H. A. (2017). Situating anthropology in Bangladesh: Transformations and trajectories in the anthropology tradition. *European Journal of Sociology and Anthropology*, 2 (1), 1–14.

Sapir, E. (1921). *Language: An introduction to the study of speech*. Harcourt Brace.

Sharma, R. S. (1995). *Looking for the Aryans*. Orient Longman.

Sibarani, R. (2020). Anthropolingustics as Interdisciplinary Approach. *Journal of Anthropolinguistics*, *1*(1), 1-8.

S.M.Nurul Alam and Rasheda Akhtar (1992), Problem of Ethnic Identity and National Integration: A Case Study from Chittagong Hill Tracts of Bangladesh; The Jahangirnagar Review, Part II, Social Science Vol XIII and XIV, Social Science Faculty, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka

Smith, J. (2015). *Social cohesion and language politics in South Asia*. Cambridge University Press.

Sopher, D.E. (1964). The Swidden/Wet-Rice Transition Zone in the Chittagong Hills. Annals of the Association of American Geographers, 54(1), 107-126.

Sumon, M. H. (2022). *Ethnicity and Adivasi identity in Bangladesh*. Taylor & Francis.

Swadesh, M. (2017). *The origin and diversification of language*. Routledge.

Wilce, J. M. (2017). *Voicing subjects: Public intimacy and mediation in the Bengali community*. Oxford University Press.

নওগাঁ জেলার সাঁওতালি ভাষা: একটি পর্যালোচনা

মোঃ ইসলাম আলী*

Abstract: The Santals living in Naogaon district have been preserving and nurturing their culture for generations. Usually, language originates when any nation exchanges its own expressions. And in this case, the role of language in maintaining unity in the life of every nation is immense. The diverse language of the Santals is closely intertwined with their way of life, thinking, and contemplation. The use of the Santali language is observed in the lifestyle of the Santals of this district and in some cases its influence on the progressive population can also be observed. The article in question attempts to portray the true picture of the language of the Santal people of Naogaon district.

মূল শব্দ (Key words): সাঁওতালি (Santali), উপভাষা (dialect), প্রান্তিক ভাষা (marginal language), অনার্য ভাষা (non-Aryan language), প্রাগ্রসর (progressive)

ভূমিকা

মানুষের জীবনাচরণের সাথে ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভাষার মধ্যদিয়ে যেকোনো জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি মৌলিক ধারণা পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় ভাষা তাদের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ধারণা করা হয়, ভারতের সাঁওতাল পরগনাধীন 'সাঁওন্ত' (Saont) ভূমিতে বসবাসের সূত্র ধরে 'সাঁওতাল' নামের উদ্ভব হয়েছে (Choudhury, 1987)। আবহমান কাল ধরে সমাজে গড়ে ওঠা বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য ভাষা তাদের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে, যা নওগাঁ জেলায় বসবাসরত সাঁওতালদের মধ্যে লক্ষ করা যায় (খান, ২০২১)। উত্তরবঙ্গের ইতিহাসসমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী নওগাঁ মহকুমা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ এক সরকারি আদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজশাহী জেলা থেকে পৃথক হয়ে

* Md. Islam Ali, Associate Professor, Department of Islamic History and Culture; and PhD. Researcher, PUST, email: islam24bcs@gmail.com

জেলায় রূপান্তরিত হয়। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রভাশালী জেলা নওগাঁর সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ভাষার পরিচয় তুলে ধরা হবে।

গবেষণার বিষয় শনাক্তকরণ

এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নানারকম ভাষা ব্যবহারে বাঙালি জাতি সমৃদ্ধ হয়েছে (তরফদার, ১৯৯৫)। বর্তমান গবেষণাকর্মের সাথে নওগাঁ জেলার সাঁওতালদের ভাষার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সাঁওতালদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, যা নানাভাবে নওগাঁ জেলায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। সাঁওতালরা সুদীর্ঘকাল নওগাঁ জেলায় একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে জীবন-যাপন অতিবাহিত করে আসছে। নগর জীবনের বাহিরে গ্রামীণ সাঁওতাল অধিবাসীদের জীবনযাত্রার রূপ সন্ধান জরুরি (চৌধুরী ও রশীদ, ১৯৯৫)। কাজেই তাদের ভাষার নানা দিক খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হবে। সঙ্গত কারণে আলোচ্য গবেষণায় ভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

গবেষণার উদ্দেশ্য

পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীর ন্যায় সাঁওতালদেরও নিজস্ব ভাষা রয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণার মধ্যদিয়ে নওগাঁ জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভাষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

ক. নওগাঁ জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভাষার পরিচয় তুলে ধরা;
খ. নওগাঁ জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভাষার উপাদান অনুসন্ধান;
গ. নওগাঁ জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভাষার প্রভাব উদ্‌ঘাটন করা।

এছাড়া সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ভাষা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যাপকভাবে গুরুত্ব পাবে বলে আমি মনে করি।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বরেন্দ্র অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা সম্পাদিত হলেও নির্দিষ্টভাবে নওগাঁ জেলার সাঁওতালদের ভাষা নিয়ে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। বরেন্দ্র অঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে নওগাঁ জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সাঁওতাল সম্প্রদায় বসবাস করে থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে শুধু বাঙালিদের নয়, বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরও অবদান রয়েছে। নওগাঁ জেলায় সাঁওতাল সম্প্রদায় বেশ প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী হিসেবে আধিপত্য বজায় রেখে চলেছে। সংগত কারণে নওগাঁ জেলার সাঁওতালদের ভাষা শিরোনামে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে দেশে স্থানীয় ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি জাতির স্থানীয় ও আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা সম্ভব

নয়। স্থানীয় ও আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে জাতীয় ইতিহাস। এ গবেষণাটি জাতীয় ইতিহাস রচনা ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছি।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে নওগাঁ জেলার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ভাষার উপর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে প্রাথমিক উৎস হিসেবে সরকারি-বেসরকারি দলিলপত্র, জেলা গেজেটিয়ার, জনশুমারি রিপোর্ট, সাঁওতালদের ভাষা পর্যবেক্ষণ ও সরেজমিনে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাবলি, গবেষণা নিবন্ধ, থিসিস, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট, সাময়িকী, ব্যক্তিগত সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।

পূর্বগবেষণা সমীক্ষণ

নওগাঁ জেলার সাঁওতালদের ভাষা নিয়ে একক কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত না হলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ভাষা নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নিম্নলিখিত কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলো।

আবদুস সাত্তারের *আরণ্য জনপদে* গ্রন্থে বাংলাদেশের বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায় নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে (সাত্তার, ১৯৬৬)। গ্রন্থটিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঠারোটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ বরেন্দ্র অঞ্চলের সাঁওতাল, রাজবংশী ও ওরাওঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের অবস্থান, গোত্র পরিচয়, পরিবার, সমাজ কাঠামো, বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কিত কার্যক্রম, ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা, উৎসবাদি, নৃত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থটিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ভাষা সংক্রান্ত বিষয়াবলি আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে নওগাঁ জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভাষা নিয়ে নির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা হয়নি। তবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ের প্রাচীন উপাদান হিসেবে গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুহম্মদ আবদুল জলিলের *বাংলাদেশের সাঁওতাল: সমাজ ও সংস্কৃতি* গ্রন্থে বাংলাদেশের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে (জলিল, ১৯৯১)। গ্রন্থটিতে তাদের জাতিসত্তা, আবাসভূমি, সমাজ কাঠামো, বিচারিক কার্যাবলি, গোত্র বিভাজন, দৈনন্দিন কার্যক্রম, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে নওগাঁ জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভাষা বিষয়ক স্পষ্টত উল্লেখ নেই। তবে উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সমাজের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, যা গবেষণার উপাদান হিসেবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী ও জোবাইদা নাসরিন রচিত *নিজভূমে পরবাসী উত্তরবঙ্গের আদিবাসীর প্রান্তিকতা ডিসকোর্স* গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের প্রান্তিক পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়াদি তুলে ধরা হয়েছে (কামাল ও অন্যান্য, ২০০৬)। গ্রন্থটিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম বিতর্ক, সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ভূমির অধিকার ও সমস্যা, শ্রম বাজার, শ্রমিকের প্রান্তিকতা, ভাষা, সামাজিক বৈষম্য ও বিরোধ, ধর্মীয় আধিপত্য, নারীর মর্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে নওগাঁ জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভাষা বিষয়ে স্পষ্টত উল্লেখ নেই। তবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিষয়ক গবেষণার জন্যে এটি সহায়ক হবে।

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির নিজস্ব ভাষা রয়েছে, যা সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভাষা মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। প্রত্যেক জাতির জীবনে ঐক্য স্থাপনে ভাষার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে ভাষা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হলো।

ভাষা কী?

মানবজাতির অমূল্য সম্পদ হলো ভাষা। যেখানেই মানুষ আছে, সেখানেই ভাষা পরিলক্ষিত হয়। মানুষের মুখে উচ্চারিত বোধযোগ্য ধ্বনিই হলো ভাষা। পৃথিবীতে দেশ, জাতি, গোষ্ঠী ও অঞ্চলভেদে ভাব প্রকাশের তারতম্যের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব হয়েছে (সরেন, ২০১২)। বৈচিত্র্যময় এদেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করে। মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে মানুষের আবেগ, অনুভূতি, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, সৃষ্টিশক্তি, মনের ভাব ও কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি থেকে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

ভাষায় গুরুত্ব

যেকোনো জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় নির্ণয়ে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। মায়ের ভাষা প্রত্যেক জাতির নিকট অত্যন্ত প্রিয়, যা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো কাজ করে থাকে। মানুষ ভাষা নিয়ে জন্মায় না, বরং সমাজ থেকে তা অর্জন করে থাকে। ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম (চৌধুরী, ২০২১)। মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা মানুষের চিরায়ত সম্পদ। মানুষ জন্মসূত্রে ভাষা লাভ করে থাকে (সেন, ২০০৪)। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন, ভাষা সমাজ থেকে জন্মে ও বিকশিত হয় (শহীদুজ্জামান, ২০২০)। মাতৃভাষার সাথে রয়েছে মানুষের আত্মিক বন্ধন। এই ভাষার জন্যে বাঙালিদের জীবন দিতে হয়েছে এবং ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক মাতৃভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের কবলে নিস্পৃহ, অপেক্ষাকৃত দুর্বল, ম্রিয়মাণ, মুমূর্ষু, ক্ষয়িষ্ণু ও প্রান্তিক ভাষাগুলোাকে টিকিয়ে

রাখতে এ স্বীকৃতি সঞ্জীবনী বার্তা এনে দিয়েছে।

বিশ্বের সকল জাতির মাতৃভাষা রক্ষার্থে বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৬,৮০৯টি ভাষা প্রচলিত আছে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন জাতির প্রায় উনচল্লিশটি ভাষার প্রচলন রয়েছে (আহমদ, ২০১১)। ধারণা করা হয়, সভ্যতার ক্রমবিবর্তন, আধুনিক পণ্যের ঝলকানি, খরা-বন্যা, ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, গণহত্যা, অভিবাসন প্রভৃতি কারণে অনেক সময় ভাষা হারিয়ে যায়। আবার উচ্চারণ বৈষম্যে শব্দ পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টিও হয় (ঘোষ, ২০১৫)।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ভাষাগুলোর উন্নয়ন ও সংরক্ষণে প্রাক-প্রাথ মিক ও প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাঁওতালরা সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে থাকে (কামাল, ২০১৮)। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্যে সাঁওতালি ভাষা অন্যতম।

সাঁওতালি ভাষা

সাঁওতালরা কথোপথনে নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করে, যার নাম সাঁওতালি ভাষা। সাঁওতালদের ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর মুন্ডারি শাখার অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত পরিবার থেকে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়। গবেষণা অঞ্চলের সাঁওতালরা দৈনন্দিন জীবনে নিজস্ব ভাষায় কথা বললেও প্রাগ্রসর জনগোষ্ঠীর সাথে শুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা বলে থাকে। সাঁওতালদের মধ্যে ভাষা সম্পর্কিত এক ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত যে, লিখিত রূপের চেয়ে শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ ভাষা। সে কারণে সাঁওতালি ভাষা দীর্ঘদিন ধরে তাদের মুখে মুখে চর্চা হয়ে আসছে। মানুষের মুখের ভাষার সাথে দেশ, সমাজ, পরিবেশ ও পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ভাষা হলো সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শিল্পকর্মের ধারক ও বাহক। সম্প্রতি সাঁওতালরা খ্রিস্টান মিশনারিদের সহায়তায় রোমান বর্ণমালার আলোকে ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগ গ্রহণ করেছে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভাষা, শিক্ষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর হচ্ছে।

সাঁওতালি ভাষার ইতিহাস

মানুষ অঙ্গভঙ্গি করে মনের ভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভাষা আয়ত্ত করতে শেখে (ইমাম, ২০১৩)। মানুষের বুদ্ধির প্রয়োগ, সামাজিক প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের তাড়নায় ভাষার সৃষ্টি হয়েছে (মোজাম্মেল, ২০০৯)। সাঁওতালদের লেখার প্রাচীন উৎস ছিল রোমান লিপি। তাদের লিপি নিয়ে নানারকম লোককথা প্রচলিত আছে। তাদের গোত্রসমূহের মধ্য থেকে মুরমু গোত্রের উপর লিপি তৈরির দায়িত্ব অর্পিত হয় (মুরমু, ২০২০)।

এ মূল্যবান কাজের জন্যে সাতজন পণ্ডিতকে মনোনীত করা হয়। তারা দেব-দেবী, গুহামানব, শিকারি মানব, পশুপালক মানব, কৃষিজীবী মানব প্রভৃতির শব্দ ও চিহ্ন থেকে লিপি তৈরি করেন। কিন্তু এ লিপি এক সময় ব্রাহ্মী লিপির সাথে বিলীন হয়ে যায়।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান মিশনারিরা ভারতের সাঁওতাল পরগনায় সাঁওতালি ভাষাকে লিখিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে (সিকদার, ২০১১)। এক্ষেত্রে তারা সর্বপ্রথম সাঁওতালি ভাষার উপর রোমান অক্ষরের ব্যবহার প্রয়োগ করে। মিশনারিরা রোমান অক্ষরে সাঁওতালি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। ফলে ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের মধ্যে এটি ধর্মীয় চর্চার লিপি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান লিপিতে বেশি জটিলতা থাকায় বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের সাঁওতালরা এটি ভালোভাবে রপ্ত করতে পারেনি। অতঃপর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সাধু রামচাঁদ মুরমু 'মজ দাঁদের আঁক' লিপি আবিষ্কার করেন (মুরমু, ২০২০)। পরবর্তীতে শিক্ষিত সাঁওতালরা আঞ্চলিক লিপিকে তাদের ভাষায় প্রয়োগের চেষ্টা করে। কিন্তু সাঁওতালি ভাষায় সকল ধ্বনিকে প্রকাশ করার মতো বর্ণ বা অক্ষর প্রয়োগে জটিলতা দেখা দেয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু আরেকটি সাঁওতালি লিপির উদ্ভাবন করেন, যার নাম 'অলচিকি' বা রোমান লিপি। 'অল' এর বাংলা অর্থ 'লেখা' এবং 'চিকি' এর বাংলা অর্থ 'লিপি'। এ লিপিতে ত্রিশটি বর্ণ রয়েছে যা বাম দিক থেকে ডানদিকে লিখতে হয়।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২০শে মার্চ বাংলাদেশে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার বর্ষাপাড়া গ্রামে সাঁওতালি ভাষার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করে সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়টি উপলব্ধি করে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। সে অনুযায়ী ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি (চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় শিক্ষাদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের ঘোষণা দেওয়া হয় (সিংহ, ২০২০)। সাঁওতালদের বর্ণমালা নিয়ে বিতর্ক থাকায় তা প্রাথমিক পর্যায়ে বাদ পড়ে যায়। তবে আমাদের গবেষণা অঞ্চলে সাঁওতালদের বংশ পরম্পরায় সাঁওতালি ভাষায় কথা বলতে দেখা যায়।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে আচার্য জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন (George Abraham Grierson) উপমহাদেশের প্রধান প্রধান ভাষাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। এগুলোর মধ্যে মুন্ডারি ভাষার অন্যতম উপভাষাগুলো হলো- সাঁওতালি, মুন্ডা, হো, ভূমিজ, কোরওয়া, কুরকু, খাড়িয়া, জুয়াং, শবর, গদবা প্রভৃতি (Grierson, 1968)। মুন্ডা বা কোল ভাষী জনগোষ্ঠীর লোক বিহারের ছোটোনাগপুর, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও সাঁওতাল পরগনায় বসবাস করতো। সাঁওতালরা দীর্ঘদিন সাঁওতাল

পরগনায় বসবাসের ফলে তাদের মুখের ভাষাকে সাঁওতালি ভাষা বলে অভিহিত করা হয়। ক্ষেত্র গুপ্তের মতে, মৌর্য যুগে আর্য ভাষা এদেশে প্রবেশ করেছিল (গুপ্ত, ২০০০)। আর্য ভাষা প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলার আদিম অধিবাসীরা অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও তিব্বতি-বর্মি ভাষায় কথা বলতো। অনার্য ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুন্ডা, কুরকি, জুয়াঙ, সাঁওতালি প্রভৃতি (আলী, ২০০৭)।

সাঁওতালি ভাষার বর্ণমালা

একটি ভাষা বিকশিতকরণে বর্ণমালার গুরুত্ব অপরিসীম। সাঁওতালি ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষাকে ধরে রাখার জন্যে বর্ণের আবিষ্কার হয়েছে। নিম্নে সাঁওতালি বর্ণমালার চূড়ান্ত রূপ দেখানো হলো।

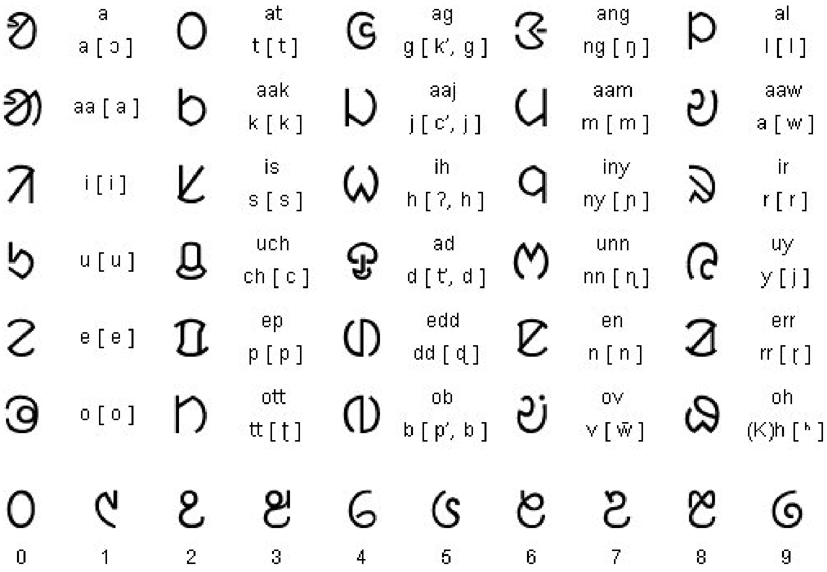

উৎস: www. santali language

সাঁওতালি স্বরবর্ণের উচ্চারণ

সাঁওতালি ভাষায় স্বরবর্ণ ৫টি। যেমন:

a	e	i	o	u
আ	এ	ই, ঈ	ও	উ, ঊ

উৎস: www. santali language; Gabriel Hasdak, *KATHA PARIAN সংক্ষিপ্ত সান্তালী অভিধান (সান্তালী-বাংলা)* (Rajshahi: Pahil Chapa, 2008), p. ii.

স্বরবর্ণের সাঁওতালি উচ্চারণ

ã	ê	e	é	í	o	õ	û
আঁ	এঁ	এ্যা	এ্যাঁ	ইঁ	অ	অঁ	উঁ

উৎস: Gabriel Hasdak, *KATHA PARIAN সংক্ষিপ্ত সান্তালী অভিধান (সান্তালী-বাংলা)* (Rajshahi: Pahil Chapa, 2008), p. i.

ব্যঞ্জনবর্ণের সাঁওতালি উচ্চারণ

সাঁওতালি ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৩টি। যেমন:

k	kh	g	gh	n
ক	খ	গ	ঘ	ঙ, ৎ
c	ch	j	jh	ń
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
t	th	d	dh	ñ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
t	th	d	dh	r
ত	থ	দ	ধ	ন, ড়
p	ph	b	bh	m
প	ফ	ব	ভ	ম
y	r	l	w	s
য, য়	র	ল	ব	শ,ষ, স
h	k’	t’		
হ	ঃ	ৎ		

উৎস: www. santali language; Gabriel Hasdak, *KATHA PARIAN সংক্ষিপ্ত সান্তালী অভিধান (সান্তালী-বাংলা)* (Rajshahi: Pahil Chapa, 2008), p. ii.

সাঁওতালি বর্ণমালার বৈশিষ্ট্য হলো:

ক. মোট বর্ণ সংখ্যা ৩৮টি;
খ. স্বরবর্ণ ৫টি;
গ. ব্যঞ্জণবর্ণ ৩৩টি;
ঘ. লিখনের গতিপথ বামদিক থেকে ডানদিকে;
ঙ. রোমান হরফে লেখা হয়;
চ. যুক্তবর্ণের ব্যবহার হয়।

সাঁওতালি ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো:

ক. সাঁওতালি ভাষায় অং, আং, ইং, ঞ, ঁ বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন- জিলিং, লাপাং, কাতিং, মারাং, তোড়াং, ডিং, ডাং, সেরেঞ প্রভৃতি।

খ. সাঁওতালি ভাষায় শব্দের শেষে প্রায়ই 'আই' প্রত্যয় যোগ হয়। যেমন- মরাঁই, দেখাঁই, দলকাঁই প্রভৃতি।

গ. তুলনা বোঝাতে 'খোম' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন- আম খোম মারান (আমি তোমার চেয়ে বড়ো)।

ঘ. বিশেষণ বিশেষ্যের আগে বসে। যেমন- বোগে হড় (ভালো মানুষ)।

ঙ. ক্রিয়াপদে 'আ'-এর আধিক্য দেখা যায়। যেমন- যাঁয়ে, খাঁয়ে, পাঁয়ে প্রভৃতি।

চ. সাঁওতালি ভাষায় বিশেষ্য ও সংখ্যাবাচক শব্দে নির্দেশক 'টা, টি, টাং', ব্যবহৃত হয়। যেমন- হাপানতেত (ছেলেটা), মিতটন (একটি), মিৎটাং দারে তাহেকানা (একটা গাছ ছিল) প্রভৃতি।

ছ. না-বোধক বাক্যে না শব্দ ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। যেমন- হামনি না যাব (আমি যাব না)।

জ. 'সাঃ' সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।

ঝ. সাঁওতালি ভাষায় লিঙ্গবাচক শব্দের পূর্বে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহার করে লিঙ্গ নির্ণয় করা হয়। যেমন- বেটা ছেলে, মেয়ে ছেলে।

সাঁওতালি শব্দ ও বাংলা শব্দের ব্যবহার

সাঁওতালি ভাষার উপর বিভিন্ন ভাষার প্রভাব পড়লেও তাদের ভাষার গঠন, চরিত্র ও ব্যবহার এখনও স্বকীয়তায় টিকে আছে। গবেষণায় সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত কিছু শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

সংখ্যাবাচক সম্পর্কিত: মিৎ (এক); বার/বারিয়া (দুই); পে/পিয়ে (তিন); পোন/পনিয়ে (চার); মোঁরে (পাঁচ); তুরুই (ছয়); ইয়াই (সাত); ইরিল (আট); আরে (নয়); গ্যাল (দশ); মিৎ শাএ (একশ); মিৎ হাজার (একহাজার)।

পারিবারিক সম্পর্ক ও সম্মোধন সম্পর্কিত: আপাং/আপপা/ইমবাবা/বাবা (পিতা/বাবা); এংগাত/এংগা/ইমগোগো/গঃ (মাতা/মা); বয়হা (ভাই); মিশএরা/দাই (বোন); হুদিন আপপা (চাচা/মেসো); মারাং এংগা (চাচি/মাসি); মামা (মামা); হাতম (মামি); হপন/গিদরা/কোড়া (ছেলে/ পুত্র); হপন এরা/কুড়িগিদরা (মেয়ে/কন্যা)।

দিক সম্পর্কিত: উতর (উত্তর); দাখিন (দক্ষিণ); পূরুব (পূর্ব); পাছিম (পশ্চিম); সের্মা (উর্ধ্ব); হাসা/অৎ (অধঃ)।

মানব দেহ সম্পর্কিত: লুতুর (কান); কাটুপ (আঙুল); মেৎ (চোখ); তি (হাত); ডাঁটা (দাঁত); বহোঃ (মাথা); মু (নাক); জাঙা (পা); মেৎআঁহা (মুখমণ্ডল)।

সময় ও কাল সম্পর্কিত: বাসকিয়া/সেতাঃ (সকাল); আইব/তারাসিঞ (বিকাল); তিকিন (দুপুর); নিনদা (রাত); তেহেঞ (আজ); গাপা (আগামীকাল); হোলা (গতকাল); নাহাঃ (বর্তমান)।

সাপ্তাহিক বার সম্পর্কিত: ঞহুম মাহা (শনি বার); সিগে মাহা (রবি বার); অত্যা মাহা (সোম বার); বাল্যা মাহা (মঙ্গল বার); সাগুন মাহা (বুধ বার); সারদি মাহা (বৃহস্পতিবার); জারুম মাহা (শুক্রবার)।

মাস ও ঋতু সম্পর্কিত: বৈশাখ (বৈশাখ); জেট (জ্যৈষ্ঠ); আষাঢ় (আষাঢ়); শান (শ্রাবণ); ভাদোর (ভাদ্র); আশিন/দাশাই (আশ্বিন); কার্তিক (কার্তিক); আঘান (অগ্রহায়ণ); পৌষ (পৌষ); মাঘ (মাঘ); ফাগুন (ফাল্গুন); চৈৎ (চৈত্র)।

প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কিত: চিন্দাচান্দু (চাঁদ); সিং চান্দু (সূর্য); নাই/গাডা (নদী); ইপিল (তারা); বুরু (পর্বত); হারা (পাহাড়); সেঙ্গেল (আগুন); হএদাঃ (ঝড়-বৃষ্টি); নাই/গাডা (নদী)।

গাছ ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত: উল দারে (আম গাছ); বাড়ে দারে (বট গাছ); তাল দারে (তাল গাছ); মাৎ (বাঁশ); সারজম সাকাম (শালপাতা); কাণ্ঠার দারে (কাঁঠাল গাছ); জানুম দারে (কুল গাছ)।

ফুল সম্পর্কিত: গুলাব বাহা (গোলাপ ফুল); চাম্পা বাহা (চাপা ফুল); পরাইনি বাহা (পদ্মফুল); কামিনী বাহা (কামিনী ফুল); কুসবি বাহা (গাঁদা ফুল); দাতরে বাহা (ধুতরা ফুল)।

ফল সম্পর্কিত: উল (আম); কাণ্ঠার (কাঁঠাল); কাএরা (কলা); জাম্বির (লেবু); সিঞজো (বেল); নারকড়/নারিওড় (নারিকেল); জঃজঃ (তেঁতুল); কিআকাণ্ঠাড় (আনারস)।

ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সম্পর্কিত: চেলাং (হাঁড়ি); থারী (থালা); খুড়খুড়ি (পালকি); কুলুপ (তালা); কাঠি (চাবি); জনঃ (ঝাটা); বিনি (পাখা); সিতান (বালিশ); পাটিআ/শপ/মান্দুর (মাদুর)।

ঘরবাড়ি সম্পর্কিত: বাড়গে (ভিটা); হাসা/অৎ (মাটি); সিলপিঞ (দরজা); দোলান (দালান); রাচা (উঠান); পাচরী (প্রাচীর); খুড়পি (কুঠি); গোড়া (গোয়াল ঘর)।

রং সম্পর্কিত: হেন্দে (কালো); লীল (নীল); পোণ্ড (সাদা); সাসাং (হলুদ); হারিয়ার (সবুজ); আরাঃ (লাল); পোলসো (মেটে); কাব্‌রা (চকরা বকরা)।

খাদ্যদ্রব্য ও শাক সবজি সম্পর্কিত: দাকা (ভাত); ডার (ডাল); চাউলে (চাউল); দাক (পানি/জল); তোয়া (দুধ); বেলে (ডিম); তাবেন (চিড়া); গতম (ঘি); হতঃ (লাউ)।

রবিশস্য ও মসলা দ্রব্য সম্পর্কিত: হরো (ধান); তুড়ি (সরিষা); বুট (ছোলা); রাম্‌ড়া (মাষকালাই); রাসুন (রসুন); আধে (আদা); মরিক (মরিচ); এলাক (এলাচ)।

মৎস্য সম্পর্কিত: রুহি (রুই); ইচা (চিংড়ি); বোআড় (বোয়াল); জিআল (শিং); মাগরি (মাগুর); কাটকোম (কাঁকড়া); ইচা (চিংড়ি)।

নেশাজাতিয় দ্রব্য সম্পর্কিত: হাণ্ডি (পচই); পাউরা (মদ); হান্ডি (হাঁড়িয়া); হুকা (হুকা); গাঞ্জা (গাঁজা); থামাকুর (তামাক); চিলিম (কলকি); গুআ (সুপারি)।

রোগ-ব্যাধি সম্পর্কিত: মান্দা (সর্দি); খো (কাশি); রুআ (জ্বর); হাওয়াদুক (কলেরা); গুটিদুক (বসন্ত); ধঁক (যক্ষা); বাবাৎ (চুলকানি); মাচকাও (মচকানো)।

প্রাণী সম্পর্কিত: হড় (মানুষ); গাঁড়ি (বানর); সিম্ (মুরগি); ডাঙ্গরা/গাই (গরু/গাই); মিরু (টিয়া); চেরচেটাঃই (টিকটিকি); মেরম (ছাগল); সেতা (কুকুর)।

পেশাভিত্তিক শব্দ সম্পর্কিত: ধূবি (ধোপা); নাউ (নাপিত); কেঁওটা (জেলে); ওঝহা (চিকিৎসক); কো কো ইঃ (ভিক্ষুক); বড়িআ (দোকানদার); সেসেরিং ইঃ (গায়ক)।

অলংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত: সাকোম (চুড়ি); মুদম (আংটি); লিপুর (নূপুর); ঠেকা পাগরা (কানফুল); হাসলি (হাসলি); নথ/মু-মাকড়ি (নাকফুল); পানাহি (জুতা)।

কৃষিজ সম্পর্কিত: নাহেল (লাঙ্গল); ঝালি (জাল); যান্তি (যাঁতা); বড়শি (বড়শি); কাপচি (কাঁচি); আঁরগোম (মই); মুগার (হাতুড়ি); কাতা (করাত)।

অস্ত্র ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত: সার (তীর); আক (ধনুক); ফিরি (ঢাল); ভোকার (ছোরা); বানাম (বেহালা); রাহাড় (ঢাক); তিরিও (বাঁশি); তুমদা (ঢোল)।

সর্বনাম সম্পর্কিত: ইঞ্ (আমি/ আমাকে); আম (তুমি/তোকে); উনি (সে/তাকে); উনকো (তারা); অক ই (কে/কাকে); আলে রেআঃ/ আলেআঃ (আমাদের)।

সাঁওতালি বাক্য সম্পর্কিত: আমাঃ ওড়াঃদ ওকারে (তোমার বাড়ি কোথায়?); ইঞাঃ ওড়াঃ নওগাঁ রে (আমার বাড়ি নওগাঁ); আমদ চেয় লিকা মিনামাহ (তুমি কেমন আছো?); ইংসো মসগি মিনোয়া (আমি ভালো আছি); আমদ আতি সারহাও (আপনাকে ধন্যবাদ)।

আঞ্চলিকতা সম্পর্কিত

বাংলা শব্দ	সাঁওতালি শব্দ (বৃহত্তর রাজশাহী)	সাঁওতালি শব্দ (বৃহত্তর দিনাজপুর)
চাড়ি	নাইদা	চাড়া
নিচু জমি	কান্দর	সোকড়া
উঁচু জমি	ঢুই	ঢিপি
গরুর খুঁটি	দাড়াক	খুন্টো
স্নান	পয়রা	ডবরু

কাটা	গেত	জালুম
ষাঁড়	আদার	আন্ডিয়া ডাংরা
ছায়া	গাতি	উমুল
কাস্তে	হাসুয়া	দাতরম

সাঁওতালি শব্দের প্রভাব

ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতি ও তাদের ভাষার সহাবস্থানকে কেন্দ্র করে পারস্পারিক ভাব-বিনিময়ের সংমিশ্রণে আর্য ভাষার উপর অনার্য ভাষার প্রভাব ঘটেছিল (ed. Majumdar, 1951)। বাংলাদেশ তথা নওগাঁ জেলায় যেসকল সাঁওতালি শব্দ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তা নিম্নে অক্ষরের ক্রমানুসারে প্রদত্ত হলো:

আ: আঠা (জোড়া দেওয়া), আকাট (মূর্খ) (সরকার, ২০১৩); আলপনা (সুর, ১৯৯৪); আখ (হোসেন, ২০১৮)।

উ: উলুধ্বনি (সুর, ১৯৯৪)।

এ: এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি (রায়, ১৪১২); এক গণ্ডা (চার কুড়ি) (মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৩)।

ক: কম্বল, কাদা, কাঁকড়া, কাক, কালিয়া (কলঙ্ক), কাশফুল, কুড়ি (২০) (শহীদুল্লাহ, ১৯৮১); কামরাঙ্গা (হক, ২০১৮); কলা, কলাগাছ (সুর, ১৯৯৪); কোদাল (আহমদ, ১৯৯৪); কুচা (কুচিয়া) (দাশ, ১৯৯৩); কাঠা (হক, ২০১৮); কাপড় (হাসান, ২০১৬); কার্পাস (চক্রবর্তী, ১৩১৭); কানি (কাপড়ের ছেঁড়া অংশ) (শাহনাওয়াজ ও হেরেন, ২০১৯); কুমড়া (চক্রবর্তী, ১৩১৭); কচু (হোসেন, ২০১৮); করাত, কড়ি; কলি (চুন) (রায়, ১৪১২)।

খ: খড়ম, খাড়ি (নদীর পাড়), খণ্ড, খরা, খোদা (খুড়া), খিল (অনাবাদি), খুটি (সরকার, ২০১৩)।

গ: গছি (গুচ্ছ), গাড়া (গর্ত), গুড়] (সরকার, ২০১৩); গণ্ডার, গড় (দুর্গ) (রায়, ১৪১২); গজ (চক্রবর্তী, ১৩১৭)।

চ: চিংড়িমাছ, চালা, চাপরী (মাটির খণ্ড), চিরা (ভাগ করা), চুয়া (ঝরা) (সরকার, ২০১৩); চাউল (সুর, ১৯৯৪)।

জ: জুয়া, জাম্বুরা (রায়, ১৪১২)।

ঝ: ঝুড়ি (হক, ২০১৮); ঝাঁপি (শাহনাওয়াজ ও হেরেন, ২০১৯); ঝগড়া, ঝাপড়ি (সরকার, ২০১৩); ঝাল (চক্রবর্তী, ১৩১৭); ঝোড় (রায়, ১৪১২)।

ঠ: ঠেঙ্গা (সরকার, ২০১৩); ঠ্যাং (হাঁটুর নিম্নাংশ) (রায়, ১৪১২); ঠোঁট (সরকার, ২০১৩)।

ড: ডহর (মাটির রাস্তা), ডাল (বৃক্ষশাখা), ডাগর, ডালা (বাঁশের তৈরি) (সরকার, ২০১৩); ডোঙ্গা (গুড়িকাঠের নৌকা) (হাসান, ২০১৬); ডোম (শাহনাওয়াজ ও হেরেন, ২০১৯); ডালিম (চক্রবর্তী, ১৩১৭); ডুমুর (রায়, ১৪১২)।

ঢ: ঢাল (সরকার, ২০১৩)।

ত: তাম্বল (চক্রবর্তী, ১৩১৭); তু তু (কুকুরকে ডাকা) (রায়, ১৪১২)।

দ: দড়ি, দাঁড়, দাও (দা) (সম্পা. মুসা, ১৯৯৪); ধামা (হক, ২০১৮)।

ধ: ধুরি (সম্পা. মুসা, ১৯৯৪); ধোপা (সরকার, ২০১৩); ধনুক (রায়, ১৪১২); ধান (হোসেন, ২০১৮)।

ন: নারিকেল (চক্রবর্তী, ১৩১৭)।

প: পণ (চার কুড়ি) (সম্পা. সরকার, ২০১৮); পাল (সম্পা. মুসা, ১৯৯৪); পাহাড়, পাথর, পটল, পাড়, পুঁটি, পাড়া (সরকার, ২০১৩); পাগার (জলময় গর্ত), পাগল, পেট (রায়, ১৪১২); পান (সুর, ১৯৯৪)।

ফ: ফল (শহীদুল্লাহ, ১৯৮১); ফাল (সম্পা. মুসা, ১৯৯৪); ফুল (সরকার, ২০১৩)।

ব: বালিশ, বৃক্ষ, বাদুড়, বতক (হাঁস) (হক, ২০১৮); বাটনা (সম্পা. মুসা, ১৯৯৪); বেটা ছেলে (বিশ্বাস, ২০১৯); বেগুন, বাঁশ, বাসি, বোয়াল (রায়, ১৪১২); বরজ (পানের বাগান) (হক, ২০১৮)।

ভ: ভেড়া (সরকার, ২০১৩)।

ম: মুঠা, মই (সম্পা. মুসা, ১৯৯৪); মাঝি, মুড়ি (সরকার, ২০১৩); মেয়ে ছেলে (বিশ্বাস, ২০১৯)।

য: যাঁতা (কামাল ও অন্যান্য, ২০০৭)।

র: রিষ (সম্পা. মুসা, ১৯৯৪)।

ল: লগি (দাশ, ১৯৯৮); লাঙ্গল (শহীদুল্লাহ, ১৯৮১); লিঙ্গ (Burrow, 1973); লোটা, লেবু (সরকার, ২০১৩); লাউ (চক্রবর্তী, ১৩১৭)।

শ: শঙ্কা (সরকার, ২০১৩); শঙ্খধ্বনি (সুর, ১৯৯৪)।

স: সুপারি (সরকার, ২০১৩); সিঁদুর (সুর, ১৯৯৪)।

হ: হাল (সম্পা. মুসা, ১৯৯৪); হাতি, হরিণ, হাড় (সরকার, ২০১৩); হালি (সম্পা. সরকার, ২০১৮); হলুদ (রায়, ১৩১২)।

এছাড়া বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত টি/টা নির্দেশক অক্ষর সাঁওতালি টাং (t̲añ) বা টানের (t̲aner) থেকে এসেছে, যা প্রাগ্রসর জনগোষ্ঠীতে প্রভাব বিস্তার করেছে (সিকদার, ২০১১)।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

নওগাঁ জেলায় সাঁওতালদের ব্যবহৃত সাঁওতালি শব্দ প্রাগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, নওগাঁ জেলায় তথা দেশে বহুল প্রচলিত কিছু শব্দ আছে, যা সাঁওতালদের থেকে গৃহীত হয়েছে। বিশেষ করে আঠা (জোড়া দেওয়া), আকাট (মূর্খ), আলপনা, আখ, এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, কম্বল, কাদা, কাঁকড়া, কাক, কালিয়া (কলঙ্ক), কাশফুল, কুড়ি (২০), কামরাঙা, কলা, কলাগাছ, কোদাল, কুচা (কুচিয়া), কাঠা, কাপড়, কার্পাস, কানি (কাপড়ের ছেঁড়া অংশ), কুমড়া, কচু, করাত, কড়ি, কলি (চুন), খড়ম, খাড়ি (নদীর পাড়), খণ্ড, খরা, খোদা (খুড়া), খিল (অনাবাদি), খুটি, গছি (গুচ্ছ), গাড়া (গর্ত), গুড়, গণ্ডার, গড় (দুর্গ) গজ, চিংড়িমাছ, চালা, চাপরি (মাটির খণ্ড), চিরা (ভাগ করা), চুয়া (ঝরা) চাউল, জুয়া, জাম্বুরা, ঝুড়ি, ঝাঁপি, ঝগড়া, ঝাপড়ি, ঝাল, ঝোড়, ঠেঙ্গা, ঠ্যাং (হাঁটুর নিম্নাংশ), ঠোঁট, ডহর (মাটির রাস্তা), ডাল (বৃক্ষশাখা), ডাগর, ডালা (বাঁশের তৈরি), ডোঙ্গা (গুড়িকাঠের নৌকা), ডোম, ডালিম, ডুমুর, ঢাল, তাম্বল, তু তু (কুকুরকে ডাকা), দড়ি, দাঁড়, দাও (দা), ধামা, ধুরি, ধোপা, ধনুক, ধান, নারিকেল, পণ (চার কুড়ি), পাল, পাহাড়, পাথর, পটল, পাড়, পুঁটি, পাড়া পাগার (জলময় গর্ত), পাগল, পেট, পান, ফল ফাল ফুল, বালিশ, বৃক্ষ, বাদুড়, বতক (হাঁস), বাটনা, বেটা ছেলে, বেগুন, বাঁশ, বাসি, বোয়াল, বরজ (পানের বাগান), ভেড়া, মুঠা, মই, মাঝি, মুড়ি, মেয়ে, ছেলে, যাঁতা, রিষ, লগি, লাঙ্গল, লিঙ্গ, লোটা, লেবু লাউ, শঙ্কা, শঙ্খধ্বনি, সুপারি, সিঁদুর, হাল, হাতি, হরিণ, হাড় হালি, হলুদ প্রভৃতি। এছাড়া বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত টি/টা নির্দেশক অক্ষর সাঁওতালি টাং (t̲añ) বা টানের (t̲aner) থেকে এসেছে, যা নওগাঁসহ অন্যান্য প্রাগ্রসর জনগোষ্ঠীতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

সুপারিশমালা

গবেষণা অঞ্চলের প্রাপ্ত তথ্য, প্রকাশিত রিপোর্ট, ব্যক্তিগত পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাঁওতাল জনগোষ্ঠী নওগাঁ জেলার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে সাঁওতালদেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কাজেই তাদের ভাষা সুরক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, যা দ্বারা আমাদের সমাজ উপকৃত হবে। নিম্নে সুপারিশমালা প্রদত্ত হলোঃ

ক. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তথা সাঁওতালদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা;
খ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করা;
গ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা;
ঘ. নওগাঁয় সাঁওতাল ভাষা বাঁচিয়ে রাখতে সাংস্কৃতিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা;
ঙ. সাঁওতালি ভাষার পাঠ্যবই প্রণয়ন ও অধিক হারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;

চ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা রক্ষার উদ্যোগ ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা;
ছ. সাঁওতালদের নিয়ে বিভিন্ন সময় সেমিনারের আয়োজন করা।

উপসংহার

বাংলাদেশে বহু জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির লোক বসবাস করে। এদেশের প্রাচীনতম ও প্রভাবশালী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালরা অন্যতম। সভ্যতার অগ্রগতি হলেও তারা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেদের ভাষা ধরে রেখে নওগাঁ জেলায় প্রাগ্রসর জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। গবেষণায় সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ভাষার সামগ্রিক চিত্র উঠে এসেছে। সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনের নানারকম শব্দ নানাভাবে নওগাঁ জেলাসহ বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় ইতিহাসে অবদান রাখবে বলে আশা করি। তাছাড়া এ গবেষণার মধ্য দিয়ে সাঁওতালদের সামাজিক অধিকার, স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি নওগাঁ জেলার মাটি ও মানুষের সাথে সাঁওতালদের নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হবে।

তথ্য-নির্দেশ

আহমদ (সম্পা.), মমতাজ উদ্দিন। (২০১১)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের মুরং উপজাতি*। প্রান্ত প্রকাশন: ঢাকা।

আলী, খন্দকার মোবারক। (২০০৭)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। নিউ বুক প্যালেসঃ ঢাকা।

আহমদ, ওয়াকিল। (১৯৯৪)। *'বাংলার লোক সংস্কৃতি: উৎস ও ঐতিহ্য'*, মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাংলাদেশ*। আগামী প্রকাশন: ঢাকা।

ইমাম, আলী। (২০১৩)। *মানুষের ইতিকথা*। সৃজনী: ঢাকা।

কামাল, মেসবাহ। (২০১৮)। আদিবাসী জাতিসত্তার আত্মপরিচয়। স্বরোচিষ সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তার আত্মপরিচয়*। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ: রাজশাহী।

কামাল, মেসবাহ ও অন্যান্য। (২০০৬)। *নিজভূমে পরবাসী উত্তরবঙ্গের আদিবাসীর প্রান্তিকতা ডিসকোর্স*। দিব্য প্রকাশ: ঢাকা।

খান (সম্পা.), সামসুজ্জামান। (২০২১)। *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা নওগাঁ*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। (২০০০)। *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস*। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন: ঢাকা।

ঘোষ, সতীশ চন্দ্র। (২০১৫)। *চাকমা জাতি জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত*। নবযুগ প্রকাশনী: ঢাকা।

চক্রবর্তী, রজনীকান্ত। (১৩১৭)। *গৌড়ের* ইতিহাস। সাহিত্য পরিষদ: রংপুর।

চৌধুরী, আনোয়ার উল্লাহ ও রশীদ, সাইফুর। (১৯৯৫)। *নৃবিজ্ঞান*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

চৌধুরী, মানস। (২০২১)। *জনসংস্কৃতি ও মধ্যবিত্ত*। আদর্শ: ঢাকা: ২০২১।

জলিল, মুহম্মদ আবদুল। (১৯৯১)। *বাংলাদেশের সাঁওতাল: সমাজ ও সংস্কৃতি*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

তরফদার, মমতাজুর রহমান। (১৯৯৫)। *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

দাশ, সত্যনারায়ণ। (১৯৯৩)। *বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ*। পুস্তক বিপণি: কলিকাতা।

দাশ, ক্ষুদিরাম। (১৯৯৮)। *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি: কলকাতা।

বিশ্বাস, অশোক। (২০১৯)। *বুনো সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি*। আপন প্রকাশ: ঢাকা।

মুখোপাধ্যায়, সুভাস। (১৯৮৩)। *বাঙালীর ইতিহাস*। নিউ এজ পাবলিশার্স: কলকাতা।

মুণ্ডা, কৃষ্ণপদ। (২০১৮)। মুণ্ডা জাতিসত্তার আত্মপরিচয়, স্বরোচিষ সরকার (সম্পা.), *বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তার আত্মপরিচয়*। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ: রাজশাহী।

মুরমু, মিথুশিলাক। (২০২০)। *সাঁওতালি লোকসাহিত্য*। বটেশ্বর বর্ণন: ঢাকা।

মোজাম্মেল, নাঈম। (২০০৯)। *ভাষা-সাহিত্য*। কথাপ্রকাশ: ঢাকা।

রায়, নীহাররঞ্জন। (১৪১২)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা।

শহীদুজ্জামান। (২০২০)। *সমাজ ভাষাবিজ্ঞান*। সাহস পাবলিকেশন্স: ঢাকা।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ। (১৯৮১)। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স: ঢাকা।

শাহনাওয়াজ, এ কে এম ও হেরেন ফাতেমা। (২০১৯)। *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত*। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা: ঢাকা।

সরকার, তপতী রানী। (২০১৩)। *বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার: অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর প্রভাব*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

সরেন, ষ্টেফান। (২০১২)। *বিপন্ন আদিবাসী কোল জনগোষ্ঠী*। নওরোজ কিতাবিস্তান: ঢাকা।

সাত্তার, আবদুস। (১৯৬৬)। *আরণ্য জনপদে*। জলি বুকস: ঢাকা।

সিংহ, রণজিত। (২০২০)। *বাংলাদেশের মণিপুরী ভাষা ও সাহিত্য*। আজকাল প্রকাশনী: ঢাকা।

সিকদার, সৌরভ। (২০১১)। *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা* । বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

সুর, অতুল। (১৯৯৪)। *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*। সাহিত্যলোক: কলকাতা।

সেন, সুকুমার। (২০০৪)। *ভাষার ইতিবৃত্ত*। আনন্দ: কলকাতা।

হক, মো: আজিজুল। (২০১৮)। *বাংলাদেশের সাঁওতাল সংস্কৃতির পরিবর্তন: ক্রিয়াশীল উপাদানের প্রভাব*। ফেয়ার প্লে পাবলিকেশন্স: ঢাকা।

হাসান, খন্দকার মাহমুদুল। (২০১৬)। *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*। তাম্রলিপি: ঢাকা।

হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর। (২০১৮)। *রংপুর বিভাগ ইতিহাস ও প্রত্নসম্পদ*। আহমদ পাবলিশিং হাউস: ঢাকা।

Burrow, T. (1973). *The Sanskrit Language*. Faber and Faber: London.

Chatterji, S. K. (1951). Race movement and Pre-historic Culture, R.C. Majumdar (ed.), *Vedic Age.* Bharatiya Vidya Bhavan: Bombay.

Choudhury, A. B. (1987). *The Santals: Religion and Rituals.* Ashish Publishing House: New Delhi.

Grierson, G. A. (1968). *Linguistic Survey of India 1903-1928*. Office of the Superintendent of Government: Calcutta.

ঢাকার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ভাষা-বৈচিত্র্য

রঞ্জনা বিশ্বাস*

Abstract: Linguistic variation across region can be attributed to factors such as geographical distance, migration, modes of communication, social structure, religion, occupation, and more. Furthermore, even within a single social group, variation in speech pattern can be observed due to occupational role, age, gender, temporal and spatial context, educational background, and socio-economic stratification. These linguistic differences manifest in phonological, lexical, and grammatical structures. Such internal and external variations contribute to the linguistic diversity within a speech community. Language variation emerges through multiple dimensions of change, and even among individuals engaged in the same profession, language use may vary depending on situational contexts. This study seeks to provide a concise analysis of linguistic variation and change with particular reference to the grammatical features and pragmatic use of language among sanitation workers in Dhaka.

মূলশব্দ (Keyword): পরিচ্ছন্নতাকর্মী (Sanitation worker), ইতিহাস (History), ভাষা বৈচিত্র্য (Linguistic variation), ব্যাকরণ কাঠামো (grammatical structures)

ভূমিকা

বাঙালি ছাড়াও বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে ৫০টি জাতিসত্তার মানুষ বাস করে। বাংলাদেশে বাসরত এই সব জাতিগোষ্ঠীর ৪১টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা রয়েছে [বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা: ভাষা (প্রথম খণ্ড), ২০১৮]। কিন্তু দেখা গেছে, এই সব নৃগোষ্ঠীর বাইরেও বাংলাদেশে আরো কিছু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের ভাষা ও সংস্কৃতি অন্যদের সাথে পার্থক্য সূচিত করে। এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলাদেশে বসবাসরত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ভাষা-সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্য। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বসবাসরত

---

* Ranjana Biswas, Poet and Researcher, email: biswas.ronjona@gmail.com

হাড়ি, ডোম, ডোমার, বাঁশফোড়, হেলা, বাল্মীকি, লালবেগী, রাউৎ, ধাঙড় ও তেলুগুদের সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে নৃভাষাবৈজ্ঞানিক কোনো গবেষণা নজরে আসেনি। অথচ ঐতিহাসিক নৃবিজ্ঞানের একটি বড়ো অংশ জুড়ে হাড়ি, ডোম, ডোমার, বাঁশফোড় ও তেলুগুদের উপস্থিতি আমরা লক্ষ করি। একসময় তাদের আলাদা সমাজ সংস্কৃতি সিভিলিয়ানদের আগ্রহের বিষয় ছিল। যে কারণে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম শুমারিতেও তাদের আলাদা জাতিগোষ্ঠী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে প্রায় দুশো বছরের অধিক সময় ধরে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে বসবাসের পরেও সরকার বা গবেষকগণ তাদের কোনো বিশেষ জাতিসত্তা হিসেবে চিহ্নিত করেনি। ফলে, তাদের ভাষার দিকটিও থেকে গেছে উপেক্ষিত। এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঢাকায় বাসরত ডোম, বাঁশফোড়, হেলা ও বাল্মীকি সম্প্রদায়ের ভাষা বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যে সম্পর্ক তা প্রতিষ্ঠিত হয় ভাষার মাধ্যমে। তাই ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেন ভাষাবিদ পিটার ট্রুডগিল, এক. ভাষা সমাজে সম্পর্ক স্থাপন করে; দুই. ভাষা বক্তার সংজ্ঞাপন বহনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে (Trudgill, 1988: 14)। পিটার ট্রুডগিল এই দুটো বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয় বিষয়টির প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কেননা, তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমেই মানুষ সমাজকে গতিশীল রাখে, সমাজের সাথে মানুষের বন্ধন শক্তিশালী হয়। সম্ভবত একারণেই বলা হয়, সমাজের চালিকা শক্তি হচ্ছে ভাষা। সম্ভবত এই কারণেই ডেভিড ক্রিস্টাল মানুষকে কেবল 'প্রজ্ঞাবান মানুষ বলেই আখ্যায়িত করেননি, তিনি তাকে 'বাঙময় মানুষ' বলে স্বীকার করেছেন (Crystal, David 1971 : 8)। গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের আঞ্চলিক, সামাজিক বা জাতিগত এবং তাদের লৈঙ্গিক বিষয়গুলিকে প্রতিফলিত করে; এছাড়া ব্যক্তির কথা বলার নির্দিষ্ট উপায় বা ধরন, শব্দ নির্বাচন এমনকি কথোপকথনের নিয়মগুলি মূলত কিছু সামাজিক প্রয়োজনীয়তা দ্বারা নির্ধারিত হয় (Wardhaugh, Ronald 2002: 13)। যেহেতু এই প্রবন্ধে আলোচনার মূল বিষয় *ঢাকার পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের ভাষা বৈচিত্র্য* এই কারণে আমাকে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বিশেষ গোত্রের ভাষার (জাতিরও) উৎস সন্ধান করতে ঐতিহাসিক সমাজ নৃবিজ্ঞানীদের লেখা পাঠ করতে হয়েছে। আবার ভাষাসমূহের রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য প্রয়োজন হয়েছে সংশ্লিষ্ট ভাষিক উপাত্ত সংগ্রহের। উপাত্ত সংগ্রহের উৎস ছিল দুটি– ক. প্রাথমিক উৎস (ডোম, বাঁশফোড়, হেলা, রবিদাস ও বাল্মীকিদের ব্যাবহারিক ভাষা) ও খ. দ্বৈতীয়িক উৎস (মান ভাষার জন্য নির্ধারিত গ্রন্থ)। এই প্রবন্ধে নির্ধারিত জাতিগোষ্ঠীর ব্যাবহারিক ভাষার রূপবাক্যতাত্ত্বিক দিকটি তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ইতিহাস

বাংলাদেশে বাঁশফোড়, ডোম, হাড়ি, হেলা, ডোমার, বাল্মীকি, লালবেগী, রবিদাস, ধাঙড়, তেলুগু ও রাউৎ সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবেই কাজ

করেন। তাদের বসতি এলাকাকে সুইপার কলোনি বলা হয়। তারা মূলত সরকারিভাবে তৈরি নির্ধারিত বাসভবনে বাস করে। বাংলাদেশে অধিকাংশ জেলা শহরেই তারা বাস করে। তবে তারা ঢাকার মিরনজুল্লাহ, ওয়ারি, সূত্রাপুর, পোস্তগোলা, কোর্ট কাছারি, মালিটোলা, বাবু বাজার, গোপীবাগ, বাসাবো, বরফা, লালবাজার মিডফোর্ট স্টাফ কোয়ার্টার, গনকটুলিসহ ঢাকার বিভিন্ন সুইপার কলোনিতেই বেশি বসবাস করে। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৪০ সালের আগে পরে এদেরকে ভারতের উত্তর প্রদেশ, এলাহাবাদ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, চণ্ডীগড়, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হয়। এই পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা বাল্মীকি, বেদার, বয়া, ভাঙ্গী, মহাদেবকলি, মেহতার, নায়েক নামে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পরিচিত। তবে ভারতের সর্বত্র তাদের মূল নাম ভাঙ্গী, যার অর্থ যিনি গাঁজা সেবন করেন। ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে লালবেগী ও বাল্মীকিরা সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রায় অভিন্ন। উত্তর ভারতে বাল্মীকি সম্প্রদায় নিজেদের ভাঙ্গী জাতির লোক বলে পরিচয় দেয়। উত্তর প্রদেশ ও বিহারে ভাঙ্গীরা ৬-৭টি শাখায় বিভক্ত। সেখানে তারা ভারতের প্রাচীন ধর্ম পালন করে থাকে। পাকিস্তানে বাসরত ভাঙ্গীরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। ১৯৭১-এ দেশ স্বাধীনের আগে বাংলাদেশের সকল গোত্রের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের ভাঙ্গী বলে ডাকা হতো বলে জানান সাক্ষাৎকারদাতারা। বাল্মীকিদের ভাঙ্গী, চুহড় এবং লালবেগী বলা হয় (Sing, 1994: 33)। ১৯৩১ সালে ভারতীয় শুমারিতে চুহড়রা নিজেদের 'হিন্দু বাল্মীকি' হিসেবে নথিভুক্ত করে। হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশে এরা পরিচ্ছন্নতা কর্মীর কাজ করে থাকে। শুমারির রিপোর্টে ডোম, ডোমার, ভুঁইমালী, ডিমাপুরী, রাওয়াত, লালবেগী, বাল্মীকি, বাঁশফোড় হেলা ও অন্যান্য জাতিকে একত্রে ভাঙ্গী হিসেবে গণনা করা হয়। পাঞ্জাবে চুহড়রা লালবেগী ধর্ম অনুসরণ করে (দাস, ২০০২: ১৭)। ১৮৮১, ১৯৩১ ও ১৯৮১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বেদরদের বাল্মীকি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৩৫ সালে পাঞ্জাব প্রদেশে তফসিলি জাতি হিসেবে বাল্মীকি নামটি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায় (দাস, ২০০২: ১৮)। এরপর ১৯৫০ সালে ভারতের ৪টি রাজ্যে বাল্মীকি, ৬টি রাজ্যে লালবেগী ও ৬টি রাজ্যে হালালখোর নামে তারা তালিকাভুক্ত হয়েছে (দাস, ২০০২: ১৮)। অনেক নৃতত্ত্ববিদ বাল্মীকিদের ভাঙ্গী, বারি, ডুমরা, ডোম, হেলা, খাড়ি, মেহতার, মুসহার ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করেছেন (Pattanayak & Dash, 2020)।

প্রায় দেড় দুশো বছর ধরে তারা একই এলাকায় একত্রে বসবাস করলেও তাদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতিতে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। উদাহরণস্বরূপ, মিরনজুল্লাহর সুইপার কলোনিতে বাসরত ডোমার, লালবেগী, হেলা, বাল্মীকিদের ভাষা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, এক গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর ভাষার বেশ পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য তাদের গোত্রে গোত্রে সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্যহেতু যেমন সূচিত হয় তেমনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বসবাসের ফলেও এই পার্থক্য ক্রিয়াশীল হয়েছে।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সমাজ সংস্কৃতি

বাংলাদেশে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের একটি অংশ হরিজন হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়। বাঁশফোড়, হেলা, ডোম, বাল্মীকি, লালবেগী, হাড়ি, ডোমার এবং রাউৎ হচ্ছে হরিজনদের অন্তর্ভুক্ত আটটি গোত্র যারা নিজেদের হরিজন হিসেবে পরিচয় দেয়। এর বাইরে তেলেগু, রবিদাস ও ধাঙড়রাও পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের রয়েছে নিজ নিজ সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা পরিচয়। প্রতিটি গোষ্ঠীর সদস্য তাদের নামের শেষে গোষ্ঠীবাচক শব্দটি পদবি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। যেমন:

ক. পান্নালাল বাঁশফোড়
খ. গণেশ চন্দ্র বাঁশফোড়
গ. ছবিলাল বাল্মীকি
ঘ. সবুজ বাল্মীকি
ঙ. কিশোর কুমার হেলা
চ. সুধামা হেলা
ছ. বিমল ডোম
জ. রাজালাল ডোম
ঝ. পবন দাস ডোমার
ঞ. গজনলাল ডোমার
ট. চরণদাস হাড়ি
ঠ. কুঞ্জলাল হাড়ি
ড. রাখালদাস লালবেগী
ঢ. সুভাষ লালবেগী
ণ. রবি রাউৎ
ত. পঞ্চলাল রাউৎ
থ. সুবলকৃষ্ণ রবিদাস
দ. বিলাস রবিদাস।

এদের মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কম-বেশি পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করে থাকে। মহিলাদের নামের ক্ষেত্রে তাদের গোষ্ঠী পদবির ব্যবহার বিরল। তারা তাদের নামের সাথে শুধু ‘রানী’ ব্যবহার করে থাকে। যেমন:

ক. কাজল রানী
খ. সোনেকা রানী,
গ. শ্রুতি রানী।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আটটি গোত্র নিজেদের হরিজন পরিচয় দিলেও সামাজিকভাবে তাদেরকে হিন্দু হিসেবেই শনাক্ত করা হয়। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি প্রচলিত হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা। তারা অনেকাংশেই প্রকৃতিবাদী ধর্মের অনুশীলন করে। তাদের নিজস্ব দেব-দেবী রয়েছে এবং এসব দেব-দেবী নিরাকার হয়ে থাকে। যেমনঃ বাংলাদেশের ডোম সমাজের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন- সিয়ামসাম, বাওয়াও আলা, মা গেহিল, বাবানাথ ইত্যাদি। বাঁশফোড়দের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন– বাহত-কালিকা, বাহত-মহাপ্রব, পিরু-তিয়া, লুক-কালিকা, সম্মে- কলিকা ইত্যাদি। হেলা সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন– ঘইরম বাবা, মারি মাতা, মাছুরিয়া মাই, সাহের বাবা ইত্যাদি। রবিদাসদের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন– পদ্মামাই, ছটপবনী, শীতলা মাই ইত্যাদি। বাল্মীকি সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন– নাগরসিং, কালকা, সেকসিদ্ধা বা মিয়াবাদশা প্রভৃতি। কাজেই দেখা যাচ্ছে একই পেশার অংশীদার হওয়ার পরেও তাদের প্রত্যেকের ধর্মবিশ্বাস যেমন আলাদা তেমনি আলাদা তাদের ভাষা। প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর ভাষার সাথে তার নিজ নিজ ধর্মের প্রসঙ্গটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। লালবেগী বা বাল্মীকি সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস হেতু তাদের ছেলেমেয়ের নামের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়টি লক্ষ করা যায়। যেহেতু তারা মুসলিম রীতিতে মিয়া-বাদশা বা শেখ সাদ্দ বাবার পূজা করেন তাই তাদের জীবনাচরণে ও ভাষায় কিছুটা মুসলিম রীতি লক্ষ করা যায়। যেমনঃ হেলা, লালবেগী ও বাল্মীকিরা মা-বাবাকে আব্বা-আম্মা বলে থাকে এবং বাকিরা বাবা-মাকে বাবা-মা-ই বলে থাকে।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ভাষা

বাংলাদেশে বসবাসরত বাল্মীকি, ডোম, হেলা ও বাঁশফোড়দের পূর্বপুরুষ ভারতের ওড়িশা, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত। ফলে সেই সব অঞ্চলের নিজস্ব ভাষাকে তারা এখানে দেশোয়ালি ভাষা বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তাদের এইসব দেশোয়ালি ভোজপুরি ও দেশোয়ালি হিন্দি ভাষায় আগে থেকেই যেমন কিছু আঞ্চলিক পার্থক্য ছিল, তেমনি দেড় দুইশ বছর ধরে বাংলাদেশে বসবাসের ফলে সেই আঞ্চলিকতার ওপর বাংলা ভাষা সংস্কৃতিরও একটি বিশেষ প্রভাব পড়েছে। এর ফলে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ভাষা সংস্কৃতিতে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের জন্য নির্দিষ্ট মাতৃভাষায় কথা বলে থাকে যা প্রতিটি গোত্রের ভাষার সাথে পার্থক্য সূচিত করে। ডোম, বাঁশফোড়, রবিদাস তাদের নিজেদের ভাষাকে ভোজপুরি বা ডোমাই ভাষা বলে থাকে। বাল্মীকি ও হেলারা তাদের ভাষাকে হিন্দি বলে দাবি করে থাকে। সেই বিচারে ডোম, বাঁশফোড়, রবিদাস, বাল্মীকি ও হেলাদের ভাষা উৎসগতভাবে ভারতীয় আর্য শাখাভুক্ত। ডোম, বাঁশফোড়

ও রবিদাসদের ভাষা তাদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মান ভোজপুরির সাথে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তা আলোচনার বিষয়। অন্য দিকে হেলা ও বাল্মীকিদের ভাষার ওপরও বাংলা ও অন্যান্য পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের ভাষার প্রভাব পড়েছে যার ফলে মান হিন্দিও সাথে তাদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যে কিছুটা বদল ঘটেছে। আবার ডোম, বাঁশফোড়, রবিদাস, হেলা ও বাল্মীকিরা দীর্ঘদিন একসঙ্গে বসবাস ও কাজ করার কারণে তাদের স্ব স্ব ভাষায় পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গোত্রের ভাষা থেকে আগত ধ্বনি, শব্দ ইত্যাদির গ্রহণ বর্জন চলেছে। ফলে তাদের নিজ নিজ গোত্র ভাষায় শব্দের ধ্বনি উচ্চারণ প্রবণতা ক্রিয়াপদের রূপগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যই একটি ভাষাকে যেমন বৈচিত্র্যময় করতে পারে, আবার এই বৈচিত্র্য প্রবল হয়ে উঠলে ভাষাটি উৎসগত ভাষা থেকে পরিবর্তিত হয়ে স্বতন্ত্র একটি ভাষায়ও রূপান্তরিত হতে পারে। ঢাকার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ভাষার রূপান্তর কতটা বৈচিত্র্যময় বা তা কতটা স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে উঠেছে এ নিয়ে এখনও ভাষাতাত্ত্বিক কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি।

এই প্রবন্ধে আমরা কেবল ঢাকার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে ডোম, হেলা, বাঁশফোড়, রবিদাস ও বাল্মীকি জনগোষ্ঠীর ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করতে চাই। তাদের ভাষার যে রূপ তা বোঝার জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু বাক্য ও বাক্যের অর্থের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হলো:

টেবিল-১

বাংলা	হিন্দি	ডোম	বাঁশফোড়	হেলা	বাল্মীকি	বিদাস
আমি ভাত খাই	মে চাওয়াল খাতা হুঁ/ খাতি হুঁ	হম্ ভাত খাতানি	হম্ ভাত খাতানি	মে ভাত খারোহ্	হম্ ভাত খারো	হম্ ভাত খাইলা
আমি ভাত খেয়েছিলাম	মে চাওয়াল খাতা থা	হম্ ভাত খায়রিহা	হম্ ভাত খায়লেবাণী	মে ভাত খালিয়ে	হম্ ভাত খায়া থা	হম্ ভাত খয়নিও
তুমি কেমন আছ?	তুম ক্যায়সে হো?	তু কেইছন বারো?	তু কেইছন বারো?	তুম কেয়সা হা?	তুম কেয়সে হো?	তু কেওসন বারো?
আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব	মে চাওয়াল খাকে স্কুল যাউঙ্গা	হম ভাত খায়েকে স্কুলমে যায়েব।	হম ভাত খায়েকে স্কুলমে যায়েব।	মে ভাত খাকে স্কুলমে যায়েংগি।	হাম্ ভাত খায়েংগে স্কুলমে যায়েংগে।	হম্ ভাত খাকে স্কুলমে যায়েব।

রোদে রোদে ঘুরো না।	ধুপ ম্যাঁ না ঘুমেঁ	ঘামমে ঘামমে নত ঘুরেব্।	ঘামমে ঘামমে নত ঘুরেব।	ধুমমে মাত ঘুর।	ধুমমে ঘুর মাত।	ঘামমে মাত ঘুরেব।

অর্থাৎ টেবিল-১ এ দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা ভাষা ও মান হিন্দি ভাষার সাথে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। এছাড়া একই পেশাজীবী হওয়ার পরও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পৃথক পৃথক গোত্র ভাষায় পার্থক্য যেমন আছে তেমন কিছু সাদৃশ্যও আছে। যেসকল পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পূর্বপুরুষ ভারতের ভোজপুর অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, তাদের ভাষায় ভোজপুরি ভাষার প্রভাব রয়েছে। ডোম, বাঁশফোড় ও রবিদাসদের ভাষায় কিছু ভোজপুরি ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে, যারা হিন্দি প্রভাবিত এলাকা থেকে এসেছিলেন, তাদের ভাষায় হিন্দির প্রভাব রয়েছে যেমন: হেলা ও বাল্মীকিদের ভাষায়। এছাড়া পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা বাংলাভাষীর সাথে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাদের নিজস্ব ভাষার উপর বাংলা ভাষারও বেশ ছাপ পড়েছে। বর্তমানে লেখাপড়ার প্রয়োজনে অনেককেই কম বেশি বাংলা শিখতে ও বলতে হয়। ফলে, পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শিশুদের বাংলা ভাষার সাথে আবশ্যিকভাবে পরিচয় ঘটছে। ফলে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে ভাষিক পার্থক্য ও জটিলতা লক্ষ করা যায়। এই জটিলতা বেশি লক্ষ করা যায় বাক্যের ক্রিয়াপদে।

কাল, লিঙ্গ ও ক্রিয়ার ব্যবহার

হেলা ও বাল্মীকি জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের ভাষাকে হিন্দি বলে উল্লেখ করেন। দেখা যায়, তাদের ভাষায় ক্রিয়া পদের পরিবর্তন হিন্দি ভাষার অনুরূপ রীতি অনুসরণ করলেও সর্বত্র মান হিন্দির ব্যাকরণবিধি মানে না। হিন্দি ভাষায় উত্তম পুরুষের এক বচনে মে/মেনে/হম ব্যবহারের প্রচলন থাকলেও তা মূলত বিশেষ ব্যাকরণ রীতি মেনে ব্যবহৃত হয়; যেমন: সাধারণ বর্তমান কালে ছেলে ও মেয়ে উভয় ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষে মে বসতে পারে এবং এক্ষেত্রে ক্রিয়াপদে লিঙ্গ অনুসারে পরিবর্তন সাধিত হয় [খাতা হু/খাতি হি] আবার বাক্যে হম বসলে ক্রিয়াপদের শেষে নারী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রে [খাতা হে/খাতি হে] বসে, কিন্তু কাল অনুসারে সকল বাক্যে উত্তম পুরুষে মে বা হম বসে না। যেমন: সাধারণ বর্তমান, ঘটমান অতীত ও সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে উত্তম পুরুষের এক বচনে সব সময় মে; ঘটমান বর্তমান, সাধারণ অতীত ও পুরাঘটিত অতীত কালে সবসময় মেনে বসে (Agnihotri, 2006)। কিন্তু হেলা ভাষায় কাল, লিঙ্গ নির্বিশেষে উত্তম পুরুষের সর্বনামে মে বা হম ব্যবহৃত হয়। বাল্মীকিরা কাল লিঙ্গ নির্বিশেষে উত্তম পুরুষের সর্বনামে মে-এর ব্যবহার কম করে, তারা সব ক্ষেত্রে হম ব্যবহার করে থাকে।

তবে হিন্দি ভাষায় লিঙ্গানুসারে ক্রিয়াপদের যে পরিবর্তন রীতি তা হেলা ও বাল্মীকি ভাষায় সবসময় একইভাবে লক্ষ করা যায় না। যেমন: হিন্দি ভাষায় বর্তমান

কালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ বাল্মীকি বা হেলা ভাষায় ব্যবহৃত না হয়ে হিন্দি ভাষার ঘটমান বর্তমানের ক্রিয়ার রূপকে অনেকাংশে অনুসরণ করে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাল্মীকি ও হেলা ভাষায় হিন্দি ভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

টেবিল-২(ক)

<table>
<tr><th>বাংলা</th><th>হিন্দি</th><th>হেলা</th><th>বাল্মিকী</th></tr>
<tr><td>আমি ভাত খাই</td><td>ছেলে: মে চাওয়াল খাতা হু
মেয়ে: মে চাওয়াল খাতি হি
ছেলে: হম চাওয়াল খাতা হে
মেয়ে: হম চাওয়া খাতি হে</td><td rowspan="2">মে ভাত খারোহ</td><td rowspan="2">হম ভাত খারো</td></tr>
<tr><td>আমি ভাত খাচ্ছি</td><td>ছেলে: মে চাওয়াল খা রাহা হু
মেয়ে: মে চাওয়াল খা রহি হু</td></tr>
<tr><td>আমি ভাত খেলাম</td><td>ছেলে: মেনে চাওয়াল খায়া
মেয়ে: মেনে চাওয়াল খায়ি</td><td rowspan="2">মে ভাত খালিয়ে</td><td rowspan="2">হম ভাত খায়া থা</td></tr>
<tr><td>আমি ভাত খেয়েছিলাম</td><td>ছেলে: মেনে খায়া থা
মেয়ে: মেনে খায়ি থি</td></tr>
<tr><td>আমি ভাত খাব</td><td>ছেলে: মে চাওয়াল খাউঙ্গা
মেয়ে: মে চাওয়াল খাউঙ্গি</td><td rowspan="2">মে ভাত খাউংগি</td><td rowspan="2">হম ভাত খাংগে</td></tr>
<tr><td>তুমি ভাত খাবে</td><td>ছেলে: তুম ভাত খাওগে
মেয়ে: তুম ভাত খাওগি</td></tr>
</table>

তবে হিন্দি ভাষায় লিঙ্গবাচকতার নিরিখে ক্রিয়াপদ যেভাবে পরিবর্তিত হয়, হেলা ও বাল্মীকি ভাষায় লিঙ্গবাচকতার নিরিখে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। এখানে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রীতির মান্যতা লক্ষ করা যায়।

হিন্দি ভাষার মতো হেলা ও বাল্মীকি ভাষায় সাধারণ অতীত ও ঘটমান অতীতের ভেতর কোনো পার্থক্য করা হয় না। তবে হেলা ভাষায় অতীতকালের ক্রিয়াপদে ধাতুর সাথে সম্পূর্ণ নতুন প্রত্যয়-লিয়ে যুক্ত করা হয় [মে খালিয়ে]। কিন্তু বাল্মীকি ভাষায় সাধারণ অতীত ও পুরাঘটিত অতীতের এক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্বিশেষে হিন্দি ভাষার পুরাঘটিত অতীতকালের পুরুষবাচকে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদকে অনুসরণ করে থাকে [হম খায়া থা]। আবার হেলা ভাষায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভবিষ্যৎ কালে হিন্দি ভাষার নারীবাচক ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় [মে খাউংগি] আর বাল্মীকি ভাষায় ভবিষ্যৎ কালে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হিন্দি ভাষার মধ্যম পুরুষে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদকে অনুসরণ করে থাকে [হম খাওগে > খাংগে] ।

টেবিল-২(খ)

বাংলা	হিন্দি	বাল্মিকী	হেলা
আমি ভাত খেয়েছিলাম	মেনে চাওয়াল খায়া থা	হাম্ ভাত খায়া থা	মে ভাত খালিয়ে
আমরা ভাত খেয়েছিলাম	হমলোগোন চাওয়াল খায়া থা	হামলোগ ভাত খায়া থা	হামলোগ ভাত খালিয়ে
তুমি ভাত খেয়েছিলে	তুম চাওয়াল খায়ে থে	তুম ভাত খায়ো থো	তুম ভাত খালিয়ে
তোমরা ভাত খেয়েছিলে	তুমলোগোন চাওয়াল খায়ে থে	তুমলোগ ভাত খায়ো থো	তুমলোগ ভাত খালিয়ে
সে ভাত খেয়েছিল	বো/ওহ্ চাওল খায়া থে	উ ভাত খাইস থা	তে ভাত খালি
তারা ভাত খেয়েছিল	উনলোগোনে চাওয়াল খায়া থা	উলোগ ভাত খাইস থা	ওলোগ/ তেলোগ ভাত খাহসি

টেবিল-২(খ)-এ দেখতে পাই, অতীত কালে হেলা ভাষায় উত্তম পুরুষে একবচন ও বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে ***-লিয়ে*** প্রত্যয় এবং প্রথম পুরুষের একবচনে ***-লি*** এবং বহু বচনে ***-হসি*** প্রত্যয় যুক্ত হয়। অন্যদিকে বাল্মীকি ভাষায় অতীতকালে উত্তম পুরুষে একবচন ও বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে ***-য়া থা,*** যুক্ত হয়। আর মধ্যম পুরুষের একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ***-য়োথো*** এবং প্রথম পুরুষের উভয় বচনে ***-ইসথা*** প্রত্যয় যুক্ত হয় যা মান হিন্দি ভাষার রীতি অনুসরণ করে না।

হিন্দি ভাষায় বচন, লিঙ্গ, ব্যক্তি ও ব্যক্তির সামাজিক সম্মানবাচকতার নিরিখে মধ্যম ও প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের রূপ যেভাবে পরিবর্তিত হয়, হেলা ও বাল্মীকিদের ভাষার ক্রিয়াপদের রূপ সবসময় একইভাবে পরিবর্তিত হয় না । হিন্দি ভাষায় অতীতকালে ***খা*** ক্রিয়াপদটি নারী ও পুরুষ ভেদে ***খায়া থা/খায়ি থি*** হয় কিন্তু উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরষের এক ও বহুবচন নির্বিশেষে ***খায়া থা*** হয় (Agnihotri, 2006)। বাল্মীকি ভাষার ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষে নারী-পুরুষ, একবচন ও বহু বচন নির্বিশেষে ***খায়া থা*** ব্যবহৃত হয় এবং মান হিন্দি রীতি অনুসারে উত্তম পুরুষের এক বচনে ***মেনে*** ও বহুবচনে ***হমলোগোনে*** ব্যবহার করে না বাল্মীকিরা। এছাড়া সাধারণ অতীত ও পুরাঘটিত অতীতকালের মধ্যম পুরুষের এক ও বহু বচনে ***খা*** ক্রিয়াপদটি পরিবর্তিত হয়ে ***খায়ো থা*** এবং প্রথম পুরুষের এক বচন ও বহু বচনে পরিবর্তিত হয়ে হয় ***খাইস থা*** হয়। অন্যদিকে হেলা ভাষায়ও সাধারণ অতীত ও পুরাঘটিত অতীতের ক্ষেত্রে এই ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। হেলা ভাষার ক্ষেত্রে উত্তম ও মধ্যম পুরুষে নারী-পুরুষ, একবচন ও বহু বচন নির্বিশেষে ***খালিয়ে*** ব্যবহৃত হয় এবং মান হিন্দি রীতি অনুসারে উত্তম পুরুষের এক বচনে ***মেনের*** স্থলে ***মে*** ও বহুবচনে ***হমলোগোনে***-এর

পরিবর্তে বাল্মীকিদের মতো হেলারা ***হামলোগ*** ব্যবহার করে। এছাড়া হেলারা সাধারণ অতীত ও পুরাঘটিত অতীতকালের প্রথম পুরুষের এক বচনে ***খালি*** এবং বহু বচনে ***খা হসি*** ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে যা মান হিন্দির সাথে পার্থক্য সূচিত করে।

অন্যদিকে, সাধারণ অতীত ও পুরাঘটিত অতীতকালে ডোম ভাষায় উত্তম পুরুষে একবচন ও বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে ***-রিহা*** প্রত্যয় যুক্ত হয়। আর মধ্যম ও প্রথম পুরুষের একবচন ও বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে যেমন ***-রাহা, -রেহে*** প্রত্যয় যুক্ত হয় তেমনি ভোজপুরি ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে লিঙ্গবাচকতার নিরিখে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন সাধিত হয়। আবার সাধারণ অতীত ও পুরাঘটিত অতীত কালে বাঁশফোড় ভাষায় উত্তম পুরুষে একবচন ও বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে ***-নি, -ইনি, -তানি, -রনি*** প্রত্যয় যুক্ত হয়। আর মধ্যম পুরুষের একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ***-রাহা, -লিস, -লে, -লঅ, -ইলু*** এবং প্রথম পুরুষের একবচন ও বহুবচনে ***-রেহে, -লাক, -ইলস, -ইলে, -ইল; -ইলান, -ইলেন, -ইলে -রলোসন*** প্রত্যয় যুক্ত হয়। এই সকল প্রত্যগুলো ব্যক্তি, লিঙ্গ ও ব্যক্তির সম্মানের স্তরভেদে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। তারা তাদের ভাষায় সাধারণ অতীত ও পুরাঘটিত অতীতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করে না।

কিন্তু রবিদাসীয়া নাগরী ভাষায় পুরাঘটিত অতীত কালে বাক্যের শেষে একবচনে ***-নিও/অ, -লহ*** এবং বহুবচনে ***-নিও সো, -লহ সো/সন*** যুক্ত হয়। তারা সাধারণ অতীত ও পুরাঘটিত অতীকালের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করে না।

নিচে মান ভোজপুরি ভাষায় অতীতকালের বাক্যগঠন প্রণালির সঙ্গে ডোম, বাঁশফোড় ও রবিদাসদের ভাষার বাক্যগঠন রীতি উপস্থাপন করা হলো:

টেবিলে–৩(ক)

বাংলা	ভোজপুরি	ডোম	বাঁশফোড়	রবিদাস
আমি ভাত খেয়েছিলাম।	হম বাত খাইনি	হম্ ভাত খায়রিহা	হম্ ভাত খায়রনি/ খাইনি	হম ভাত খয়নিও
আমরা ভাত খেয়েছিলাম।	হমনি কা বাত খইনি	হম্নি ভাত খায়রিহা	হম্নি ভাত খায়রনি(সন)	হমনিকে ভাত খয়নিওসো
তুমি ভাত খেয়েছিলে।	তু /তে বাত খাইলঅ/খাইলিস	তে/তু ভাত খায় রাহা	তে/তু ভাত খায় খাইলিস/ খাইলঅ/ খাইল	তু ভাত খয়লহ
তোমরা ভাত খেয়েছিলে।	রোউয়াবাঁ বাত খাইলঅ/খাইলে রহল	তুলোগ ভাত খায় রাহা	তুলোগ ভাত খায়রলোসন	তুহনিকে ভাত খয়লসো

সে ভাত খেয়েছিল	উ বাত খাইলস/ খাইলে	উ ভাত খায় রেহে	উ ভাত খায় রেহে/খায়লাক/ খাইলস	হু ভাত খয়লহ
তারা ভাত খেয়েছিল	ওলোগ বাত খাইলে	উলোগ ভাত খায়রেহে	উলোগ ভাত খায়রলোসন/ খাইলান/ খাইলেন	হুকনিকে ভাত খয়লহসো

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের গোত্রভিত্তিক ভাষার এই রূপের পার্থক্য নির্দেশ করে তারা একই পেশায় নিয়োজিত থাকলেও তাদের প্রত্যেকেরই গোত্রভিত্তিক ভাষা আলাদা আলাদা। ডোম ও বাঁশফোড় জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের ভাষাকে ভোজপুরি বলে উল্লেখ করে। রবিদাস সম্প্রদায় নিজেদের ভাষাকে নাগরী বললেও তা মূলত ভোজপুরি প্রভাবিত। দেখা যায়, তাদের ভাষায় ক্রিয়াপদের পরিবর্তন ভোজপুরি ভাষার অনুরূপ রীতি অনুসরণ করে। ভোজপুরি ভাষায় বচন, লিঙ্গ, ব্যক্তি ও ব্যক্তির সামাজিক সম্মানবাচকতার নিরিখে মধ্যম ও প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের রূপ যেভাবে পরিবর্তিত হয় ডোম ও বাঁশফোড়, রবিদাসদের ভাষার ক্রিয়াপদের রূপ একই ভাবে পরিবর্তিত হয়। ভোজপুরি ভাষায় অতীতকালে ***খা*** ক্রিয়াপদটি উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরষের এক ও বহুবচনে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ***খাইনি*** হলেও ডোমরা এ ক্ষেত্রে ***খায়রিহা*** শব্দটি ব্যবহার করে যা মূলত মান হিন্দি ভাষায় ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীতকালের ক্রিয়ারূপের অংশবিশেষ। হিন্দি ভাষায় ঘটমান অতীত কালের উত্তম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের একবচনে ***খা রাহা থা*** এবং সাধারণ বর্তমান কালের উত্তম ও প্রথম পুরষের একবচনে ***খা রাহা হু/ খা রাহা(রহি) হে*** ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণ অতীত ও পুরাঘটিত অতীতকালের জন্য উত্তম পুরুষের এক ও বহু বচনে বাঁশফোড়রা ***খাইনি/ খাইরনি*** এবং রবিদাসরা ***খয়নিও*** ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে থাকে, যা মান ভোজপুরির সাথে কিছুটা পার্থক্য বা সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। ভোজপুরি ভাষায় মধ্যম পুরুষে জুনিয়রদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একবচনে ***-লিস*** যুক্ত হয়, যথা- ***খাইলিস*** এবং বহুবচনে ***-ইলে*** যুক্ত হয় যথা- ***খাইলে***; পুরুষের ক্ষেত্রে উভয় বচনে ***-লঅ*** যুক্ত হয়, যথা- ***খাইলঅ***; নারীর ক্ষেত্রে উভয় বচনে ***-লু*** যুক্ত হয় যথা- ***খাইলু*** ।

ডোম, বাঁশফোড়দের ভাষায়ও ভোজপুরির অনুরূপ ক্রিয়াপদের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ডোম ভাষায় মধ্যম পুরুষে জুনিয়র নারী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রে একবচনে ক্রিয়াপদের সাথে ***‘-লিস’*** যুক্ত হয়; **তু ভাত খাইলিস**- তুই ভাত খেয়েছিলি। বহুবচনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ক্রিয়াপদের সাথে ***‘-লে’*** যুক্ত হয়; র**তু ভাত খাইলে**- তোরা ভাত খেয়েছিলি।

অন্যদিকে, মধ্যম পুরুষে সমবয়সী পুরুষ বন্ধুদের ক্ষেত্রে ***‘-ইলঅ’*** যুক্ত হয়; **তু ভাত খাইলঅ**- তুমি ভাত খেয়েছিলে। মধ্যম পুরুষে সমবয়সী নারী বা বন্ধুর ক্ষেত্রে ***‘-ইলু’*** যুক্ত হয়; **তু ভাত খাইলু**- তুমি ভাত খেয়েছিলে।

একইভাবে, ভোজপুরি ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের মতোই ডোম, বাঁশফোড়দের ভাষায় প্রথম পুরুষে জুনিয়র পুরুষবাচকতার ক্ষেত্রে একবচনে ***-য়লাক/ -ইলস*** যুক্ত হয় এবং বহুবচনে ***-ইলান, -ইলেন, -ইলে*** যুক্ত হয়; **উ ভাত খায়লাক/খায়লস-** সে ভাত খেয়েছিল। **উলোগ ভাত খাইলান/খাইলেন/খাইলে-** তারা ভাত খেয়েছিল। প্রথম পুরুষে সমবয়সী পুরুষ বাচকতার ক্ষেত্রে একবচন ও বহুবচন নির্বিশেষে ***-ইলে, -ইল*** যুক্ত হয়; **উ ভাত খাইলে/ খাইল-** সে ভাত খেয়েছিল। প্রথম পুরুষ নারী হলে একবচন ও বহুবচন নির্বিশেষে ***-ইল*** যুক্ত হয়; **উ ভাত খইল**। লক্ষণীয় যে, ডোম, বাঁশফোড়, হেলা, বাল্মীকি ও রবিদাসরা হিন্দি ***চাওয়াল*** ব্যবহার না করে বাংলা বা ভোজপুরি ভাষার **ভাত** শব্দটি ব্যবহার করে।

শুধু বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে ডোম, বাঁশফোড় বা রবিদাসদের ভাষায় ভোজপুরি ক্রিয়ারূপ অনুসৃত হয় তাই নয়। বচনের ক্ষেত্রের এদের ভাষায় ভোজপুরি রীতি অনুসৃত হয়। ভোজপুরি ভাষায় বিশেষ্য পদের সঙ্গে ***-অন/ -বন*** প্রত্যয়যুক্ত করে বহুবচন করা হয়। এছাড়া সর্বনাম ও বিশেষ্য পদের সাথে সম্মানার্থে ***-লোগ*** এবং অসম্মানার্থে ***-সব*** যুক্ত করেও বহুবচনে রূপান্তরিত করা হয়; এছাড়া প্রাণীবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে ***-কুল*** প্রত্যয় যুক্ত হতে দেখা যায় (Lohar,2010:126-127)। ভোজপুরির মতো ডোম, বাঁশফোড় ভাষায় এক বচন থেকে বহুবচন করতে বিশেষ্য পদের শেষে ***-লোগ*** এবং 'সব' এর পরিবর্তে ***-অন/-সন/-বন*** প্রত্যয় যুক্ত হয়। এছাড়া প্রাণীবাচক বিশেষ্যের শেষে ***-কুল*** যুক্ত হয়। যেমন: ঘইলা (কলস)–ঘইলাঅন/ঘইলাসন (কলসগুলি); (মছরি (মাছ)–মছরিকুল (মাছগুলো); আদমী (মানুষ)– আদমীলোগ (মানুষগুলো)।

অন্যদিকে, রবিদাসদের ভাষায় বহুবচনের ক্ষেত্রে সর্বত্র ***-কুল*** যুক্ত করে বহুবচন করা হয়। যেমন- ঘইলা (কলস)– ঘইলাকুল (কলসগুলি); মছরি (মাছ)–মছরিকুল (মাছগুলো)।

বচনের ক্ষেত্রে রবিদাস, ডোম ও বাশঁফোড়দের আরো কিছু উদাহরণ দেখা যেতে পারে (বিশ্বাস, ২০২৩: ১২৩)-

টেবিল–৩(খ)

রবিদাসদের ভাষা একবচন	**রবিদাসদের ভাষা বহুবচন**	**ডোম-বাঁশফোড় একবচন**	**ডোম-বাঁশফোড় বহুবচন**
মছরি (মাছ)	মছরিকুল	মছরি	মছরিকুল
কওয়া (কাক)	কওয়াকুল	কৌয়া	কৌয়াকুল
ঘইলি (কলস)	ঘইলিকুল	ঘইলা	ঘইলাঅন/ঘইলাসন
আদমী (মানুষ)	ঢের আদমী	আদমী	আদমীলোগ
লেইকা (শিশু)	লেইকাকুল	লেইকা	লেইকাবন/লোগ

দোস্ (বন্ধু)	দোসকুল	দোস্ত	দোস্তলোগ
গাছি (গাছ কাটে যারা)	গাছিকুল	গাছি	গাছিসন
মোওগী (মহিলা)	মোওগীকুল	মেহ্রারু	মেহরারুঅন/লোগ
হাকিম (বিচারক)	হাকিমওয়াকুল	হাকিম	হাকিমলোগ
বহি (বই)	বহিকুল	কিতাব	কিতাব্অন

ভোজপুরি ভাষায় যেখানে বিশেষ্য পদের অসম্মানার্থে ***'সব'*** যুক্ত করে বহুবচনে রূপান্তর করা হয় এবং সম্মানার্থে ***'লোগ'*** ব্যবহার করা হয় সেখানে বাল্মীকি ভাষায় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 'সব' যুক্ত করে বহুবচনে রূপান্তরিত করা হয়। বাল্মীকি ভাষায় কেবল সর্বনাম বাচক শব্দের সাথে ***'লোগ'*** বিভক্তি যুক্ত করে বহুবচন করা হয় যা হিন্দির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বাল্মীকি ভাষায় প্রাণী-অপ্রাণী সকল ক্ষেত্রেই ***'সব'*** বিভক্তি যুক্ত হতে দেখা যায়, কিন্তু হিন্দি ভাষায় বিশেষ্যবাচক শব্দগুলোকে একবচন থেকে বহু বচনে রূপান্তরিত করতে বিশেষ প্রক্রিয়া মেনে চলতে হয়। বাল্মীকি ভাষায় সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় না। যেমনঃ মাচ্ছি (মাছ)– মাচ্ছিসব; কৌয়া (কাক) – কৌয়াসব; কালসি (কলস)– কালসিসব; আদমী (মানুষ)– আদমীসব; মুখিয়া (বিচারক)–মুখিয়াসব; আউরত (নারী)– আউরতসব; কিতাব (বই)–কিতাবসব। তুম (তুমি)–তুমলোগ (তোমরা); হাম (আমি)– হামলোগ (আমরা); ও/উ (সে)– উলোগ (তারা)।

হেলা ভাষার ক্ষেত্রেও হিন্দি ভাষার বচন রীতি মান্যতা পায় না। প্রায় সকল বিশেষ্যের ক্ষেত্রেই হেলা ভাষায় ***'বহুত'*** যুক্ত করে বহুবচনে রূপান্তরিত করা হয়। কেবল সর্বনাম বাচক শব্দের সাথে ***'লোগ'*** বিভক্তি যুক্ত করে বহুবচন করা হয়। হেলা ভাষায় প্রাণী-অপ্রাণী সকল ক্ষেত্রেই ***'বহুত'*** বিভক্তি যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমনঃ মাচ্ছি (মাছ)– বহুত মাচ্ছি; কৌয়া (কাক)– বহুত কৌয়া; কালসি (কলস)– বহুত কালসি; আদমী (মানুষ)– বহুত আদমী; সারর্দার (বিচারক)–বহুত সর্দার; আউরত (নারী)– বহুত আউরত; কিতাব (বই)– বহুত কিতাব। তুম (তুমি)–তুমলোগ (তোমরা); হাম (আমি)– হামলোগ (আমরা); ও/উ (সে)– উলোগ (তারা)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ঢাকার পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা তাদের ভাষাকে ভোজপুরি বা হিন্দি বলে দাবি করলেও তাদের তাদের ভাষা মূলত বাংলা, হিন্দি ও ভোজপুরি ভাষার একটি মিশ্রিত রূপ।

প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশ

দীর্ঘদিন ধরে ডোম-বাঁশফোড়-রবিদাস-হেলা-বাল্মীকিরা ঢাকার একই কলোনিত বাস করছে এবং একই পেশায় কাজ করছে। আবার বাংলাদেশে বসবাসের ফলে তাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথেও কথা বলতে হয়। ফলে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষারীতিতে বাংলার প্রভাব যেমন পড়েছে, তেমনি প্রভাব পড়েছে একে অপরের

ভাষার। গবেষকদের কেউ কেউ এই কারণে তাদের ভাষাকে সাদরি ভাষা বলে দাবি করতে চান। কিন্তু ডোম, হেলা, বাল্মীকি, বাঁশফোড় ও রবিদাসরা নিজেদের ভাষাকে কখনোই সাদরি ভাষা বলে মানতে সম্মত নয়। তারা নিজেদের ভাষাকে ভোজপুরি বা হিন্দি বলে দাবি করে, ভাষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও তাদের দাবিটিকে যৌক্তিক মনে হয়। ঢাকার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাতৃভাষা মান ভোজপুরি বা মান হিন্দির ভাষা রীতি অনুসরণ না করলেও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে তাদের এই দাবিকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। তাদের ভাষাকে সাদরি বলে দাবি করার মধ্য দিয়ে একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, যা একটি জনগোষ্ঠীর উপর তাদের বিশ্বাস বহির্ভূত ভাষা সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়ার মতো অপরাধ সংঘটিত হয়।

বাংলাদেশে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সংখ্যা আনুমানিক ৭ লক্ষের বেশি। তাদের মাতৃভাষাকে একটি মানক ভাষার সাথে তুলনা করে একে অ-মানক ভাষা বৈচিত্র্যের অধীনে চিহ্নিত করাও যেমন সমীচীন নয়, তেমনি মাতৃভাষার প্রশ্নে তাদের দাবিকে অস্বীকার করাও সমীচীন নয়। বরং পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাতৃভাষাকে একটি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা ও অধ্যয়নের ভেতর দিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পাশাপাশি তাদের ভাষার সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণারও প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া তাদের ভাষাগত ও সমাজকাঠামোর মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে তা নির্ণয় করার জন্য সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা জরুরি। কেননা সামাজিক কাঠামো মানুষের কথা বলার ধরনকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে ভাষার বৈচিত্র্য এবং ব্যবহারের ধরনগুলি শ্রেণি, লিঙ্গ ও বয়সের মতো সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তা বুঝতে সাহায্য করে সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়ন। এর পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাতৃভাষার নৃভাষাবৈজ্ঞিানিক অধ্যয়নও প্রয়োজন। এর ফলে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাতৃভাষার প্রশ্নে তাদের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় যেমন উদ্‌ঘাটিত হবে তেমনি ভাষা প্রশ্নে তাদের অবস্থানও স্পষ্ট হবে। আর এই কাজটি করার জন্য তাদের দাবির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে তাদের মাতৃভাষা প্রশ্নে নৃভাষাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরো বেশি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর আমাদের গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

উপসংহার

বাংলাদেশের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মাতৃভাষা যে ভাষা পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন বর্তমানে তাদের ভাষা সংখ্যাগুরু বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব, বিশ্বায়ন তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার, ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ভাষার সহদ্বান্দ্বিক অবস্থানসহ অন্যান্য অদৃশ্য আগ্রাসনের কারণে অনেকটাই হুমকির সম্মুখীন। বিশেষত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাতৃভাষা।

এই ঝুঁকি কমাতে তাদের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় শনাক্ত করা জরুরি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৫০ সালে ভারত সরকারের তফসিলি জাতি গণনার উদ্যোগকে আমরা অনুসরণ করতে পারি। আমরা জানি এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে ভারতে বাল্মীকি, ডোম, হেলা, বাঁশফোড় ইত্যাদি ৩০-এ সিডিউলড ট্রাইব হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ভারত সরকার ঘোষণা দিয়ে তাদের দুটি আলাদা বিভাগে গণনার কথা বলে। একটি হচ্ছে শিডিউলড কাস্ট (SC), অন্যটি হচ্ছে শিডিউলড ট্রাইব (ST)। শিডিউলড কাস্ট হচ্ছে অস্পৃশ্যতার সূত্রে চিহ্নিত জাতি বা বর্ণ। সিডিউলড ট্রাইবের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্তগুলো হচ্ছে–

ক) আদিম বৈশিষ্ট্য
খ) স্বতন্ত্র সংস্কৃতি
গ) ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা
ঘ) ব্যাপকভাবে সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগের সংকোচ
ঙ) পশ্চাদপদতা (পট্টনায়েক ও দাশ, ২০২০: ২০৯)।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বাসরত বাল্মীকি, ডোম, হেলা, বাঁশফোড় ও রবিদাসসহ অন্যান্য গোষ্ঠী চিহ্নিতকরণের কোনো নির্দিষ্ট সূত্র বা শর্ত পূরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি, এমনকি তাদের ভাষা শনাক্তকরণের প্রশ্নেও তাদেরকে নৃতাত্ত্বিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। কাজেই পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ভাষার বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের ভাষা বৈচিত্র্য অনুসন্ধান যেমন জরুরি, তেমনই ভাষার পারস্পরিক বোধগম্যতার মানদণ্ড প্রয়োগ করার ভেতর দিয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাতৃভাষা চিহ্নিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। কেননা, বোধগম্যতার মানদণ্ড দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের ভাষাটি কোনো উপভাষা নাকি সম্পূর্ণ আলাদা ভাষা।

তথ্য-নির্দেশ

জাহিদ, জাহাঙ্গীর আলম। (২০০৪)। *কুমারখাররি ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস*, বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

দাস, ভগবান। (২০০২)। *বাল্মিকী জয়ন্তি অউর ভাঙ্গি জাতি*: দিল্লি।

বিশ্বাস, রঞ্জনা। (২০২৩)। *ডোম জনগোষ্ঠীর ভাষা: ডোমাই ভোজপুরি*, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউ: ঢাকা।

সুর, অতুল । (২০০৮)। *বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন*, সাহিত্যালোক: কলকাতা।

Agnihotri, Rama Kant. (2006). *Hindi: An Essential Grammar*. Taylor & Francis Group, London and newyork.

[https://shiyazaadam.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/02/hindi-an-essential-grammar.]

Crystal, David. (1971). Linguistics. Pengin Books: Baltimor.

[https://www.researchgate.net/publication/274493104_Crystal_David_Linguistics_Penguin_Books_Ltd_Harmondsworth_Middlesex_and_Penguin_Books_Inc_Baltimore_Maryland_1971_267_ppPalmer_Frank_Grammar_Penguin_Books_Ltd_Harmondsworth_Middlesex_and_Penguin_Books.]

Lohar, G. T. (2010). A Grammer Of of Bhojpuri, phd. reg. No. 24/2010(January), Trivuban university, Nepal.

[Pdf.[https://www.academia.edu/45566555/A_GRAMMAR_OF_BHOJPURI_A_Dissertation_Submitted_to_the_Faculty_of_Humanities_and_Social_Sciences_of_Tribhuvan_University_in_Fulfillment_of_the_Requirements_for_the_Degree_of_Doctor_of_Philosophy_in_LINGUISTICS]

Pttanayak, Subrat Kalyan & Das Biswananadan. (2020). *An Ethnolinguistic Repositioning of Balmiki Language of Odisha: A Bibliographic Approsal*, Asian Language & Linguistics.

[https://www.researchgate.net/publication/346966868_An_Ethnolinguistic_Repositioning_of_the_Balmiki_Language_of_Odisha_A_Bibliographic_Appraisal]

Shyamlal . (1992) . *The Bhangi: A sweeper Cast Its Socio-economic partraitis,* Bombay Popular Prokashani: India .

Sing, K S. (1994). Haryana Anthropological Survey oF India, People of India. Vl-23, Monohar: New Dilhi.

Trudgill, Peter. (2000). Sociolinguistics: An Introduction to language and society, Penguin Books: London.[https://books.google.com.bd/books/about/Sociolinguistics.html?id=X7Y7DYlQu8QC&redir_esc=y]

Wardhaugh, Ronald. (2002). *An Introduction to Sociolinguistics.* Blackwell Publishing, Australia. [http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/34482/1/7.pdf]

তথ্যদাতা

আরতী রানী। পিতা: মতিলাল বাল্মীকি, মা: পার্বতীরানী, শিব বাড়ি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা।

কারান হেলা। পিতা: গোকুল হেলা, মাতা শান্তিরানী, ২৫ আগা সাদেক রোড মিরন জুল্লাহ সিটি কলোনী।

কিশোর কুমার হেলা। পিতা যোগী হেলা, মাতা: এতুয়ারানী, ২৫ আগাসাদেক রোড, মিরনজুল্লাহ সিটি কলোনি।

চরণদাস হেলা। পিতা কালুদাস হেলা, মাতাঃ আতোরবানু রানী, ২৫ আগা সাদেক রোড, মিরনজুল্লাহ সিটি কলোনি।

নরেশ বাঁশফোড়। পিতাঃ পরমেশ্বর বাঁশফোড়, মাতাঃ ভগবানীয়া , রূপালী হাউজিং, রোড ৩, কমার্স কলেজ, হরিজন কলোনি, মিরপুর-১।

পান্নালাল বাঁশফোড়। পিতাঃ গণেশচন্দ্র বাশফোড়, গ্রামঃ শেরকান্দি, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

ফুলচান রবিদাস। পিতাঃ গঙ্গাচরণ রবিদাস, মাতাঃ লগনীরানী, নীলক্ষেত, পলাশী রেলওয়ে কলোনি, ঢাকা।

বিমল ডোম। পিতাঃ সুবলাল ডোম, মাতাঃ সীতারানী ডোম, শ্যামপুর, পোস্তগোলা, শ্মশানঘাট ডোম কলোনি।

শরমনলাল ডোম। পিতাঃ মোহনলাল ডোম, মাতা : রাধারানী, গনকটুলি, হাজারিবাগ, ঢাকা।

সবিলাল বাল্মীকি, পিতাঃ শ্রী রণজিৎলাল বাল্মীকি, বয়সঃ ৪৫ বছর, শিব বাড়ি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা, সাক্ষাৎকারের সময় ও তারিখঃ ১৯শে এপ্রিল, ২০২৪।

সুধামা দাস হেলা। পিতাঃ রামনিহরে হেলা, মাতাঃ ফুলমতি রানী, ২৫ আগা সাদেক রোড, মিরনজুল্লাহ সিটি কলোনি।

সোমা রানী। পিতাঃ মোহন বাল্মীকি, মাঃ ইয়াসমীন রানী, শিব বাড়ি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা।

বিশ্বায়নে ভাষার উন্নয়ন ও অবনয়ন: জার্মান ভাষাপ্রসঙ্গ

রোজালীনা শ্যামা*

Abstract: Globalization in recent decades has led to growth and development in all aspects of human life worldwide, including global business, trade, employment, and communication. This development has also impacted the diversity and status of languages globally. Under the influence of globalization, the various languages of the world are constantly undergoing change. This article will help to better understand these complex effects of globalization on languages. This article discusses how the increased international, business, cultural, and digital communication resulting from globalization contributes to the promotion and expansion of languages. It examines also the challenges arising from the influence of dominant languages and other factors, including the increasing mixing of languages. Taking the German language as an example, this article explores whether a language in this era of globalization can simultaneously have opportunities for development and face the threat of decline, and if so, what the relationship is between these two opposing processes.

মূলশব্দ (Keyword): ভাষার উন্নয়ন (linguistic development), ভাষার অবনয়ন (linguistic degradation), ভাষার বিলুপ্তি (language extinction), ভাষানীতি (language policy), ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ (linguistic imperialism), ভাষাগত বৈচিত্র্য (linguistic diversity)

ভূমিকা

বিশ্বায়ন বলতে বিশ্বব্যাপী সমাজ, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির একীকরণ এবং আন্তঃসংযোগের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। একুশ শতকের বিশ্বায়ন আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই গভীর প্রভাব ফেলছে। ভাষার প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়ন বলতে আমরা বুঝি, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগুলির উপরে উপরিউক্ত প্রক্রিয়ার বিভিন্ন প্রভাব, যেমন–

* Rozalina Shayma, Lecturer, German Language, IML, University of Dhaka, shayma_rozlin@yahoo.com

জাতীয় সীমানার বাইরে ভাষার বিস্তার, প্রচার ও প্রসার, বিভিন্ন ভাষীদের মধ্যে বর্ধিত মিথস্ক্রিয়া, ভাষার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অথবা ভাষার বিলুপ্তি। এই পরিস্থিতি ভাষাগত বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, ভাষানীতির উন্নয়ন এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার বৃদ্ধি- এই বিষয়গুলো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। বিশ্বায়ন বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিতে প্রবেশের দ্বার খুলে দিয়ে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যকে উন্নীত করতেও সাহায্য করে। আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগ, আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের এই যুগে যোগাযোগ এবং পরিচয় তৈরির মাধ্যম হিসাবে ভাষার গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও কিছু ভাষা এই বিশ্বায়ন থেকে উপকৃত হচ্ছে এবং প্রসারের নতুন সুযোগ খুঁজে পাচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য কিছু ভাষা চ্যালেঞ্জ এবং হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। একটি ভাষার উপরে বিশ্বায়নের এনে দেওয়া এই উন্নয়নের সুযোগ এবং একই সাথে অবনয়নের হুমকির প্রভাব কেমন হতে পারে সে বিষয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা জার্মান ভাষার বর্তমান অবস্থা এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্বায়নের যুগে ভাষার এবং বিশেষ করে জার্মান ভাষার প্রচার ও প্রসারের পক্ষে এবং ভাষার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিলুপ্তি থেকে সুরক্ষার সম্ভাব্য কৌশলগুলিও এখানে আলোচিত হয়েছে।

পূর্বগবেষণা সমীক্ষণ, গবেষণার উদ্দেশ্য এবং গবেষণা প্রশ্ন

মাতৃভাষার ব্যবহার হ্রাস, ভাষার বিলুপ্তি, ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদসহ আরও নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায় এই বিশ্বায়নের ধারায়। অনেক গবেষক তাদের গবেষণায় ভাষার উপরে বিশ্বায়নের এইসব প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। Phillipson (২০২৪) তাঁর *Linguistic Imperialism* বইতে ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের মূল দিকগুলো এবং ভাষার উপরে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। Tashi (২০২৩) তাঁর Understanding Language Attitude and Linguistic Ecology in Indian Himalayas: A perspective from an Endangered Language 'Ladakhi' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, ভারতীয় হিমালয় অঞ্চলের একটি ভাষা 'লাদাখি' কীভাবে বিপন্নতার শিকার হয়। Mühlhäusler (১৯৯৬) তাঁর Linguistic Ecology: Language Change and Linguistic Imperialism in the Pacific Region প্রবন্ধে ভাষার বিলুপ্তি ও তার বিভিন্ন কারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভাষার ব্যবহার হ্রাস, বিকৃতি কিংবা বিলুপ্তির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের যেমন প্রভাব রয়েছে, তেমনি বিশ্বায়ন অনেক ভাষার উন্নয়ন ও প্রচার প্রসারেও অবদান রাখে। এই ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠে আসে তা হলো: বিশ্বায়নের ধারায় একটি ভাষা কি একই সাথে উন্নয়নের সুযোগ এবং অবনয়নের হুমকির মুখে পড়তে পারে? এই বিষয়টি জার্মান ভাষার ক্ষেত্রে আলোচনা করে দেখা হবে এই প্রবন্ধে। জার্মান বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষাগুলির মধ্যে একটি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সরকারি ভাষাগুলির মধ্যে একটি।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে নিম্নলিখিত গবেষণা প্রশ্নগুলোর আলোকে-

১। জার্মান ভাষার প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন কোন কোন সুযোগগুলি উন্মুক্ত করে দেয়?

২। জার্মান ভাষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষার উপরও কি বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে? যদি পড়ে, তাহলে তার সাথে ইতিবাচক প্রভাবগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হতে পারে?

৩। বিশ্বায়িত বিশ্বে ভাষার এবং বিশেষ করে জার্মান ভাষার প্রচার ও সুরক্ষার জন্য কী কৌশল এবং ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

প্রবন্ধের প্রথমেই ভাষার উপরে বিশ্বায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। তারপর জার্মান ভাষার ক্ষেত্রে এর সম্পর্ক ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে বিশ্বায়নের বিভিন্ন দিকগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা হবে যা জার্মান ভাষার প্রচার ও প্রসারে অবদান রাখে, বৈশ্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিদেশি ভাষা হিসাবে জার্মানের ভূমিকা এবং এই বিষয়গুলোকে চালিত করে এমন সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণগুলি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট জার্মান ভাষার প্রতি হুমকি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে জার্মান ভাষার ব্যবহার হ্রাসের কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার পরবর্তী অংশে জার্মান ভাষার উন্নয়ন এবং হুমকি– এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। তৎপরবর্তী অংশে গবেষণার ফলাফল সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষ অংশে সম্ভাব্য কিছু উপায় সুপারিশ করা হয়েছে, কীভাবে একটি ভাষা যেমন জার্মান ভাষা বিশ্বায়নের ফলে উদ্ভুত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে একটি সুরক্ষিত অবস্থান লাভ করতে পারে। এই প্রবন্ধটি ভাষার উপর বিশ্বায়নের জটিল প্রভাবগুলি আরও ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করবে। ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়িত বিশ্বে বিশ্বায়ন এবং ভাষার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বায়ন এবং ভাষার মধ্যকার এই সম্পর্ককে গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করবে এই প্রবন্ধটি।

গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার উৎস

আলোচনাটি করা হবে কিছু বাস্তব উদাহরণ, ভাষা বিশেষজ্ঞদের দেওয়া মতামত ও বক্তব্যের আলোকে, জার্মান সরকারের মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে প্রকাশিত পরিসংখ্যানগত তথ্য-উপাত্ত এবং ভাষার উপরে বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কিত কিছু তত্ত্বের ভিত্তিতে। এছাড়া গবেষণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে বিভিন্ন গ্রন্থ, অনলাইন ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র এবং জার্নালে প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে একটি উদ্ধৃতি ইংরেজি বই থেকে দেওয়া হয়েছে এবং সেটি ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে। এছাড়া কিছু উদ্ধৃতি জার্মান ম্যাগাজিন/জার্নাল থেকে দেওয়া হয়েছে এবং সেই উদ্ধৃতিগুলো প্রবন্ধকার নিজে জার্মান থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

আলোচনা

ভাষার উপরে বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কিত কিছু তাত্ত্বিক পদ্ধতি এবং ধারণা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা দরকার।

লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা: ভাষাগত বিশ্বায়নের একটি মূল দিক হলো লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা ভাষার বিস্তার। যেমন: বর্তমান বিশ্বে ইংরেজি ভাষা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে বিস্তার লাভ করছে, যা বিশ্বায়িত বিশ্বে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে এবং আন্তর্জাতিক ব্যাবসা, গবেষণা, গণমাধ্যম এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলস্বরূপ, জার্মানসহ অন্যান্য ভাষার উপর ইংরেজির একটি শক্তিশালী প্রভাব লক্ষ করা যায়। ইংরেজি থেকে অনেক শব্দ এবং অভিব্যক্তি অন্যান্য ভাষায় প্রবেশ করছে যা আন্তর্জাতিকীকরণের দিকে পরিচালিত করছে।

ভাষানীতি এবং ভাষা পরিকল্পনা: ভাষানীতির উপরেও বিশ্বায়নের প্রভাব রয়েছে। বিশ্বায়নের এই পৃথিবীতে ভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো সঠিক ভাষানীতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণ ও অনুসরণ। এর মধ্যে রয়েছে তুলনামূলক কম ব্যবহৃত ভাষাগুলোকে সমর্থন ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনজীবনে বহুভাষিকতাকে একীভূত করার ব্যবস্থা করা। বহুভাষিকতার প্রচার ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষা করতে এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষানীতি হলো জাতীয় ভাষার গুরুত্ব। Phillipson (২০২৪) স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং ফিনল্যান্ড-এর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, সেখানে তাদের ভাষানীতি এমন যে, ইংরেজির বর্ধিত ব্যবহার কোনোভাবেই যেন জাতীয় ভাষার গুরুত্ব কমাতে না পারে, সেই দিকটা নিশ্চিত করা হয়েছে।

ট্রান্সকালচারাল সমাজ: আগে একটা সময় সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝতাম একটা জাতির সমষ্টিগত চিন্তাভাবনা, জীবন সম্পর্কে তাদের সমষ্টিগত এবং অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। তারপর ধীরে ধীরে একটা সময় সমাজ এই ঐতিহ্যগত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বহুসংস্কৃতি হয়ে উঠল আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বহুসংস্কৃতি সমাজে পাশাপাশি সহাবস্থান করতে শুরু করল। বিদেশি সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেই সংস্কৃতির প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়া এই সমাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বর্তমান বৈশ্বিক সমাজে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি যেন শুধু পাশাপাশি সহাবস্থানই করছে না, তারা যেন একে অপরের সাথে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। (Welsch, ২০০০) আধুনিক সমাজের সংস্কৃতির এই নতুন কাঠামোর নাম দিয়েছেন ট্রান্সকালচার। বিশ্বায়ন, একীকরণ, সংমিশ্রণ এবং যোগাযোগ হলো এই নতুন সমাজের বৈশিষ্ট্য। এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র দেশের ভিতরে নয়, দেশের জাতীয় সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরেও কাজ করছে। বিভিন্ন ভাষার উপরে দক্ষতাকে এই ট্রান্সকালচারাল সমাজে পরস্পরের সাথে যোগাযোগের একটা উপায় হিসেবে দেখে। বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ এবং পারস্পরিক সহনশীলতাকে উন্নীত করার

জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভাষাশিক্ষা প্রোগ্রামগুলি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির উপর ফোকাস করে, যা কিনা ভাষার প্রচার এবং প্রসারে অবদান রাখে।

ভাষাগত মানবাধিকার: এই ধারণাটি জোর দেয় যে, মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য ভাষার সুরক্ষা এবং প্রচার অত্যাবশ্যক। বিশ্বায়নে যার যার নিজস্ব মাতৃভাষায় কথা বলার এবং সেই ভাষায় শিক্ষা ও তথ্য পাওয়ার অধিকার থাকা উচিত। তা ভাষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা রোধ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষাগত পরিবেশবিদ্যা: ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাষাগত পরিবেশবিদ্যা বা ভাষাগত বাস্তুবিদ্যার ধারণাটি আবির্ভূত হয়েছে। এই শাস্ত্র বিভিন্ন ভাষার মধ্যকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ভাষাগুলো যে স্থানে ব্যবহৃত হয় সেই স্থানের সাথে ভাষাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়ন করে। ভাষাগত পরিবেশবিদ্যা দেখায় কীভাবে বিশ্বায়ন ভাষার পরিবেশকে প্রভাবিত করে এবং তা প্রকারান্তরে ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি অথবা হ্রাসে ভূমিকা রাখে। এই বিষয়টি আরও দেখায়, ভাষাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান নয়, বরং একটি পরিবেশগত প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান। ভাষাগত পরিবেশবিদ্যায় উপভাষা, সংখ্যালঘুদের ভাষা এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের উপর ফোকাস করা হয়। যেমন, (Tashi, ২০২৩) ভাষাগত পরিবেশবিদ্যা এবং ভাষার প্রতি মানুষের মনোভাব নিয়ে তাঁর আলোচনায় ভারতীয় হিমালয় অঞ্চল এবং সেই অঞ্চলের একটি বিপন্ন ভাষা 'লাদাখি'-এর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক দেখিয়েছেন। Mühlhäusler (১৯৯৬) ভাষার বিলুপ্তির ক্ষেত্রে বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়গুলি কীভাবে ভুমিকা রাখে তা দেখিয়েছেন। ভাষাগত পরিবেশবিদ্যায় ভাষাগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রচারের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ভাষাগুলোকে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা বিশ্বায়িত বিশ্বে ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষার একটা অংশ।

ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ: 'ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ' ধারণাটি একটি ভাষার (প্রায়শই ইংরেজি) বিস্তার এবং আধিপত্যকে বোঝায় এবং এর জন্য অন্যান্য ভাষাগুলিকে মূল্য দিতে হয়। যখন যেই ভাষা আধিপত্য করে, সেই ভাষার আধিপত্যের কারণে অন্যান্য ভাষার মধ্যে পরিবর্তন, সংমিশ্রণ এবং অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্তির সম্ভাবনাও থাকে। এটি অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত ভাষাগুলির জন্যে বেশি হুমকির কারণ হতে পারে। ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে বহুভাষিকতার প্রচার এবং বিভিন্ন ভাষার সমতাকে স্বীকৃতি প্রদান। (Phillipson, ২০২৪) দেখিয়েছেন, উচ্চশিক্ষায় দ্বিভাষিক নীতি ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদকে কীভাবে প্রতিহত করতে পারে।

ডিজিটালাইজেশন: ডিজিটাল যোগাযোগ এবং ইন্টারনেট ভাষার প্রসারকে আরও ত্বরান্বিত করেছে এবং বিশ্বব্যাপী সকলের সাথে সকলের ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব করে তুলেছে। বিদেশি ভাষার ক্লাসরুমে ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অনলাইন ক্লাস বিদেশি ভাষা শিক্ষাকে আগের চেয়ে তুলনামূলক সহজ করে তুলেছে এবং ভাষার প্রচার এবং প্রসারে অবদান রাখছে।

মাতৃভাষার ব্যবহার হ্রাস এবং ভাষার বিলুপ্তি: জার্মান সংবাদপত্র ‘Fokus Online’ এ ২০১৩ সালে প্রকাশিত ‘Globalisierung: Hälfte aller Sprachen vom Verschwinden bedroht’ শীর্ষক এক প্রবন্ধ অনুসারে, বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রতি দুই সপ্তাহে একটি করে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিদ্যমান ৬০০০ ভাষার প্রায় অর্ধেক ভাষাই শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিশ্বায়নের এই বিশ্বে বিদেশি ভাষা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত অনেক দেশে এখন দেখা যায়, ভালো কর্মসংস্থানের জন্য এখন বিদেশি ভাষাকে মানুষ বেশি মূল্যায়ন করে এবং নিজেদের ভাষাকে কম মূল্য দেয়। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের বিশ্বায়িত বিশ্বের জন্য প্রস্তুত করতে চান। এই প্রস্তুতি পর্ব স্কুলে শুরু হয়। আজকাল, বেশিরভাগ অভিভাবক তাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠাতে চান। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়া শিক্ষার্থীরা স্কুলে ইংরেজিতে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। এমনকি বাড়িতে, শিক্ষিত বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলেন, যাতে তারা তাদের ইংরেজির চর্চা ও উন্নতি করতে পারে। অবসর সময়ে তারা ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে। নিজের মাতৃভাষায় খুব কম কথা বলা হয়। অনেক পরিবারে, শিশুরা তাদের মাতৃভাষা শুধু শুনে বুঝতে পারে, কিন্তু বলতে পারে না। অর্থাৎ তারা সরাসরি তাদের মাতৃভাষায় যোগাযোগ করতে পারে না। তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা তাদের মাতৃভাষা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে না। ‘ফলে তিন প্রজন্ম পর এই ভাষা হারিয়ে যাবে।’– এরকমটাই মন্তব্য করেছেন একজন বিশেষজ্ঞ, যা আমরা জার্মান ডিজিট্যাল সংবাদপত্র ‘Welt’-এ প্রকাশিত ‘Globalisierung lässt kleine Sprachen aussterben’ শীর্ষক প্রবন্ধে দেখতে পাই।

বিশ্বায়নে জার্মান ভাষার উন্নয়নের সুযোগ

জার্মান ভাষার প্রসারে যে সকল জার্মান সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রেখে থাকে তার মধ্যে গোয়েথে-ইনস্টিটিউট অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠান জার্মান কোর্স অফার করে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়া তাদের বিভিন্ন স্কলারশিপ প্রোগ্রাম রয়েছে যা বিদেশি শিক্ষার্থীদের জার্মানিতে পড়ার সুযোগ দেয়। এই উদ্যোগগুলি বিশ্বব্যাপী জার্মান ভাষার প্রচার ও প্রসারকে জোরদার করতে সাহায্য করে। গোয়েথে-ইনস্টিটিউট ছাড়াও জার্মানির আরও যে সকল সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান জার্মান ভাষার প্রচার-প্রসারে কাজ করে, তার মধ্যে রয়েছে ডয়েচে ভেলে (DW), জার্মান একাডেমিক এক্সচেঞ্জ সার্ভিস (DAAD), জার্মান ফরেন অ্যাসোসিয়েশন (DAG), পেশাজীবী সমিতি বিদেশি এবং দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে জার্মান (FaDaF), টেস্ট ডাফ ইনস্টিটিউট (TestDaF-Institut), আন্তর্জাতিক জার্মান শিক্ষক সমিতি (IDV), শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীদের সম্মেলনের সচিবালয়ের শিক্ষা বিনিময় পরিসেবা (PAD), আন্তর্জাতিক জার্মান স্কুল পরিচালনা কেন্দ্র (ZfA)।

বৈশ্বিক শিক্ষাগত ল্যান্ডস্কেপে একটি বিদেশি ভাষা হিসাবে জার্মানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাতৃভাষা হিসেবে ইউরোপে জার্মান ভাষার স্থান প্রথম এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে জার্মান শেখে। জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ থাকার কারণে বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে পড়াশুনার জন্য মানুষ জার্মানিতে যেতে চায়। বিশ্বায়নের চাকরির বাজার আর জার্মানির শক্তিশালী অর্থনীতির কারণে বহু মানুষ চায় জার্মানিতে কাজ করতে। কিন্তু জার্মানিতে পড়াশুনা অথবা পেশায় যেতে হলে জার্মান ভাষা জানতে হবে। এছাড়া জার্মানি একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক শক্তি হওয়ায় বিদেশি ভাষা হিসেবে জার্মান ভাষা নিজের দেশের ভিতরেও অনেক ধরনের পেশাগত সুযোগের সূচনা করে। এই কারণে যত দিন যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী জার্মান ভাষার চাহিদা ততই বেড়ে চলেছে। পশ্চিমা দেশগুলোর বাইরে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়াতেও আগের থেকে অনেক বেশি মানুষ এখন জার্মান শেখে। জার্মানি একটি সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ধারণ করে যা জার্মান ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়। তাছাড়া অর্থনৈতিকভাবে, জার্মানি বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিগুলির মধ্যে একটি এবং জার্মান ভাষা কর্মক্ষেত্রে বিস্তৃত সুযোগের দরজা খুলে দেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জার্মানির রাজনৈতিক গুরুত্ব জার্মান ভাষার প্রচারে অবদান রাখে, কারণ জার্মান ভাষা কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জার্মান ভাষার অবস্থান বোঝার জন্য আন্তর্জাতিক পরিসরে জার্মান ভাষার তুলনামূলক ব্যবহার সম্পর্কিত জরিপ এবং পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীচের পরিসংখ্যানটি আজকের বিশ্বায়িত বিশ্বে জার্মান ভাষার গুরুত্ব এবং বিস্তার সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

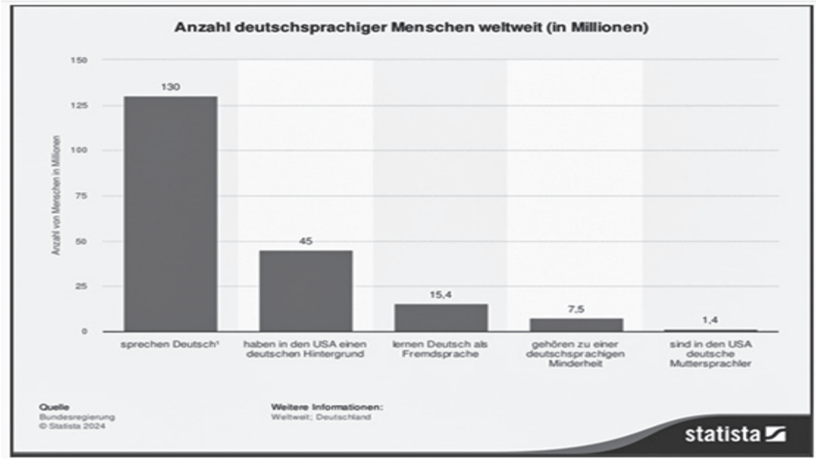

Source: German Federal Government © Statistia (২০২৪)

উপরের পরিসংখ্যান অনুসারে, বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৩০ মিলিয়ন মানুষ তাদের মাতৃভাষা বা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে জার্মান ভাষায় কথা বলে, প্রায় ১৫.৪৫ মিলিয়ন মানুষ একটি বিদেশি ভাষা হিসাবে জার্মান ভাষা শেখে এবং প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন মানুষ জার্মানভাষী সংখ্যালঘুর অন্তর্গত। ৯০ মিলিয়ন নেটিভ স্পিকারসহ, জার্মান হলো ইউরোপের সবচেয়ে ব্যাপক কথ্য ভাষা। এই পরিধি জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড এবং লিস্টেনস্টাইনের বাইরেও বিস্তৃত, কারণ পূর্ব ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশেও জার্মান ভাষায় মানুষ কথা বলে। তাছাড়া, বিদেশি ভাষা হিসেবে জার্মান ভাষার চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকাতে জার্মান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে (Christoph: ২০১৫)।

"বিশ্বজুড়ে কতজন মানুষ জার্মান ভাষা বিদেশি ভাষা হিসেবে শিখছেন?" প্রতি পাঁচ বছর অন্তর, জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই প্রশ্নের উপর গবেষণা পরিচালনা করে। এই গবেষণার শিরোনাম "বিশ্বজুড়ে বিদেশি ভাষা হিসেবে জার্মান"। এটি প্রথম শুরু হয় ১৯৮৫ সালে। তাদের সর্বশেষ গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে একটি ৫৬-পাতার প্রতিবেদনে, যা ২০২০-এর ৪ জুন বার্লিনে ডয়েচে ভেলে, গোয়েথে-ইনস্টিটিউট এবং ডিএএডির (DAAD) সহযোগিতায় উপস্থাপন করা হয়। এই প্রতিবেদনেও দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী বর্তমান জার্মান ভাষার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫.৪ মিলিয়ন।

ব্যবসায়িক যোগাযোগের পরিসংখ্যানগুলোও দেখায় যে, জার্মান ব্যবসায়িক জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জার্মানি বিশ্বের প্রযুক্তি এবং অর্থনীতির দিক থেকে শীর্ষস্থানীয় একটি দেশ, জার্মান ভাষা অনেক আন্তর্জাতিক কোম্পানি এবং সংস্থাগুলিতে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ফলে তা বিশ্বব্যাপী বিস্তারে অবদান রাখে। জার্মান ভাষা আঞ্চলিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দিক থেকেও বেশ সমৃদ্ধ। উপভাষা এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্যগুলি জার্মান ভাষার ভাষাগত সমৃদ্ধি এবং পরিচয়ে অবদান রাখে। এছাড়া জার্মানি এবং জার্মান ভাষী অন্যান্য দেশগুলি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার দিক থেকে এগিয়ে আছে এবং জার্মান প্রকাশনাগুলি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। জার্মান ভাষা এখনও একাডেমিক বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'বিশ্বব্যাপী বিদেশী ভাষা হিসেবে জার্মান- তথ্য সংগ্রহ ২০২০' অনুসারে বিশ্বে বর্তমানে ১০০টিরও বেশি দেশে প্রায় ২০০০ স্কুলে ৬ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী জার্মান ভাষা শিখছে। ১৫৭টি শাখা নিয়ে গোয়েথে-ইনস্টিটিউট বিশ্বের ৯৮টি দেশে তাদের জার্মান ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহার এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বিশ্লেষণেও দেখা গেছে যে জার্মান একটি অনলাইন ভাষা হিসাবে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। টুইটার, ফেসবুক এবং ইউটিউবের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলোতে জার্মান বিষয়বস্তুর উপরে চর্চার হার এখন ব্যাপক।

বিশ্বায়ন কি জার্মান ভাষার জন্য কোনও হুমকির কারণ হতে পারে?

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে জার্মান ভাষার জন্য একটি প্রধান হুমকি হলো ইংরেজির সঙ্গে প্রতিযোগিতা। ইংরেজি বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে গবেষণা, প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বিদেশি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এর ফলে অনেক জার্মান, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নিজেকে সক্ষম করে তোলার জন্য ইংরেজিতে যোগাযোগ করার প্রবণতা দেখা যায়। এর ফলে একটা দীর্ঘ সময় পরে ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং নিজস্বতা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে, ইংরেজি প্রায়শই গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি জার্মান ভাষার উপর প্রভাব ফেলে, কারণ গবেষক এবং বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যে তাদের গবেষণা লেখা ইংরেজিতে প্রকাশ করতে বাধ্য হন। ফলস্বরূপ, জার্মান গবেষণা দীর্ঘমেয়াদে তার গুরুত্ব হারাতে পারে। বিনোদন এবং সংস্কৃতিতেও ইংরেজির ভাষার প্রাধান্য স্পষ্ট। ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্র, সংগীত বিশ্বব্যাপী প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে দৃশ্যমান। কিন্তু জার্মান সংস্কৃতি সেইভাবে সকলের সামনে আসতে পারে না।

অনেক দেশে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক বিদেশি ভাষা হিসেবে রাখা হয় এবং এভাবে জার্মান ভাষাকে দ্বিতীয় বিদেশি ভাষা হিসাবে পিছনের সারিতে ঠেলে দেয়া হয়। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর একটা বড়ো প্রভাব পড়তে পারে। তাছাড়া বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে তোলার জন্যে আজকাল বিভিন্ন দেশে এমনকি জার্মানিতেও ডিগ্রি প্রোগ্রামগুলো ইংরেজি মাধ্যমে রাখা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জার্মানিতে ইংরেজি মাধ্যমে ডিগ্রি প্রোগ্রামের সংখ্যা আটগুণ বেড়েছে। সমালোচকরা আশঙ্কা করছেন যে, এটি গবেষণার ভাষা হিসেবে জার্মানকে দুর্বল করে দেবে (Estermann, Rösch and Herrmann: ২০২১)।

অনেক মানুষ আজকাল ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে তাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং ব্যাবসা উভয় ক্ষেত্রেই। ‘মোবাইল ফোন’, ‘ই-মেইল’ এবং ‘মিটিং’-এর মতো শব্দগুলি আজ প্রতিদিনের জার্মান ভাষায় ঢুকে গেছে। জার্মান বর্ণমালায় ইংরেজি বর্ণমালায় যেই ২৬টি অক্ষর আছে, তার বাইরে আরও ৪টি অক্ষর আছে (ö, ä, ü, β)। উপরে যেই ডটগুলো দেখা যাচ্ছে– এগুলোকে জার্মান ভাষায় উমলাউট বলা হয়, যেগুলো আজকাল প্রায় সময় বাদ দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। জার্মান ভাষায় একটা নিয়ম আছে, সকল বিশেষ্য পদ সকল সময় বড়ো হাতের লিখতে হবে, সেটা বাক্যের শুরুতে হোক, মাঝে হোক, আর শেষেই হোক। কিন্তু ইংরেজিতে এই নিয়ম নেই। অনেকে আজকাল ইংরেজির নিয়ম অনুসরণ করে বিশেষ্য পদগুলো বড়ো হাতের লেখা প্রায় সময় বাদ দিয়ে দিচ্ছে। জার্মান ভাষায় কাউকে শুভ দিন কামনা করার সময় তারা বলে: “Ich wünsche Ihnen

einen schönen Tag!" কিন্তু আজ কাল অনেককেই বলতে শোনা যায়: "Haben Sie einen schönen Tag!" (Have a nice day) যার মধ্যে ইংরেজির প্রতিফলন দেখা যায়। জার্মান অভিধান ডুডেন এ প্রতি বছর প্রায় ৮০০ নতুন শব্দ যোগ হচ্ছে, যার মধ্যে ২০ থেকে ৪০টি ইংরেজি থেকে নেয়া। (Causemann: ২০১২) এইভাবে বিদেশি শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জার্মান ভাষায় ইংরেজির প্রতিফলনের ফলে জার্মান ভাষা তার সমৃদ্ধি এবং সূক্ষ্মতা হারাতে পারে এমন একটি আশঙ্কাও রয়েছে। অন্যদিকে, তা জার্মান শব্দভান্ডার এবং জার্মান ভাষার নিজস্বতা হারানোর বিষয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করে।

বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে জার্মানভাষী দেশ এবং অন্যান্য দেশের অন্যান্য জাতির মধ্যে নিবিড় সাংস্কৃতিক বিনিময় সঞ্চালিত হচ্ছে। ফলে অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে সাংস্কৃতিক ধারণা জার্মান সংস্কৃতিতে এবং তাদের অনেক শব্দ জার্মান ভাষায় আমদানি হচ্ছে এবং তা জার্মান ভাষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে। জার্মান ভাষা বর্তমানে পরিবর্তন পরিবর্ধনের হুমকির সম্মুখীন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জার্মান ভাষা বদলে যাচ্ছে (Freitag: ২০১৪)।

জার্মান ভাষার উপরে বিশ্বায়নের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাবগুলোর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া

জার্মান ভাষার উপর বিশ্বায়নের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাবগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ইতিবাচক দিক থেকে আন্তর্জাতিক লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ইংরেজির বিস্তার জার্মানভাষীদের বৈশ্বিক যোগাযোগ, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের পথ সহজ করে দেয়। অনেক জার্মান নাগরিক আছেন যারা একাধিক ভাষা জানেন এবং বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করেন, যা তাদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগগুলিকে প্রসারিত করে। তবে ইংরেজির প্রভাব জার্মান ভাষার জন্য ক্ষতিকরও হতে পারে, বিশেষ করে মিডিয়া, বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে। একটি ঝুঁকি হলো- জার্মান শব্দগুলি ইংরেজি প্রতিশব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে, যা কিনা ধীরে ধীরে ইংরেজিকরণের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জার্মান ভাষা তার গুরুত্ব হারাতে পারে। জার্মানির কিছু চিন্তাবিদ এবং দার্শনিক আছেন যারা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার বিরুদ্ধে এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যের পক্ষে। কিন্তু কিছু লোক লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কাকে স্বাগত জানাতে পেরে খুব খুশি। গোয়েথে-ইনস্টিটিউটকে দেয়া "Deutsch steht nicht alleine da" শীর্ষক এক সাক্ষাৎকারে জার্মান লেখক Karl- Heinz Göttert বলেন: "বিশ্বব্যাপী কাজ করার জন্য এবং নিজেদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে উপযুক্ত করার জন্য আমাদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা প্রয়োজন।"

বিশ্বায়নের ফলে অভিবাসনের প্রবাহ দিন দিন বাড়ছে, যা ভাষার বিস্তার ও বিকাশকে প্রভাবিত করছে। জার্মানি ভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে আসা ক্রমবর্ধমান সংখ্যক লোকদের তাদের দেশে স্বাগত জানিয়েছে। যেমন, তুরস্ক, সিরিয়া এবং

ইউক্রেনসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর শরনার্থী সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জার্মানিতে প্রবেশ করেছে। ফলে তা ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করছে। শরণার্থীদের জন্য বহু ভাষা সহায়তা প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে, যা কিনা জার্মান সমাজে অভিবাসীদের একীভূতকরণে যেমন সহায়তা করছে তেমনি তা অন্যদিকে, জার্মান ভাষার প্রচার-প্রসারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে নেতিবাচক দিক হিসেবে এইসব অভিবাসীদের ভাষা থেকে জার্মান ভাষায় নতুন শব্দের প্রবেশসহ অন্যান্য পরিবর্তন পরিবর্ধনের চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

জার্মান ভাষার ক্ষেত্রে ভাষার উন্নয়ন ও অবনয়নের মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এমন আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ডিজিটালাইজেশন। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারের মতো প্ল্যাটফর্মগুলিতে যোগাযোগের ভাষা ইংরেজি। এছাড়াও, অনলাইনে ইংরেজিতে অনেক ডিজিটাল পণ্য এবং সেবা পাওয়া যায়, যা জার্মান ভাষার ব্যবহারকে সীমিত করে দেয়। একই সময়ে ডিজিটালাইজেশন জার্মান ভাষার জন্য অনেক নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে যা ভাষার প্রচারকে সহজ করে দিচ্ছে; যেমন: অনলাইন ভাষা কোর্সের ব্যবস্থা এবং ভাষার ক্লাসরুমে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি।

এছাড়া সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বেড়ে যাওয়ার ফলে জার্মানদের সাথে অন্যান্য জাতির মানুষের মধ্যে বিয়ে দিন দিন বাড়ছে। এটা জার্মান ভাষার জন্য ইতিবাচক হতে পারে, আবার তা নেতিবাচকও হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে তারা তাদের সন্তানদের কোন ভাষায় বড়ো করছেন, মাতৃভাষা হিসেবে সন্তানরা কোন ভাষাকে পাচ্ছে- সেটা একটা প্রশ্ন।

ফলাফল

একটি ভাষা একই সাথে উন্নয়নের সুযোগ লাভ এবং অবনয়নের হুমকির মুখে পড়তে পারে কিনা- এই প্রশ্নটি ভাষাতত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জার্মান ভাষার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ শেষে সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, জার্মান ভাষায় একদিকে যেমন বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে, তেমনিভাবে নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে জার্মান ভাষা যে চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার অন্যতম উদাহরণগুলো হলো: বিশ্বে ইংরেজি ভাষার বিস্তার এবং তার ফলস্বরূপ ক্ষেত্রবিশেষে জার্মান ভাষার গুরুত্ব হ্রাস, জার্মান ভাষা ও সংস্কৃতিতে অন্যান্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রবেশ, জার্মান ভাষার নিজস্বতা হারিয়ে যাওয়া এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধনের শিকার হওয়া। তবে বিশ্বায়নের এই চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও জার্মান ভাষা বিজ্ঞান, গবেষণা, ব্যবসা এবং সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে এখনো ভূমিকা রাখছে। জার্মান ভাষা পরিবর্তিত সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এবং নিজস্ব চাহিদা বজায় রাখার ক্ষমতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। একটি বিদেশি ভাষা হিসেবে জার্মান বিশ্বব্যাপী শিক্ষাগত ল্যান্ডস্কেপে ক্রমাগত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং পেশাগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিস্তর পরিসরে সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। অর্থাৎ জার্মান ভাষার

ক্ষেত্রে ভাষার উন্নয়ন এবং অবনয়ন এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি জটিল, ঘনিষ্ঠ এবং বহুমুখী সম্পর্ক রয়েছে। এই দুই প্রক্রিয়া অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত এবং এই দুই প্রক্রিয়া জার্মান ভাষার উপর একই সাথে একই সময়ে চলমান। তবে কীভাবে জার্মান ভাষা ভবিষ্যতেও তার অবস্থান ধরে রাখবে এবং আরও অগ্রসর হতে পারবে, তার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ ভাষানীতি প্রয়োজন যা আধুনিক বৈশ্বিক যোগাযোগের চাহিদা মেটানোর সাথে সাথে ভাষাগত বৈচিত্র্যকেও সম্মান করবে, ভাষার নিজস্বতাকে ধরে রাখবে এবং প্রচার-প্রসারে অবদান রাখবে।

সুপারিশমালা

বিশ্বায়ন প্রতিটি ভাষাকে বিশ্বের বুকে নিজেকে প্রচার করার সুযোগ দেয়। তবে অবশ্যই তা অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য সহজ নয়। তবে সরকারকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং দেশের জাতীয় ভাষাকে বিদেশি ভাষা ও মাতৃভাষা উভয় দিক থেকেই প্রচার এবং সংরক্ষণ করার চেষ্টা করতে হবে। বিশ্বায়নকে থামিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু আমরা অন্তত আমাদের নিজস্ব ভাষা বজায় রাখতে এবং বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে পারি। মানুষ যাতে যার যার মাতৃভাষাকে অবমূল্যায়ন না করে সেই বিষয়ে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাতৃভাষা শেখানোর জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের অনেক দেশপ্রেমিক মাতৃভাষা রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রতি বছর এই দিনটি বাংলাদেশে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে দিবসটি পালন করতো। কিন্তু এখন এই দিনটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পালিত হচ্ছে। সারা বিশ্বের মানুষ যেন তাদের মাতৃভাষা সম্পর্কে সচেতন হয় সেজন্য জাতিসংঘ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।

একটি রাষ্ট্রকে সেই রাষ্ট্রের ভাষার জন্য এমন নীতি প্রণয়ন করা উচিত যাতে অন্য ভাষীরা ভাষা শিখতে আগ্রহী হয় এবং সুযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ, পর্যটকদের জন্য বিনামূল্যে ভাষা কোর্স অফার করা। স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে দুটি কোর্স মাতৃভাষায় লেখা বাধ্যতামূলক করা। একটি ভাষার উপর প্রভাবশালী ভাষাগুলোর প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। তবে চেষ্টা করা উচিত যাতে বিশ্বায়ন একটি ভাষার প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে যে সুযোগ এবং যে হুমকিগুলো এনে দেয়, এই দুইয়ের এর মধ্যে ব্যবধান যেন বেশি না হয়ে যায়।

জার্মান ভাষার সংরক্ষণ এবং প্রচার প্রসারে করণীয় নীতিমালা

জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার মতো দেশগুলি এখন চেষ্টা করছে কীভাবে অন্যান্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি উন্মুক্ত মনোভাব বজায় রেখে তাদের নিজেদের ভাষা রক্ষা করা যায়। জার্মান ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে এবং এর প্রচার-প্রসারকে এগিয়ে নিয়ে

যেতে জার্মানিতে ‘জার্মান বানানতত্ত্ব কাউন্সিল’-এর মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ডেংলিশ (জার্মান এবং ইংরেজির মিশ্রণ) ব্যবহার সীমিত করা এবং জার্মান ভাষার সঠিক ব্যবহারকে উন্নীত করা। জার্মান ভাষী কিছু দেশ এবং অঞ্চলে আঞ্চলিক এবং সাংস্কৃতিক ভাষাগত সমৃদ্ধি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। মানুষ তাদের নিজস্ব উপভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছে, যা কিনা প্রকারান্তরে বিশ্বায়নের প্রবণতার বিপরীতে কাজ করছে।

জার্মান ভাষা যে পরিবর্তন পরিবর্ধন আর সংমিশ্রণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় (Paulwitz, ২০০৬) বলেছেন:

> কী করা উচিত? অবিলম্বে আমাদের ভাষাকে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। এটি শুধুমাত্র সক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমেই সম্ভব। সঠিক বানানকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার জার্মান শব্দ অসংখ্য সংখ্যায় ভেঙে ফেলার মাধ্যমে যে ধ্বংসের মুখে পড়েছিল, তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিল প্রথাগত বানানের সমর্থকরা। ভাষা পুলিশ যদি কোনও দোষ দেখিয়ে একটি শব্দ বাতিল করার চেষ্টা করে, তবে আমাদেরও তা মেনে চলা উচিত; শুধুমাত্র শব্দের সংরক্ষণ করার জন্যই নয়, বরং ভবিষ্যতেও জটিল বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করাটাকেও সম্ভব করে তোলার জন্য। এটি নিগ্রো, জিপসি, বিদেশি এবং প্রভ ঈশ্বরের জন্য ভালো।

কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণ ভিন্নমত প্রকাশ করেন: “আমার মতে, এক ধরনের ভাষা পুলিশ, যা জার্মানীতে কিছু লোক দাবি করছেন, তা উপযোগী নয়” (Göttert, ২০১৩)।

ভবিষ্যতেও যাতে জার্মান ভাষা তার বৈচিত্র্য এবং অভিব্যক্তি বজায় রেখে সামনে অগ্রসর হতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য আরও কিছু সুপারিশসমূহ:

- **চ্যালেঞ্জগুলির লিপিবদ্ধকরণ:** জার্মান ভাষা যে চ্যালেঞ্জগুলোর শিকার, সেই চ্যালেঞ্জগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে এবং তার নিজস্ব পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সেই লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল চ্যালেঞ্জগুলিকে লিপিবদ্ধ করে সেই অনুযায়ী উপযুক্ত ভাষা নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- **ক্রমাগত নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ:** জার্মান ভাষার সংরক্ষণ এবং প্রচার-প্রসারকে স্থায়ী এবং সামনে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জার্মান ভাষার অগ্রগতি ক্রমাগত নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **ভাষার সংমিশ্রণকে নিরুৎসাহিত করা:** শুধু জার্মান ভাষা নয়, যেকোনো ভাষায় কথা বলার সময় শুধু সেই ভাষায় কথা বলা এবং তাতে অন্য ভাষার কোনো সংমিশ্রণ যাতে না করা হয়– সেই বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।
- **বিদেশে জার্মান ভাষার প্রচার:** জার্মান সরকার এবং জার্মানির বিভিন্ন জার্মান ভাষাশিক্ষা সংস্থাগুলির বিশ্বব্যাপী জার্মান ভাষা প্রচারের জন্য তাদের প্রোগ্রামগুলি ঢেলে সাজানো উচিত। এটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জার্মান ভাষাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

- **দ্বিভাষিক শিক্ষামূলক কর্মসূচির প্রবর্তন:** এই কর্মসূচির আওতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়গুলোর মধ্যে অন্তত একটি বিষয় জার্মান ভাষায় পড়ার সুযোগ এনে দেয়। এতে জার্মান ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। এই ধরনের প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের তাদের যেইসব বিষয়ে আগ্রহ আছে সেসব বিষয়ের মাধ্যমে তাদের ভাষাদক্ষতা গভীর করার সুযোগ করে দেয়।
- **একীকরণে অভিবাসীদের সহায়তা করা:** জার্মানিতে অভিবাসীদের একীকরণকে আরও সহজ করার জন্য, অভিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় জার্মান ভাষা কোর্স এবং ইন্টিগ্রেশন প্রোগ্রামগুলোর উপর আরও জোর দিতে হবে। এটি শুধু অভিবাসীদের জার্মান সমাজে তাদের পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে না, বরং তা জার্মান ভাষার প্রচার-প্রসারে অবদান রাখবে।
- **গবেষণা এবং গণমাধ্যমের সহযোগিতা:** গবেষণা প্রবন্ধ এবং মিডিয়ার মাধ্যমে জার্মান ভাষাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। জার্মান মিডিয়া এবং প্রকাশকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা উচিত, যাতে তারা জার্মান বিষয়বস্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারে।

ভবিষ্যতে বিশ্বায়ন ও জার্মান ভাষা সম্পর্কিত সম্ভাব্য গবেষণার কিছু দিকনির্দেশনা

বিশ্বায়নের কারণে, সারা বিশ্বে ক্রমবর্ধমান হারে এখন মানুষ জার্মান ভাষা শিখছে এবং জার্মান ভাষায় কথা বলছে। ফলে তা জার্মান ভাষার বৈচিত্র্যের দিকে নিয়ে যায়, যা নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করা যেতে পারে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জার্মান ভাষার উপভাষা, উচ্চারণ এবং আঞ্চলিকতার দিকগুলো নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। তাছাড়া, বিশ্বায়ন ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ বাড়িয়ে দেয়। এই যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান শুধু শব্দভান্ডারই নয়, শব্দের সাংস্কৃতিক অর্থকেও প্রভাবিত করে। কীভাবে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব জার্মান শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে তার উপরও গবেষণা করা যেতে পারে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ্বায়ন একদিকে একটি ভাষার প্রচারের জন্য এবং অন্যদিকে তার অবনয়নের জন্য দায়ী। পাশাপাশি চলা এই দুটি পারস্পরিক প্রক্রিয়া একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি সঠিক ভারসাম্যই পারে ভাষাকে সংরক্ষণ করতে। তাই ভাষার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এবং তার সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের জন্য এই ভারসাম্য রক্ষা করার প্রচেষ্টা সর্বদা চলমান রাখা প্রয়োজন, যাতে সেই ভাষা বিশ্বায়নের এই বহুভাষিক বিশ্বে তার নিজস্ব অবস্থান ধরে রাখতে পারে। একটি ভাষার প্রচার-প্রসারের সুযোগের চেয়ে অবনয়নের ঝুঁকি বা হুমকিগুলো বেশি হয়ে গেলেই সমস্যা। এই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যবধান যত বেশি হবে, ভাষার জন্য তত বেশি হুমকিস্বরূপ। একটি ভাষা যতটুকু উন্নয়নের সুযোগ পায় তার থেকে

যদি অবনয়নের চ্যালেঞ্জগুলো বেশি হয়ে যায়, তাহলে ওই ভাষা বিলুপ্তির দিকে যেতে থাকে। এই ক্ষেত্রে একটি দেশের ভাষানীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের ভাষার ওপর প্রভাবশালী ভাষাগুলোর প্রভাব সম্পর্কে সরকারকে সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ভাষানীতি প্রচার করতে হবে। ইংরেজি ভাষা আজ প্রভাবশালী ভাষা এবং বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত ভাষা ইংরেজি ভাষার প্রভাবের কারণে কম বা বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। কিন্তু ভাষার কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান নেই। ভাষার অবস্থান সর্বদা ওঠানামা করে:

> Several possibilities can be envisaged. A significant change in the balance of power- whether political, economic, technological or cultural- could affect the standing of other languages so that they become increasingly attractive and begin to take over functions currently assumed by English. (Crystal, David 2003: 122)

ইংরেজির আগে ফরাসি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাষা এবং ফরাসির আগে ল্যাটিন বিশ্ব শাসন করেছিল। আর এখন ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য। পরবর্তী বিশ্বে কোন ভাষা প্রাধান্য বিস্তার করবে তা কে জানে...?

তথ্য-নির্দেশ

Causemann, Vanessa. (27/01/2012) Die Globalisierung- Das Ende der Sprachenvielfalt. *Online Sprachen Lernen*. Accessed 21/02/2025, (https://online-sprachen-lernen.com/die-globalisierung-das-ende-der-sprachenvielfalt/)

Christoph, Sator. (21/04/2015). Deutsch im Trend: Weltweit lernen 15,4 Millionen

Crystal, David. (2003). *English as a Global Language*. Cambridge University Press: United Kingdom.

Deutschsprachiger Menschen weltweit (in Millionen). Accessed 23/01/25, (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1119851/umfrage/deutschsprachige-menschen-weltweit/#:~:text=Anzahl%20deutschsprachiger%20Menschen&text=Etwa%20130%20Millionen%20Menschen%20weltweit,geh%C3%B6ren%20einer%20deutschsprachigen%20Minderheit%20an.)

DW (Deutsche Welle) Retrieved from https://www.dw.com/en/154-million-people-are-learning-german-as-a-foreign-language/a-53685365

Estermann, Karoline, Rösch, Olga and Herrmann, Wolfgang.A. (2021). Spagat in der Sprachenpolitik. *Bildungsklick*. Accessed 22/02/2025, (https://bildungsklick.de/hochschule-und-forschung/detail/spagat-in-der-sprachenpolitik)

Freitag, Vera. (2014). Das Deutsch der Zukunft. *Das Magazin der DW online.* Accessed 21/12/2024, (http://www.dw.com/de/das-deutsch-der-zukunft/a-17397906)

Focus Online. Globalisierung: Hälfte aller Sprachen vom Verschwinden bedroht. (15/02/2012). Accessed 21/01/2025, (http://www.focus.de/wissen/mensch/sprache/globalisierung-die-haelfte-aller-sprachen-ist-vom-verschwinden-bedroht_aid_714379.html)

German digital Newspaper Welt. Globalisierung lässt kleine Sprachen aussterben. (2013). Accessed 25/11/2024, (https://www.welt.de/wissenschaft/article116915036/Globalisierung-laesst-kleine-Sprachen-aussterben.html).

German Federal Government © Statistia. [Statistical Report]. (2024). Anzahl

Goethe-Institut e. V., Internet-Redaktion. (2013). Deutsch steht nicht alleine da: Ein Interview-Gespräch mit dem Schriftsteller Karl- Heinz Göttert. Accessed 27/12/2024, (https://www.goethe.de/ins/ca/de/spr/mag/20363094.html.)

Hager, Martin. Deutsch als Fremdsprache weltweit. Datenerhebung. (2020). Förderung von Deutsch als Fremdsprache/ Partnerschulinitiative PASCH, Referat 610, *Auswärtiges Amt, Berlin*.

Menschen die deutsche Sprache. *Stern Magazine online*. Accessed 20/12/2024, (https://www.stern.de/politik/ausland/deutsch-im-trend--weltweit-lernen-15-4-millionen-menschen-die-deutsche-sprache-6210076.html)

Mühlhäusler, Peter. (1996). Linguistic Ecology: Language Change and Linguistic Imperialism in the Pacific Region. *Routledge: London*. Accessed 15/11/2024, https://doi.org/10.4324/9780203211281

Paulwitz, Thomas. (2006). Achtung, Sprachpolizei! Wie unsere Sprache zensiert werden soll: mit Verboten und selbstgerechter Sprache. *Deutsche Sprachwelt*. Accessed 20/11/2024, http://www.sprache-werner.info/DAchtung-Sprachpolizei.11237.html.

Phillipson, Robert. (2024). Linguistic Imperialism. In: The Encyclopedia of Applied Linguistics (pp.1-5) Accessed 04/03/2025, https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0718.pub3

Tashi, Konchok. (2023). *Understanding Language Attitude and Linguistic Ecology in Indian Himalayas: A perspective from an Endangered Language 'Ladakhi'*. Indu Book Services Pvt. Ltd: New Delhi.

Welsch, Wolfgang. (2000). Transkulturalität: Zwischen Globalisierung und Partikularisierung. In Alois Wierlacher (Editor). *Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache.* (327- 351) Band 26. Iudicium: Munich.

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *‘চিলেকোঠার সেপাই’* উপন্যাসের ভাষায় বাখতিনের বহুস্বর প্রসঙ্গ

হুমায়রা আফরোজ*

Abstract: Akhtaruzzaman Elias has written only two novels in his entire life. The first one is the *Chilekothar Sepai* (The Soldier in the Attic) (1987), the second is *Khoabnama* (The Saga of Dreams) (1996). He has given the aesthetic art of Bangladesh's historical, political and social environment and situation in his novel. In addition to the selection of the subject, he has become unique for his prose language. The content of the *Chilekothar Sepai* novel is political. From the structure of the language used in literature, we get a clear idea about people living in a society, politics and society. The author creates different forms of language to make the content of the novel real and alive. In the *Chilekothar Sepai* novel, Elias drew a picture of educated, semi-educated, government employees, working class reactions and behavior, the conflict of the city's Mahajan-labor class conflict and exploitation of the village. The novel simultaneously implemented the heteroglossic context and polyphonic dialogue. The heteroglossic context and polyphonic dialogue of the novel remind Bakhtin's theory of novel. The main goal of this article is to explore these issues of Bakhtin's linguistics in the relevant analysis of the language of the *Chilekothar Sepai novel.*

মূলশব্দ (Keywords): Mass consciousness (গণচেতনা), polyphony (বহুস্বর), heteroglossia (বহুপ্রেক্ষাপট), politics (রাজনীতি), exploitation (শোষণ), class mentality (শ্রেণি মানসিকতা)

* Humaira Afroz, Lecturer, Department of Bengali Language and Literature, Southeast University, email: humayra.afruj@seu.edu.bd

ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক পীড়ন, বেকারত্ব, শ্রমিক অসন্তোষ প্রভৃতি মানুষের সমাজবাস্তবতায় নানামুখী ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তন এনেছিল যার উল্লেখ বাংলা কথাসাহিত্যে দেখা যায়। পরবর্তীতে বিপ্লবদর্শন, সমাজদর্শনে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের সংযুক্তি; কল্লোল, কালিকলম, প্রগতির হাত ধরে রোমান্টিসিজম ধারা থেকে বেরিয়ে এসে সাহিত্যে বাস্তববাদিতার যাত্রা শুরু হয়েছিল। জগদীশ গুপ্তের হাত ধরে বাংলা কথাসাহিত্যে যে বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস সৃষ্টি হয়েছিল তা আরও ব্যাপ্তি পেয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে মাঝি, শ্রমিক, ক্ষয়িষ্ণু মানুষ, গ্রামকেন্দ্রিক বা শহরকেন্দ্রিক জীবনের ব্যক্তিসর্বস্ব চিত্র নিপুণভাবে ফুটে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যে। অপরদিকে, বাংলাদেশের সাহিত্যে আলাউদ্দিন আল আজাদ, রশীদ করিম, রিজিয়া রহমান, সেলিনা হোসেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ ঔপন্যাসিকের হাত ধরেই বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ও রাজনীতি স্থান করে নিয়েছে সাহিত্যে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও পূর্বসূরিদের মতো সমকালীন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা তুলে ধরেছেন তার কথাসাহিত্যে। ইলিয়াসের উপন্যাসের বিষয়বস্তুর পাশাপাশি ভাষারীতি ও আঙ্গিক বাংলা সাহিত্যে একেবারেই ব্যতিক্রম। তিনি লেখকের ভাষা ও চরিত্রের ভাষাকে আলাদাভাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে মূলত তৎকালীন সময়কে ধরতে চেয়েছেন সাহিত্যের ফ্রেমে, সময়কে ফ্রেমবন্দি করতে গিয়েই নির্মাণ করেছেন অবিস্মরণীয় কিছু চরিত্র যারা তাঁদের ভাষার মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠেছেন গণপ্রতিনিধিত্বশীল। এক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছে বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের নানান দিক। বাখতিনের মনন, দর্শন গঠনের পেছনে যেমন তাঁর শৈশব, কৈশোরের জীবনাভিজ্ঞতা কার্যকরী ছিল, যেখান থেকে তিনি উপন্যাসতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলো আবিষ্কার করেছিলেন; একইভাবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জীবন ও দর্শনেও তাঁর সময়, সমাজ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল যেখান থেকে তিনি রচনা করেছেন তাঁর কালজয়ী রচনা *চিলেকোঠার সেপাই* ও *খোয়াবনামা* উপন্যাসদ্বয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মূলত তাঁর গদ্যভাষা ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্যই বাংলা কথাসাহিত্যে অনন্য হয়েছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচন ও ভাষারীতি নির্মাণে *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে বাখতিনের তত্ত্ব কার্যকরী ভূমিকা আছে বলে মনে হয়। উপন্যাসটিতে বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের কী কী তত্ত্ব কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে তা উদ্‌ঘাটন করা উক্ত প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গবেষণার যৌক্তিকতা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের ভাষার মধ্য দিয়ে চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতা, রাজনৈতিক দর্শন প্রতিফলন ছাড়াও তৎকালীন সময়কে ধরতে চেয়েছেন ক্রনোটাইপ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য- বহুপ্রেক্ষাপট, সংলাপধর্মীতা, কার্নিভাল এবং ক্রনোটাইপ প্রভৃতি তত্ত্ব পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোর ভাষাবিশ্লেষণে উপেক্ষিত থাকায়। এ গবেষণা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করবে। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে এই গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় তাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, যেখানে ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসের ভাষা ও শৈলীকাঠামো গঠনে ঔপন্যাসিক বাখতিনের কী কী তত্ত্ব অনুসরণ করেছেন তা বিশ্লেষণ করা হবে। বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের পাশাপাশি উপন্যাসের ভাষার আলংকারিক এবং ব্যাকরণিক পরিচর্যাগুলোও বিশ্লেষণ করা হবে। এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক সাহিত্যতত্ত্ব ও পূর্ববর্তী গবেষণাকে সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

পূর্ব গবেষণা সমীক্ষণ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসের ভাষায় বাখতিনের বহুস্বর প্রসঙ্গ শীর্ষক রচনায় গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন উৎস থেকে উপাত্ত নেওয়া হয়েছে। বিশ্বজিৎ ঘোষ রচিত *বাংলাদেশের সাহিত্য*, শহীদ ইকবালের *বাংলাদেশের সাহিত্য* ও *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মানুষ ও কথাশিল্প* বইয়ে *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও ভাষা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এ সকল বইয়ে উপন্যাসটির ভাষার আঙ্গিক, শিল্পরীতি, তত্ত্ব পর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়নি। ফলে তাত্ত্বিক কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসটির বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজনীয় অনুভূত হওয়ায় এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণায় প্রয়াসী হয়েছি।

গবেষণার বিস্তারিত আলোচনা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর সমগ্র জীবনে উপন্যাস লিখেছেন মাত্র দুটি। প্রথমটি *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৭), দ্বিতীয়টি *খোয়াবনামা* (১৯৯৬)। বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্র চিত্রণ ও শৈল্পিক আঙ্গিকের দিক থেকে এ দুটি উপন্যাস নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর রচিত উপন্যাসে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির নান্দনিক শিল্পরূপ দিয়েছেন। বিষয় নির্বাচন ছাড়াও তিনি তাঁর গদ্যভাষার জন্যেও হয়েছেন অনন্য। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের বিষয়বস্তু রাজনৈতিক। *চিলেকোঠার সেপাই*

উপন্যাসের কাহিনির দুটি অংশ; এক. মেট্রোপলিটন ঢাকার ঊনসত্তর; দুই. যমুনার তীরবর্তী অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজবাস্তবতা। উপন্যাসে ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী, শ্রমিক শ্রেণির প্রতিক্রিয়া ও আচরণ, শহরের মহাজন-শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব ও গ্রামের শোষকদের শোষণ, নির্যাতন তুলে ধরতে গিয়ে ইলিয়াস উপন্যাসে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন বহুমানুষের মুখনিঃসৃত বহুভাষা। উপন্যাসটিতে একইসাথে বাখতিনের বিখ্যাত তত্ত্ব বহুবাস্তবসমন্বিত প্রেক্ষাপট ও বহুস্বরের রূপায়ণ ঘটেছে। বহুস্বরকে বাস্তবায়ন করতে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সচেতনভাবেই কার্নিভাল ও ক্রনোটাইপ তত্ত্বও এনেছেন 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর বর্ণনা ও চরিত্রের সংলাপে।

বাখতিনের ভাষাতত্ত্ব বলতে মূলত তাঁর উপন্যাসতত্ত্বকেই বোঝায়। তিনি উপন্যাসের সাহিত্যরূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে ভাষাবিষয়ক যে আলোচনাগুলো করেছেন, সেগুলোই বাখতিনের ভাষারীতি হিসেবে পরিচিত। বাখতিনের উপন্যাসের ভাষার উল্লেখযোগ্য দুটি বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে, বহুস্বর (Polyphony) ও বহুপ্রেক্ষাপট (Heteroglossic)। বহুপ্রেক্ষাপট শব্দটিকে অন্যভাবে বহুবাস্তবসমন্বিত- পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট বললে ব্যাপারটা আরো খোলাসা হয়। সমাজে যেহেতু বহু শ্রেণির মানুষের বসবাস, তাই স্বাভাবিকভাবেই একেক চরিত্র ও শ্রেণি বা প্রেক্ষাপটের মানুষ আলাদা আলাদাভাবে কথা বলে। অর্থাৎ মানুষের কথা বলার ধরন, ভঙ্গিমা, ভাষা একেবারেই আলাদারকম। এইরকম বহুস্বর কিংবা বহুধরনের ভাষা থেকে মূলত বহুপ্রেক্ষাপটের মানুষের জীবনবোধ, জীবনাদর্শই সাহিত্যকে জীবন্ত ও বাস্তব করে তোলে। বাখতিনের ভাষার অপর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সংলাপময়তা (Dialogism)। উপন্যাসে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর ও মতামত পরস্পরের সঙ্গে সংলাপে যুক্ত হয়। এই সংলাপ শুধু চরিত্রের মধ্যে নয়, লেখক, পাঠক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যেও ঘটে। বাখতিনের মতে, 'ভাষা কখনো নিরপেক্ষ বা একক হয় না; এটি সব সময় অন্য ভাষার সঙ্গেই সংলাপরত থাকে।

'Discourse in the Novel' নামক নিবন্ধে বাখতিন সাহিত্য রচনার নতুন নতুন তত্ত্ব উত্থাপন করেছেন। এই নিবন্ধেই তিনি বলেছেন, "পরস্পর-বিরোধী ও ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বরের মিথস্ক্রিয়া সৃজনী উদ্যোগের উৎস"। এই নিবন্ধেই বাখতিন নতুন একটি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করেছেন- 'heteroglossia' বা বহুপ্রেক্ষাপট। এই বহুপ্রেক্ষাপটের পরিসরে সক্রিয় থাকে আধিপত্য-বিরোধী প্রতিবাচন; যেখানে জেগে ওঠে কার্নিভাল। বাখতিনের তত্ত্ববিশ্বে দ্বিবাচনিকতার পরেই কার্নিভালের স্থান। 'Rabelais and his world' বইয়ে বাখতিনের কার্নিভাল তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। যেখানে দেখিয়েছেন হাসি ও ব্যঙ্গ হয়ে ওঠে মুক্তিকামী শক্তির প্রতীক।

বাখতিনের মতে, প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকামী লোকায়ত মনন

'কার্নিভাল চেতনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এদিক থেকে বলা যায়, কার্নিভাল হচ্ছে- গতি ও পরিবর্তনের চলিষ্ণুতার প্রতীক। বাখতিন কার্নিভালকে দেখিয়েছেন তাৎপর্য-প্রতীতির জটিল পদ্ধতি হিসেবে। এই পদ্ধতি সাহিত্য প্রকরণ থেকে উদ্ভূত নয়, বরং বহু শতাব্দী ধরে সঞ্চিত লোক-ঐতিহ্য যেমন- লোক-উৎসব, কথকতা, গাথানাট্য, গোষ্ঠীগত অনুষ্ঠান ইত্যাদি থেকে আহৃত উপকরণের সংশ্লেষণে অর্জিত প্রতীকী অথচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকরণ এর উৎসভূমি। আঞ্চলিক জনজীবনে প্রচলিত ব্যঙ্গ-পরিহাসময় আখ্যান থেকে কার্নিভালের প্রতীতি হতে পারে। এছাড়াও চিত্রকল্প, ভাষা ও কথাবস্তুর মধ্যে কার্নিভালের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। বাখতিন মার্ক্সবাদ দ্বারা প্রভাবিত হলেও মার্ক্সবাদ অপেক্ষা সমসাময়িক টালমাটাল সমাজের অভিঘাত বেশি কার্যকর হয়েছিল। রাবেলে ও তাঁর জগৎ, দস্তয়ভস্কির নন্দন বিষয়ক সমস্যাবলি, দ্বিবাচনিক কল্পনা, বাচন-মাধ্যম ও অন্যান্য রচনায় মার্ক্সীয় সাংস্কৃতিক ও তত্ত্বপ্রস্থানকে বাখতিন নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। তিনি লোকসমাজের অভিব্যক্তিকে উপেক্ষা না করে, তার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন সঞ্জীবনী সুধা। কারণ লোকায়ত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি বয়নের শরীর ও আত্মাকে নির্মাণ করে। বাখতিনের ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে কার্নিভাল শব্দের মধ্যে লোকজীবনের অনুষঙ্গ খুবই স্পষ্ট। *রাবেলে বিষয়ক* বইতে তিনি লেখেন- 'জনসাধারণ কার্নিভালকে দেখে না কেবল-তারা এর মধ্যে বাসও করে। বলা ভালো, প্রত্যেকে থাকে এতে' (ভট্টাচার্য, ২০০৯: ৮৩)।

অর্থাৎ জনগণের সমগ্র অংশ কার্নিভালের সঙ্গে যুক্ত। যখন কার্নিভাল চলতে থাকে, তার বাইরে জীবনের কোনো স্পন্দন থাকে না। যেহেতু এর পরিসরের কোনো সীমান্ত নেই, একে কেউ এড়াতে পারে না। কার্নিভাল যখন চলে, কেবল তারই নিয়ম অনুযায়ী জীবন-যাপন করা সম্ভব; তবু এর মধ্যে সবাই স্বাধীনতা ভোগ করে। সমগ্র জগতের পুনরোদয় ও পুনর্নবায়নকে কেবল তারাই অনুভব করতে পারে যারা কার্নিভালে অংশ নেয়।

বাখতিনের বক্তব্য নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চেতনাই কার্নিভালের আকল্প গড়ে তুলেছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবকে বলা যেতে পারে শোষিত-নিপীড়িত-প্রান্তিকায়িত মানুষের উজ্জীবনের উৎসব। এ কেবল বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর যান্ত্রিক প্রবর্তনা নয়; রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের আরোপিত দীর্ঘতম অমারাত্রির পর এ যেন উজ্জ্বল ভোরের কুসুমিত হয়ে ওঠা। প্রতিটি মানুষ সেখানে নবনির্মাণের হোতা এবং লক্ষ্যস্থল।

বাখতিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হচ্ছে-ক্রনোটপ। ক্রনোটপ বলতে সময় ও পরিসরের পর্যায়ক্রমকে বোঝায়। শিল্পী সাহিত্যিকেরা মানবজীবনকে সর্বদা জনজগতের নির্দিষ্ট পরিসরে ও সময়ে যথাপ্রাপ্ত অবস্থানে পর্যবেক্ষণ করেন। অর্থাৎ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা অনৈতিহাসিক কিংবা অসামাজিক বা সময়নিরপেক্ষ নয়।

উপন্যাস মূলত মানবিক অস্তিত্বকে ইতিহাসের পরিসরে ও কালের মাত্রায় দেখানোর দায়িত্ব নেয়। বাখতিনের মতে, উপন্যাস প্রকরণের ক্রমবিকাশ প্রধানত হচ্ছে- 'a chronotopic understanding of the human being as saturated in historical existance' (ভট্টাচার্য, ২০০৯: ৮৩)।

মিখাইল বাখতিন একজন রাশিয়ান দার্শনিক, সাহিত্য সমালোচক যিনি সাহিত্যতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র এবং সাহিত্যের ভাষা নিয়ে কাজ করেছেন। উপন্যাসের সাহিত্যরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি ভাষাকে অবলম্বন করেছেন। মোহাম্মদ আজমের মতে,

> কাজটা তিনি করেছেন ভাষাকে কেন্দ্রে রেখে এবং ভাষাকে অবলম্বন করে। ভাষাকে দেখেছেন জীবনের বৈচিত্র্য ও সমগ্রতার লীলাক্ষেত্র হিসেবে। ইউরোপীয় ইতিহাসের লম্বা পাটাতনে জীবন ও ভাষার পারস্পারিকতা আবিষ্কার করেছেন তার বিশদ কথামালায়। আর ভাষায় জায়মান বহুবিচিত্র জীবনের যথার্থ আধার হিসাবে পাঠ করেছেন উপন্যাস। বাখতিনের উপন্যাসদর্শন এ কারণে তাঁর জীবনদর্শনও বটে (আজম, ২০১৫: ১)।

বাখতিনের মতে, রচয়িতার দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, বহুবাস্তবসমন্বিত বাস্তবতায় বিদ্যমান ভাষাগুলোর জুতসই ইমেজ তৈরি করা এবং এমনভাবে উপস্থাপন করা যেন তাদের বহুমাত্রিক পারস্পারিকতা সম্ভব হয়। বাখতিনের সাহিত্য বাস্তবের হুবহু অনুসরণ নয়, কিন্তু শৈল্পিক বাস্তব আর অনুকৃত বাস্তবের পারস্পরিকতা তাতে রক্ষিত হবে। ঠিক তেমনই উপন্যাসের ভাষাও বাস্তবের ভাষার হুবহু অনুকরণ নয়, বরং শৈল্পিক উপস্থাপনা:

> The central problem of the stylistics of the novel may be formulated as the problem of artistically representing language, the problem of representing the image of a language (Bakhtin, 1994).

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইউরোপীয় উপন্যাসের শৈলীর উপর ভিত্তি করে উপন্যাসের দুটি ধারা শনাক্ত করেছেন বাখতিন (Bakhtin, 1994: 367-415)। প্রথম ধারার উপন্যাসগুলোতে বহুবাস্তবসমন্বিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট এবং সংলাপায়িত হলেও বহুস্বর বা বিচিত্র বাস্তব গুরুত্ব পায়নি। অপরদিকে, দ্বিতীয় ধারার উপন্যাস বহুবাস্তবের সমন্বয়কে গুরুত্ব দিয়েছে; চরিত্রের ভিন্নতা সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে অন্যের ডিসকোর্স অন্যের ভাষায় উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য *Problems of Dostoevsky's Art,* পুশকিনের *ওনেগিন* গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য।

Problems of Dostoevsky's Art বইয়ের পরিবর্ধিত সংস্করণে বাখতিন দাবি করেছেন দস্তয়ভস্কি বহুস্বর উপন্যাসের আবিষ্কর্তা এবং দস্তয়ভস্কির উপন্যাসে বহুস্বর প্রসঙ্গে বাখতিন বলেছেন-

> A plurality of independent and unmerged voices and consciousness, a genuine polyphony of fully valid voices is in fact the chief characteristic of Dostoyevsky's novels (Bakhtin, 1999: 6).

এছাড়াও বাখতিন উপন্যাসের আদর্শ হিসেবে পুশকিনের *ওনেগিনকে* গ্রহণ করেছেন, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন, উপন্যাসে বিভিন্ন ভাষা ও শৈলীর ধরন একসাথে বিরাজ করে, যাকে বলা যায়: heterogenous linguistic and stylistic forms. আবার বেলিনস্কি পুশকিনের উপন্যাসকে 'রুশজীবনের কোষগ্রন্থ' বলেছেন কারণ তাঁর উপন্যাসে রুশজীবন সমস্ত স্বরে কথা বলে, যুগের সমস্ত ভাষা ও শৈলীতে কথা বলে।

বুঝতে হবে উপন্যাসের ভাষা-শৈলী আর ঔপন্যাসিকের ভাষা-শৈলী দুটো সম্পুর্ণ আলাদা। উপন্যাসে ভাষার ধরণ ও ব্যবহার নিয়ে বাখতিনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ll essentially novelistic images share this quality: they are internally dialogized images –of the languages, styles, world views of another (all of which are inseparable from their concrete linguistic and stylistic embodiment). The reigning theories of poetic imagery are completely powerless to analyze these complex internally dialogized images of whole languages (Bakhtin, 1994: 47).

আবার, উপন্যাসের বহুভাষা মানে বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণ নয়; বরং ভাষাগুলোর অনন্য শৈল্পিক ব্যবস্থা, যেখানে ভাষাগুলো একই তলে অবস্থান করে না। এমনকি রচয়িতার ভাষাও তাই, অন্যের ভাষা সরাসরি বা অনুকরণমূলকভাবে আত্মসাৎ করেই এর অস্তিত্ব। যে ভাষা রচয়িতার ভাষা বলে মনে হয়, উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে না থাকলেও, স্বরে-সুরে তা অন্যের ভাষাই বটে। পদ্ধতিগতভাবে উপন্যাসের ভাষা–বিশ্লেষণ কথাটার কোনো অর্থই হয় না, কারণ এ ধরনের কিছু আদতে নাই (Bakhtin, 1994: 416), বরং উপন্যাসে থাকে ভাষাগুলোর শৈল্পিক গ্রন্থনা, আরো ভালো হয় বললে ভাষাগুলোর ইমেজের শৈল্পিক গ্রন্থনা।

ভাষা যখন সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তা স্বতন্ত্র ডায়ালেক্টে রূপ নেয়। তার বিন্যাস আলাদা, বিভিন্ন ভাষাকে পারস্পারিক করে তোলার ধরন আলাদা। সেখানে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকে না। একাকার হয়ে যায়। বাখতিন উদাহরণস্বরূপ বলেছেন- গ্রামের একজন কৃষক কয়েকটি ভাষা ব্যবহার করে: তার প্রার্থনার ভাষা, গানের ভাষা, সংসারের কথোপকথনের ভাষা, কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লেখার ভাষা ইত্যাদি। আলাদা করে ব্যবহারের সময় সে বিশেষ সতর্কও থাকে না। কিন্তু তার এই ভাষা যখন জাতীয় সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন তার রূপান্তর ঘটে। উপন্যাস এবং যেকোনো গদ্য রচনা বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত বা উচ্চারণের বাস্তব মুহূর্তকে অনেক বেশি মূল্য দেয়। কথারা সেখানে কথারত ব্যক্তির উচ্চারণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। বাখতিনের মতে এটাই উপন্যাসের মূলভিত্তি:

> ... the fundamental condition. That which makes a novel a novel, that which is responsible for its stylistic uniqueness, is the speaking person and his discourse (Bakhtin, 1994: 332).

ইলিয়াস কথাসাহিত্যে মূলত সংক্ষুব্ধ সময় ও সমাজকে আঁকতে চেয়েছেন, বাখতিনের ভাষায় যাকে বলা যায় ক্রনোটাইপ। উপন্যাস যেহেতু একটা বড়ো সময় এবং বহু মানুষের জীবন ফুটিয়ে তোলে তাই উপন্যাস থেকেই সেই সময়ের প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসে আমরা যেসব মানুষ এবং সময় দেখি, তা মূলত একটি সংক্ষুব্ধ সময়কেই প্রতিনিধিত্ব করে। কথাসাহিত্যের ফর্ম নিয়ে ইলিয়াস বলেন-

> উপন্যাস গঠিত হবে সেইভাবে, যাতে করে নতুন ভাবনাকে ঠিকমতো ধারণ করতে পারে। নইলে এই সময়ের মানুষের বেদনা ও বিক্ষোভ, সংকট ও সংকল্পের তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবেদন দেওয়া উপন্যাসের সাধ্যের বাইরে চলে যাবে (ইউসুফী, ১৯৯২: ২১৫)।

সাহিত্যে ভাষার আঙ্গিক নিয়ে ইলিয়াস যেমন সচেতন ছিলেন, একই রকম সতর্ক ছিলেন চরিত্র সৃষ্টি নিয়েও। তিনি তার উপন্যাসের ঘটনা, বিষয়বস্তু অনুসারে চরিত্র নির্বাচন করেন এবং চরিত্রের ভেতর দিয়ে ডিটেইল বর্ণনা করেন। প্রতিটি মানুষের আচার-আচরণ সমাজ নিয়ন্ত্রিত আবার মানুষের প্রবৃত্তিগুলোও তার শ্রেণির বাইরে না। এ প্রসঙ্গে শহীদ ইকবালের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

> ইলিয়াস তার চরিত্রে শ্রেণিভাবনাকে প্রবৃত্তির সঙ্গে জুড়িয়ে দেন। একটা ক্ষেত্র বা রেঞ্জ থেকে তা নিয়ন্ত্রিত। ইলিয়াস যেটাকে বলেন Standard of living বা জীবনযাত্রার মাপকাঠি। এ মাপকাঠির বিবেচনায় সে জীবনসঙ্গী বেছে নেয়। কিংবা বিকৃত যৌনলালসা বা নিঃসঙ্গতার পরিপূরক হিসেবে যৌনসঙ্গী কামনা করে। বিষয়গুলো নির্ভর করে সমাজ, মর্যাদা বা তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সফলতার ওপর (ইকবাল, ২০১৯: ২২)।

ইলিয়াসের এই যে নতুন ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা আবার বহু চরিত্র সৃষ্টি কিংবা ভাষায় বহুমানুষের স্বরের উপস্থিতি এই বিষয়গুলোই বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের মূল বিষয়। বাখতিনের তত্ত্বগুলো ইলিয়াসে এতটাই কার্যকরী যে, কোনোভাবেই মনে হয় না বাখতিন বিদেশি সাহিত্য নিয়ে এই তত্ত্বগুলো উপস্থাপন করেছেন। বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব নিয়ে অধ্যাপক মোহাম্মদ আজমের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য-

> উপন্যাসের ময়দান এক বাস্তবলিপ্ত অনিরূপিত বর্তমানের জগৎ, যেখানে মিলিত হতে পারে অভিজ্ঞতার বিচিত্র তল, ভাষা, মতাদর্শ আর দৃষ্টিভঙ্গির বহু রূপ। এই মিলনক্ষেত্রে এসে জোটে সাহিত্য-বহির্ভূত নানা উপাদানও- প্রাত্যহিক জীবন আর আদর্শিক নানা উপাদান। হয়ত নৈতিক স্বীকারোক্তি, দার্শনিক রচনা, রাজনৈতিক ইশতেহার ইত্যাদিও। উন্মেষের কালেই উপন্যাস ব্যক্তিগত ও সামাজিক বাস্তবের এ রকম সাহিত্য-বহির্ভূত নানা রূপে হাত পেতেছিল। পরের ধাপে চিঠি, ডায়েরি, আত্মস্বীকারোক্তি, কোর্টের বয়ান ইত্যাদিও ব্যবহার হয়েছে (আজম, ২০১৫: ৩)।

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসে অজস্র চরিত্রের সমাগম। একেক চরিত্রের মুখের ভাষা একেক রকম। ঔপন্যাসিকের ভাষার পাশাপাশি শিক্ষিত শ্রেণি, শ্রমজীবী শ্রেণি, মহাজন, রাজনীতিবিদের ভাষা ছাড়াও আঞ্চলিক ভাষা উপন্যাসটিকে দিয়েছে হেটারোগ্লসিয়ার মাত্রা। বহুচরিত্রের বহুস্বরর ভেতর দিয়ে মূলত বহু মনস্তত্ত্ব উঠে

এসেছে। এছাড়াও, উপন্যাসটিতে নারীদের ভাষাও লক্ষণীয়। গৃহকর্মী জুম্মনের মা, বজলুর বউয়ের সংলাপের ভেতর দিয়ে পুরান ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা ও নিম্নবর্গীয় নারীদের জীবন-যাপন, ঝগড়াটে চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। ঈদের দিনে সিনেমা হলে বজলুর টিকেট ব্ল্যাকের ঘটনায় জুম্মনের মা ও বজলুর বউয়ের ব্যঙ্গাত্মক সংলাপের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনবাস্তবতাই ফুটে উঠেছে। বাখতিন যাকে অভিহিত করেছেন কার্নিভাল হিসেবে, যার ভেতরেই চলে মানুষের বসবাস। বজলুর বউকে খোঁচা দেওয়ার জন্য বজলুর চরিত্র নিয়ে নেতিবাচকভাবে যখন জুম্মনের মা বলে-

> চোট্টাগুলির আউজকা বেলাক করনের দিন! চান্দে চান্দে পুলিসের চোদন না খাইলে চোট্টাগো গতরের মইদ্যে ফোসকা পড়বো না? হাজত না চোদাইয়া বৌ পোলাপানের ভাত দিবার পারে না, হেই চোট্টা মরদের মুখের মইদ্যে আমি প্যাসাব করি (ইলিয়াস, ২০১৬: ৪৭)।

এর প্রেক্ষিতে বজলুর বউয়ের প্রতিউত্তর-

> চোট্টাও হইতে পারে, বেলাক ভি করবার পারে। মগর ভাতার আমাগো একটাই! একখান ভাউরারে গলার মইদ্যে সাইনবোর্ড বাইন্দা আমরা দুনিয়া ভইরা মানুষরে মারা দিয়া বেড়াই নাচ (ইলিয়াস, ২০১৬: ৪৭)।

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের ঘটনা সম্পূর্ণই রাজনৈতিক হওয়ায় এর ভাষাগুলোতে রাজনৈতিক শব্দচয়নের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। দেশের রাজনৈতিক ক্রাইসিসের পাশাপাশি আইয়ুব খানের অনুসারী বিডি মেম্বাররা আইয়ুব খানের নাম ভাঙিয়ে গ্রামে কীভাবে অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল তার একটা খণ্ডচিত্রই দেখা যায় উপন্যাসটিতে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, শেখ মুজিবের নেতা হয়ে ওঠার সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতও পাওয়া যায় উপন্যাসটিতে। কিন্তু গ্রামের মানুষ শহরে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা নিয়ে বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল না থাকলেও তারা স্বস্থানেই হয়েছেন নির্যাতিত। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাস মূলত দীর্ঘদিন যাবৎ শোষিত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ইতিহাস। পুরো উপন্যাস পড়লে ইংরেজি একটা প্রবাদই বারবার মনে হয়- United we stand, divided we fall. '৬৯-এ ঢাকায় গণ-আন্দোলন মূলত ঐক্যের পরিচয়ই বহন করে। জাত-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-দরিদ্র-শিক্ষিত-অশিক্ষিত-শ্রমজীবী মানুষ সবার অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে কীভাবে স্বৈরশাসকের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তার শৈল্পিক প্রকাশ *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাস। উপন্যাসের সবচেয়ে বড়ো স্বৈরশাসক আইয়ুব খান হলেও তাকে আমরা কোথাও দেখি না, শুধু এক জায়গায় তার ছবি পোড়ানোর ঘটনা দেখা যায়-

> আইয়ুব খানের মস্ত ১টা ছবি রেখে সেই স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো।... আগুনের শিখার চারপাশে স্লোগান ওঠে, 'দিকে দিকে আগুন জ্বালো'- 'আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো! 'জাগো জাগো-'বাঙালি জাগো (ইলিয়াস, ২০১৬: ১৪৫)।

অপরদিকে, আইয়ুব খানের লেখা বই পোড়ানোর ঘটনাও উপন্যাসের আন্দোলনকে

করেছে বেগবান যা থেকে আন্দোলনের সময় ও পরিবেশ আঁচ করা যায়। আইয়ুব খানের ছবি ও বই পোড়ানোর মধ্য দিয়ে মূলত প্রতীকীভাবে আইয়ুব খানকেই দাহ করা হয়েছে-

> মঞ্চের ওপর থেকে এবং মঞ্চের পেছনের গ্যালারি থেকে ছুঁড়ে ফেলা মোহাম্মদ আইয়ুব খানের 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স' বইয়ের বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে তার রচয়িতার ওপর। ... বই ছাড়াও কাগজ, ছেঁড়া কাপড়, পুরনো টায়ার, টুকরো কাঠ ও জুতাস্যান্ডেলের জ্বালানির নীচে ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান ক্ষীণ কণ্ঠে ঘেউ ঘেউ করে। কিন্তু তাকে দেখা যায় না (ইলিয়াস, ২০১৬: ২০২)।

উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে যখন কারফিউ জারি করা হয় এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক জনগণকে দমন করার চেষ্টা করা হয় তার দৃশ্য বর্ণনায়ও লেখকের শক্তিশালী ভাষা দেখা যায়। বাখতিন উপন্যাসে যে ক্রনোটাইপের কথা বলেছেন, তা সবচেয়ে জুতসইভাবে ফুটে উঠেছে '৬৯-এর উত্তাল পরিস্থিতি, সরকারি দমন-পীড়ন এবং জনগণের আর্তচিৎকারের বর্ণনার মধ্যদিয়ে -

> কালচে হলদে আলোয় মিলিটারিদের মুখ দ্যাখা যায় না, ঘন জলপাই রঙের হেলমেট তাদের মাথার ওপরকার অন্ধকারকে গাঢ় করে তুলেছে। মিছিল তখন শতগুণ জোরে ভরা গলায় প্রতিবাদ জানায়, 'মানি না! মানি না!... ... টিনের ঢালে ঢালে শিলাবৃষ্টি বাজে, আগুনের শিলাবৃষ্টি: টং টং! সঙ্গে সঙ্গে এর সঙ্গে যুক্ত হয় 'বাবা গো! মা গো! 'আল্লাগো! 'বাঁচাও! 'পানি! প্রভৃতি আর্তনাদ (ইলিয়াস, ২০১৬: ২৪১)।

বই পোড়ানোর মধ্যদিয়ে আইয়ুব খানের পতন কিংবা দাহ প্রতিকায়িত হলেও রহমতউল্লাহ, খয়বার গাজীর পরিণতি আমরা সরাসরিই দেখি। রহমতউল্লাহর রিকশার গ্যারাজ লুট, খয়বার গাজীকে আটক করে তাকে মেরে ফেলার হুমকি প্রভৃতি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা মূলত এই শোষিত মানুষগুলোরই আর্তনাদ। গ্রামের মানুষজন যখন আফসার গাজী, খয়বার গাজী, হোসেন আলীর বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে তারা সকলেই তখন পলাতক। গ্রামের মজলিশে বিচারকাজ শুরু হলে জনতা রশিদ মিয়ার বিচারের শাস্তি কী জানতে চাইলে আলিবক্স যখন বলে যে তারও শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে তখন একজন দাবি জানায়-

> রশিদ মিয়ার হোল আর বিচি ক্যাটা, ছেঁচ্যা নুন-মরিচ দিয়ে ভর্তা কর‍্যা কুত্তাক খিলাও (ইলিয়াস, ২০১৬: ২৪১)।

সাধারণ মানুষের এই রাগের কারণ হচ্ছে রশিদ মিয়ার নারীলোভী, নারীলিপ্সু কর্মকাণ্ড। ক্ষমতার দাপটে কৃষকদের অত্যাচার করে তাদের সম্পত্তি দখল, তাদের স্ত্রীদের ভোগ করার ফলে তার ওপর দীর্ঘদিনের ক্ষোভ জমা হতে থাকে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই উক্তিতে। আবার বাখতিন প্রবর্তিত কার্নিভালেরও স্পষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায় লেখকের বর্ণনায়-

> তার লিঙ্গ ও অন্ডকোষ সহযোগে এই খাদ্যবস্তু প্রস্তুতের প্রস্তাবে অনেকেই হাসে, তবে কেউ প্রতিবাদ করে না। কারণ নারী সহবাস হলো রশিদ মিয়ার সবচেয়ে প্রিয় অভ্যাস (ইলিয়াস, ২০১৬: ২৪১)।

উপন্যাসে ইলিয়াস চেতনাপ্রবাহরীতি বা stream of consciousness-এর মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড দৃশ্য জোড়া দিয়ে গণ-আন্দোলনের বিক্ষুব্ধ সময়ের উত্তাল পরিবেশকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে মূলত দুধরনের ভাষা থাকে, প্রথমত লেখকের ভাষা এবং দ্বিতীয়ত চরিত্রের ভাষা বা সংলাপ। লেখকের বর্ণিত ভাষা থেকে কোনো সময় বা চরিত্রের মনোজাগতিক ক্রিয়াকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়-

> .৩০৩ রাইফেলের একটি গুলি তার বুককে গেঁথে রেখেছে দেওয়ালের সঙ্গে। মাথাটা বা দিকে ঝুলছে। বুকের নিচে তার দীর্ঘ শরীর রেলিঙে মেলে দেওয়া শাড়ির মতো আস্তে আস্তে কাঁপে। শীতেও কাঁপতে পারে, বাতাসেও কাঁপতে পারে। যুবকের মুখ হাঁ করা, মনে হয় প্রচণ্ড ১টি চিৎকার সেখানে জমে রয়েছে; বলা যায় না, যে কোনো সময় এই পুরনো দালান ফাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে (ইলিয়াস, ২০১৬: ১০)।

উল্লিখিত বর্ণনা মূলত কাল্পনিক, একই সাথে প্রতিকায়িত। লেখক এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে মূলত সমগ্র দেশের আন্দোলনরত অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। মরদেহ কখনোই রাইফেলের গুলি দিয়ে দেওয়ালের সাথে আটকানো সম্ভব না। এই দেহ মূলত সংক্ষুব্ধ বাংলাদেশের দেহ, যা কিনা তৎকালীন স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের নির্দেশে রক্তাক্ত ছিল। মেলে দেওয়া শাড়ির কম্পমান উপমা দিয়ে বাংলাদেশের কম্পমান চিত্রই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার যে হাঁ করা চিৎকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা আন্দোলনরত দেশকেই প্রতীকায়িত করে। কারণ রাজনৈতিক শোষণ, শাসন, বঞ্চনার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের বুকের ভেতর একটি সুপ্ত চিৎকার লুকায়িত ছিল, যা ১৯৬৯-এ সত্যিই শুধু দালান ফাটিয়ে না, দেশ ফাটিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

ইলিয়াস অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানুষের মনস্তত্ত্বকে উপন্যাসে আনার চেষ্টা করেছেন। প্রতিটা মানুষের মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী ভাষার যে বৈশিষ্ট্য তা-ই মূলত সংলাপে এসেছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলোর সংলাপের সাথে সাথে চরিত্রগুলোর বিশ্লেষণও এসেছে। ইলিয়াসের রচিত ভাষার মধ্যদিয়ে শ্রেণি মানসিকতা উঠে এসেছে নিম্নলিখিত বাক্যে। একটি অফিসের বর্ণানায় ইলিয়াস চার শ্রেণির মানুষ দেখিয়েছেন। এই মানুষের বক্তব্য থেকে অফিসের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। অফিসার শ্রেণির মানুষের যে অহংকার কিংবা নিজেকে বড়ো মনে করার চিত্র, তা ও দেখা যায় এই বর্ণনায়। ইলিয়াস শ্রেণি মানসিকতা দেখানোয় সজাগ ছিলেন পুরো উপন্যাস জুড়েই। ফলে আমরা দেখতে পাই, নিম্নবিত্তরা যে প্রতিবাদের সাহস বা শক্তি অর্জন করেছে, এই চিত্র উচ্চবিত্ত, উচ্চশিক্ষিতদের কাছে পছন্দনীয় নয়-

> খালি পিওনদের বলছেন কেন? রিকশাওয়ালা, বাস কন্ডাক্টর, ড্রাইভার, কুলি- এদের তেজটা দেখছেন? আরে আইয়ুব খান গেলে তোদের লাভটা কি? তোরা মিনিস্টার হবি? নাকি অফিসে এসে চায়ের টেবিলে বসবি? (ইলিয়াস, ২০১৬: ১৬)।

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের ভাষার সবচেয়ে স্বতন্ত্র বিষয় হচ্ছে ভাষার মধ্য দিয়েই সংলাপের পার্থক্য বোঝা যায়। সংলাপের মধ্য দিয়েই শ্রেণি মানসিকতা তুলে ধরার পাশাপাশি চরিত্রের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরেছেন নিপুণভাবে। দেশের শিক্ষিত অফিসার সমাজ দেশের সার্বিক অবস্থা দেখে জাতীয় সমস্যার কথা আলোচনার মধ্য দিয়ে তাদের শ্রেণিগত অবস্থান উঠে এসেছে। কথার মধ্যে ইংরেজি শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মূলত তাদের শ্রেণি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়-

> ক্যাওস কনফিউশন কন্টিনিউ করলে ফিউচার ইজ ভেরি ব্লিক। পলিটিক্স যাই থাক, নাথিং সাকসিডস উইদাউট ডিসিপ্লিন।'
>
> 'রিমোট কর্নারে ক্যাওস আরো বেশি।'
>
> এভরিবডি মাস্ট বি রিজনেবল। এ্যানার্কি শুড নেভার বি এলাউড টু কন্টিনিউ ফর ইনডেফিনিট পিরিওড।'
>
> 'এখন গভমেন্টের দ্যাখা দরকার এই আনরিজনেবল পিপলকে কন্ট্রোল করতে পারে কে? (ইলিয়াস, ২০১৬: ২১)।

গণ-আন্দোলনে স্লোগান সবচেয়ে বড়ো ও কার্যকরী ভূমিকা রাখে। একেকটা স্লোগানের মধ্য দিয়েই মূলত মানুষ একত্রিত হয়। এই স্লোগানগুলো মূলত দেশের জনগণের বৈষম্যগুলোকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। জনগণের দুর্ভোগ, বৈষম্য, অধিকারহীনতার মাত্রা যখন বেড়ে যায়, তখন তাদের প্রতিক্রিয়া স্লোগান হয়েই আসে। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের স্লোগানগুলো বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণির মুখনিঃসৃত শব্দ। স্লোগানগুলো থেকে তাদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, সামাজিক, রাজনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনার বিষয়গুলোই ফুটে উঠেছে। বছরের পর বছর ধরে চলা বৈষম্যের বিরুদ্ধে যখন মানুষ সোচ্চার হয়েছে, তখন তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর নিঃসৃত এই স্লোগানগুলো মানুষকে করেছে উদ্দীপিত ও একত্র। সরকারের বিরুদ্ধে শাহরিক মানুষের স্লোগানের পাশাপাশি মহাজনের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদী স্লোগান এবং গ্রামীণ শোষকদের বিরুদ্ধে প্রান্তিক মানুষদের জাগরণের দিকটিও ফুটে উঠেছে মূলত এইসব স্লোগানের ভেতর দিয়ে। মিখাইল বাখতিন উপন্যাসে যে বহুস্বরের কথা উল্লেখ করেছেন, চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের স্লোগানগুলো মূলত বাখতিন বর্ণিত সেই বহুস্বর-

> পিচ্চিরা এমনি এমনি ঘুরে বেড়ায়, কোথাও ৭/৮ জনের এক একটি গ্রুপ, কোথাও ৫/৬ জন ছাত্রের নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের মিছিল। মিছিলে স্লোগান দিচ্ছে, 'আইয়ুব শাহী, মোনেম শাহী'- 'ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক' 'আইয়ুব মোনেম ভাই ভাই'- 'এক দড়িতে ফাঁসি চাই' 'জ্বালো জ্বালো- 'আগুন জ্বালো'। আবার মাঝেমাঝে স্লোগান ভুল্‌ভাল হয়ে যায়। যেমন, 'আইয়ুব শাহী, জালেমশাহী'- এর জবাবে বলছে, 'বৃথা যেতে দেবো না।' কিংবা 'শহীদের রক্ত' - এর জবাবে বলছে, 'আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো (ইলিয়াস, ২০১৬: ১৫)।

উল্লিখিত স্লোগান ছাড়াও সমগ্র উপন্যাস জুড়ে আমরা আরও বহু স্লোগান দেখতে পাই, যা উপন্যাসের বক্তব্য তুলে ধরতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে-

> শহীদের রক্ত-বৃথা যেতে দেবো না' 'আইয়ুব শাহী জুলুম শাহী- ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক',

'পুলিসী জুলুম পুলিসী জুলুম'- 'বন্ধ করো বন্ধ করো।', 'দিকে দিকে আগুন জ্বালো।'- 'আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো।', 'আইয়ুবের দালালি,' 'আইয়ুবের দালালি-চলবে না, চলবে না।' 'শহীদের রক্ত-বৃথা যেতে দেবো না,' 'আবু তালেবের রক্ত- বৃথা যেতে দেবো না।', 'আইয়ুবের দালাল মাহাজন! ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক।', 'মাহাজনের জুলুম, মাহাজনের জুলুম- চলবে না চলবে না।', 'জাগো জাগো- বাঙালি জাগো।', 'পিন্ডি না ঢাকা? '- ঢাকা ঢাকা।', 'আগরতলা ষড়যন্ত্র'- 'মানি না মানি না।', 'আসাদের রক্ত- বৃথা যেতে দেবো না।', 'মাহাজনের গদিতে-আগুন জ্বালো একসাথে', 'ছয় দফার সংগ্রাম- চলবেই চলবে।', 'তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা মেঘনা যমুনা।'

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি চরিত্রের বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন। আখতারুজ্জামানের লেখা পড়লে খুব সহজেই চরিত্রের মনোজাগতিক ভাবনা ও জীবনবাস্তবতা আমাদের সামনে ধরা পড়ে যায়। কথায় কোনো রাখঢাক না রেখেই তিনি পরিবেশ, পরিস্থিতি, মনোজাগতিক চিন্তাচেতনা এমনভাবে ভুটিয়ে তোলেন, যেগুলো আপাতদৃষ্টে শ্রুতিকটু কিংবা অশ্লীল মনে হলেও মূলত চরিত্রের বাস্তবতাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এককথায় বলা গেলে, ব্যক্তিজীবনের যেসব ঘটনা মানুষ আড়াল করে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস শব্দের গাঁথুনি দিয়ে সেগুলোই বর্ণনা করে যান অবলীলায়। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে তাই রানুকে ঘিরে ওসমানের যেসব চিন্তা সেইসব বিবরণ পড়তে গিয়ে তাই অশ্লীলতার চাইতে ওসমানের জীবনবাস্তবতা, নৈসঙ্গতা, মধ্যবিত্ত মনোভাবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপন্যাসটিতে বহু মানুষের উপস্থিতি থাকায় ভাষার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই বহুমাত্রা। একটা উপন্যাসে একইসাথে এত ধরনের ভাষা ব্যবহার নিঃসন্দেহে সাধুবাদ প্রাপ্য। ঢাকা শহরের আন্দোলনকারীদের ভাষার মধ্যেও আছে বৈচিত্র্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে ভাষায় প্রতিবাদ করে, খিজির কিংবা পথশিশুদের প্রতিবাদের ভাষা তার সাথে মেলে না। উপন্যাসটির আরো একটা বড়ো বিশেষত্ব হচ্ছে, রহমতুল্লাহ, খয়বার গাজী শোষক চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাসে তাদের সংলাপ দেখা গেলেও গণ-অভ্যুত্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আইয়ুব খানের কোনো সংলাপই দেখা যায় না। ফলে মহাজন, গ্রামীণ শোষকের ভাষা থেকে তাদের চিন্তাচেতনা, কর্মকাণ্ড জানতে পারলেও আইয়ুব খানের মনস্তত্ত্ব জানতে পারি না। কিন্তু রহমতুল্লাহ, আলাউদ্দীন, খয়বার গাজীর ভেতর-বাহির আমাদের কাছে উন্মুক্ত তাদের কথার মধ্য দিয়েই। রহমতউল্লাহর মহাজনী আচরণ, তার শাসক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ মূলত তার মুখনিঃসৃত ভাষাই-

'আহারে এই চাইরশ পাঁচচল্লিশটার হ্যান্ডেলখান ছেঁইচা ভাতের চামিচ বানাইয়া দিছে! খানকির বাচ্চা! ইস! দুইশ আটপঞ্চাশের মাডগাড আমান রাখে নাই! খানকির পুতে মাডগাডের উপরে খাড়াইয়া হোগা মারা দিছিলি তর কোন বাপেরে? কইলি না?'

এ ছাড়াও,

খানকির বাচ্চা না হইলে রিকশা চালাইবার কাম কেউ লয় না। মাহাজনরে ক্যামনে ঠকাইবো হালারা থাকে খালি হেই তালে (ইলিয়াস, ২০১৬: ৩৬)

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের ঘটনা সম্পূর্ণই রাজনৈতিক হওয়ায় এর ভাষাগুলোতে রাজনৈতিক শব্দচয়নের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। দেশের রাজনৈতিক ক্রাইসিসের পাশাপাশি আইয়ুব খানের অনুসারী বিডি মেম্বাররা আইয়ুব খানের নাম ভাঙিয়ে গ্রামে কীভাবে অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল তার একটা খণ্ডচিত্রই দেখা যায় উপন্যাসটিতে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, শেখ মুজিবের নেতা হয়ে ওঠার সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতও পাওয়া যায় উপন্যাসটিতে। কিন্তু গ্রামের মানুষ শহরে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা নিয়ে বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল না থাকলেও তারা স্বস্থানেই হয়েছেন নির্যাতিত। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাস মূলত দীর্ঘদিন যাবৎ শোষিত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ইতিহাস। পুরো উপন্যাস পড়লে ইংরেজি একটা প্রবাদই বারবার মনে হয়- United we stand, divided we fall. '৬৯-এ ঢাকায় গণ-আন্দোলন মূলত ঐক্যের পরিচয়ই বহন করে। জাত-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-দরিদ্র-শিক্ষিত-অশিক্ষিত-শ্রমজীবী মানুষ সবার অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে কীভাবে স্বৈরশাসকের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তার শৈল্পিক প্রকাশ *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাস। উপন্যাসের সবচেয়ে বড়ো স্বৈরশাসক আইয়ুব খান হলেও তাকে আমরা কোথাও দেখি না, শুধু এক জায়গায় তার রচিত বই পোড়ানোর ঘটনা দেখা যায়। বই পোড়ানোর মধ্য দিয়ে আইয়ুব খানের পতন কিংবা দাহ প্রতীকায়িত হলেও রহমতউল্লাহ, খয়বার গাজীর পরিণতি আমরা সরাসরিই দেখি। রহমতউল্লাহর রিকশার গ্যারাজ লুট, খয়বার গাজীকে আটক করে তাকে মেরে ফেলার হুমকি প্রভৃতি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা মূলত এই শোষিত মানুষগুলোরই আর্তনাদ-

> শালা কথা কস না! শালা কুত্তার বাচ্চা কথা কস না!
>
> নবেজউদ্দিন- 'মাক্কুচোষা শয়তানকে বিরিঞ্চি থ্যাকা নামাও। হামারই গোরু, পয়সা দিয়া লিয়া আসা লাগে হামাকই।'
>
> 'রশিদ মিয়ার হোল আর বিচি ক্যাটা ছেঁচ্যা নুন-মরিচ দিয়ে ভর্তা কর্যা কুত্তাক খিলাও।
>
> চেংটু- এই মানুষের আবার নামাজ বন্দেগি কি? তামাম জেবন তাঁই মানষেক জ্বল্যা পুড়্যা মারছে। চুরি করছে! তার আবার নামাজের হাউস হয় কিসক? (ইলিয়াস, ২০১৬: ২৩৯-২৪১)।

আলাউদ্দিন মিয়াকে আন্দোলনকারীদের পক্ষের লোক বলে মনে হলেও সে যে ভেতরে ভেতরে রহমতউল্লার স্মার্ট ভার্সন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার সংলাপের ভেতর দিয়েই। জনগণের বিক্ষোভ, প্রতিবাদকে 'রাউডি' শব্দের ভেতর দিয়ে সে মূলত তাদেরকে উচ্ছৃঙ্খলকারী হিসেবেই বুঝিয়েছেন। আলাউদ্দিনকে পুরো উপন্যাসজুড়েই 'রাউডি' শব্দের ব্যবহার করতে দেখা যায়। আবার গ্যারেজের মানুষকে নিজেদের মানুষ বলে পরিচয় দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের আশ্রয়দাতা হিসেবেও তাকে শনাক্ত করা খুব সহজ-

> আলাউদ্দিন মিয়া খুব গম্ভীর হয়ে গেছে, 'পাবলিকে খুব রাউডি ব্যবহার করতাছে! করুক না! রিকশা দিতে দালালদের এতো আপত্তি কেন? '
>
> আরে মিয়া রাখেন!' আলাউদ্দিন মিয়া রাগে ফেটে পড়ে, 'নীলখেতে বইয়া দ্যাশ চালাইতে চান? নেতা হইয়া বইছেন! জানেন এদিককার বেশিরভাগ রিকশার গ্যারেজের মালিক আমাগো মানুষ! কলুটোলার হাফিজ মিয়ার গ্যারেজে গিয়া তার পোলারে মাইর দিছে, খবর পাইছেন? এগুলা সামলাইতে পারবেন? (ইলিয়াস, ২০১৬: ১৬৬)।

ভাষাকে আলংকারিক রূপ দেওয়ার জন্য লেখক ব্যবহার করেছেন ব্যাকরণিক শব্দ- প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা, আরবি-ফারসি শব্দ, ইংরেজি শব্দ, উপসর্গ, সমাস, দ্বিরুক্তি, ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রভৃতি। এছাড়াও উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস অলংকারের ভেতর দিয়ে উপন্যাসের ভাষা হয়েছে ব্যঞ্জনাময়।

শহরে কারফিউ জারি হলে ওসমান দ্রুত বাসায় ফিরতে গেলে পথিমধ্যে খিজিরের সাথে দেখা হলে খিজিরকে সে এড়িয়ে যেতে চায় কারফিউয়ের অজুহাতে। সময় স্বল্পতার জন্য খিজির তখন পরামর্শ দেয় ঠাটারি বাজার দিয়ে বের হওয়ার জন্য। লেখক উপমা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন পুরান ঢাকার রাস্তার চিত্র-

> বাঁদিকের রাস্তার মাথায় লম্বা লম্বা ইলেক্ট্রিক তার পড়ে রয়েছে মুখ থুবড়ে, বিদ্যুৎহীন তারগুলো নিস্পন্দ পড়ে থাকে মরা সাপের মতো (ইলিয়াস, ২০১৬: ১৪৮)।

আবার, খয়বার গাজী গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে পদুমশহরে তার ছেলের খালু-শ্বশুরের বাড়িতে পালানোর চেষ্টায় থাকাকালীন আনোয়ার যখন তাকে বলে আজ কোথাও না গিয়ে তাদের বাড়িতেই থেকে যেতে তখন আসন্ন বিপদ আশঙ্কায় খয়বার গাজীর মনোজাগতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন উপমা প্রয়োগের মধ্য থেকে যার ভেতর দিয়ে মূলত খয়বার গাজীর মানসিক অবস্থাই স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে-

> তার মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে কাগজের মতো। তার চোখ থেকে প্রাণ উধাও হয়, নিশ্বাসের জরদার গন্ধ পরিণত হয় কর্পূরের গন্ধে (ইলিয়াস, ২০১৬: ১৯৬)।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ভাষা কারুকার্যময়। তিনি চরিত্রের ভাষা ও লেখকের ভাষাকে সার্থকভাবে আলাদা করেছেন ঘটনা বর্ণনায় ও চরিত্রের সংলাপে। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের ভাষায় উল্লেখিত চিত্রকল্পের ভেতর দিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। স্বৈরশাসককে সরানোর জন্য সাধারণ জনগনের অংশগ্রহণের বর্ণনার দৃশ্যের যে চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তা থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায়-

> কালো কালো হাজার হাজার মাথা এগিয়ে আসছে অখণ্ড স্রোতোধারার মতো। এই বিপুল স্রোতের মধ্যে ঘাইমারা রুইকাতলার ঝাঁক নিয়ে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে কোটি ঢেউয়ের ঢল। ... ... গলি-উপগলি থেকে স্রোত এসে মেশে মূলধারার সঙ্গে, মানুষ বাড়ে, নবাবপুর সামলাতে পারে না, মানুষের প্রবাহ ফের গড়িয়ে পড়ে পাশের ফাঁকা গলিতে। ফাঁকা গলি কি আর আছে? সব জায়গা কানায় কানায় ভরা (ইলিয়াস, ২০১৬: ১৩১)।

উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই জীবিত মানুষ অপেক্ষা মৃত মানুষের শক্তি ব্যাপক। মৃত ব্যক্তির লাশ নিয়ে যখন সবাই রাস্তায় নেমে আসে তখন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। মৃত ব্যক্তির লাশ ঘিরে মানুষের সমবেত হওয়ার সংখ্যা এতই বেশি যে আলাদা করে লাশ চেনার উপায় থাকে না। অর্থাৎ গণ-আন্দোলন, জনগণের অংশগ্রহণের দিকটিই এই উৎপ্রেক্ষা অলংকারের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে-

তাদের বহনকারীদের দ্যাখা যায় না, মনে হচ্ছে শহীদদের লাশ যেন শূন্যে সাঁতার দিয়ে এগিয়ে আসছে।

জুম্মনের মা-কে বারবার কাজ ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করলে সে খিজিরকে জানায় বিবিসায়েব অসুস্থ থাকায় যেমন খুশি কাজ করা যায়, মাঝেমাঝে এটাসেটা চুরি করেও আনা যায়।

বিবিসায়েব বারোমাস বিছানায়, একমাত্র মেয়ে থাকে স্নো-পাউডার-লপস্টিক আর রেডিও নিয়ে।

উক্ত অনুপ্রাসের ভেতর দিয়ে বিবিসায়েবের জীবনের নির্মম বাস্তবতা এবং জুম্মনের মায়ের আর্থিক অবস্থা ও মানসিকতাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের বর্ণনায় বিভিন্ন প্রবাদের মধ্যদিয়ে চরিত্রগুলোর আচরণ, কৃতকর্ম, মনোজাগতিক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে এবং ভাষাও হয়ে উঠেছে নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল হিসেবে। গ্রামীণ বিচারে অপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া আলোচনার সময় এলাকাবাসীদের মধ্য থেকে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ায় বান্দু শেখ,

তাঁই পাদে, তাঁই কোতে, গু ছিটায় কলাপাতে।' প্রবাদটি ব্যাখ্যাও করে সে, 'হাগে খয়বার গাজী, গু ছিটায় হোসেন আলী। ধরলে দুয়োটাক ধরা লাগে।

উক্ত প্রবাদের মধ্যদিয়ে খয়বার গাজী ও হোসেন আলীর সহযোগী আচরণ ও এলাকায় দুজনের অন্যায় কাজের সম্পৃক্ততাকেই ফুটিয়ে তুলেছে। উক্ত প্রবাদ ছাড়াও উপন্যাসে আরও কিছু প্রবাদের উল্লেখ আছে, যেমন-

কৈ মহারানী, কৈ চুতমারানী!, কোটে বলে মহারাজ আর কোটে কলাগাছ, ধরাকে সরাজ্ঞান করে! এদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, পাগলা কুকুরের মতো দশা! কত ধানে কত চাল।

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের বক্তব্যকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করতে তুলতে ইলিয়াস যে বাগধারাগুলো ব্যবহার করেছেন সেগুলো দিয়ে মূলত তিনি চরিত্রগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থান উদ্‌ঘাটন করেছেন। 'উভয়সঙ্কট, রুইকাতলা, সবেধন নীলমণি, রাঘব বোয়াল– প্রভৃতি বাগধারাগুলোর মধ্য দিয়ে শোষক চরিত্রের প্রকাশ পাওয়া যায়। উপসর্গ ও সমাসজাত শব্দ যেমন– 'গলি-উপগলি, বিনষ্ট, বেঢপ , অচঞ্চল, অবিকৃত, গরহাজির, বেইনসাফি, বেশরম, বেলাহাজ, অজাত, হরতাল, বেইজ্জত, নিমভদ্দর, বিরাগ,আবক্ষউদর, সিংহপুরুষ– প্রভৃতি উপন্যাসের ভাষাকে দিয়েছে গভীর ব্যঞ্জনা।

এ ছাড়াও ধ্বন্যাত্মক ও দ্বিরুক্ত শব্দের মধ্য দিয়ে পরিবেশ, পরিস্থিতি, মনোজাগতিক অবস্থা আঁচ করা যায়। এরকম কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ হচ্ছে– টিপটিপ, ছমছমে, টনটন, চপচপ, ফিসফিস, খচখচ, খাঁ খাঁ, থইথই, প্যাঁক প্যাঁক, ছলছল, ঘেউ ঘেউ, হাড়ে হাড়ে চেনা।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

আলোচ্য গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাখতিন প্রবর্তিত উপন্যাসতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব- বহুপ্রেক্ষাপট, সংলাপধর্মিতা, কার্নিভালিজম, ক্রনোটাইপ সবগুলোই *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে। উপন্যাসটির ক্রনোটাইপ '৬৯-এর সময় ও পরিবেশ এবং যমুনা তীরবর্তী মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলনকে তুলে ধরতে লেখক সচেতনভাবে চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের মুখে যথোপযুক্ত ভাষা প্রয়োগ করেছেন। একইসাথে ঔপন্যাসিকের বর্ণনার ভাষা চরিত্রের ভাষার সাথে মিলেমিশে দ্বিবাচনিকতার তত্ত্বও বাস্তবায়ন করেছে। পরিশেষে বলা যায় যে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* অনেকটা মহাকাব্যিক ঘরানার বলে এখানে বহু চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। একদম শহর থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলের প্রায় সবার উপস্থিতিই উপন্যাসকে করে তুলেছে বহুস্বরের উপন্যাস। ছাত্র-জনতা, মালিক-শ্রমিক, মহাজন-শ্রমিক, এমনকি গ্রামের বিত্তবান, দরিদ্র শ্রেণি এবং তাদের চিন্তা চেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের ভাষার মধ্য দিয়ে। উপন্যাসটিতে শুধু রাজনৈতিক দৃশ্যই না বরং গ্রামের মানুষের শোষণ ও শোষণের বিরুদ্ধে তাদেরকে একত্রিত হয়ে উঠে প্রতিবাদ করার যে ধ্বনি তা অবশ্যই বাখতিনের বহুস্বরকে তুলে ধরে। উপন্যাসটিতে বহুসমন্বিতবাস্তব প্রেক্ষাপট হিসেবে এসেছে গণ-অভ্যুত্থান, রহমতউল্লার অত্যাচার, গ্রামের ফুলে-ফেঁপে ওঠা ধনী শ্রেণি কর্তৃক দরিদ্র শ্রেণির শোষণ। অপরদিকে, অত্যাচারিতরা যখন অধিকার সচেতন হয়ে আওয়াজ তুলেছে সেটাই পরিণত হয়েছে বহুস্বরে।

তথ্য-নির্দেশ

আজম, মোহাম্মদ। (২০১৫)। বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব, *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাবি, বর্ষ ৫২, সংখ্যা ২।

ইউসুফী, এজাজ। (১৯৯২)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, উপন্যাস ও সমাজ বাস্তবতা*, লিরিক।

ইকবাল, শহীদ।(২০১৯)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মানুষ ও কথাশিল্প* ,অক্ষর প্রকাশনী।

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান। (২০১৬)। *চিলেকোঠার সেপাই*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, তপোধীর। (২০০৯)। *বাখতিন এবং মুশায়েরা:* কলকাতা।

Bakhtin, M.M. (1994). *The Dialogic Imagination: Four essays,* edited by Michael Holquist, Translated by Cary1 Emerson and Michael Holquist, Ninth paperback printing, University of Texas Press, Austin

Bakhtin, M. M. (1999). *Problems of Dostoevsky's Poetics,* Edited by cary1 Emerson, Introduction by Wayne C. Booth, Eighth Printing, University of Minnesota Press, Minneapolis, London

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা পত্রিকায় (বাংলা) প্রবন্ধ পাঠানোর নিয়ম

প্রেরিতব্য প্রবন্ধের বিষয়

- বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের মাতৃভাষা পরিস্থিতি;
- টেকসই উন্নয়ন ও মাতৃভাষা;
- ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড জেন্ডার;
- মাতৃভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান;
- মাতৃভাষা ও বিজ্ঞান;
- সমাজ ভাষাবিজ্ঞান;
- বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষাব্যবস্থাপনা;
- সাহিত্য ও ভাষা;
- গণমাধ্যম ও মাতৃভাষার ব্যবহার;
- শিক্ষা-পরিকল্পনায় মাতৃভাষার গুরুত্ব;
- ভাষা ও সংস্কৃতি;
- বহুভাষিক রাষ্ট্রে ভাষিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রমে ভাষাপরিকল্পনা;
- ভাষার নথিবদ্ধকরণ (Documentation), ভাষা-সংরক্ষণ (Preservation) ও প্রমিতায়ন (Standardization), মাতৃভাষায় অভিধান প্রণয়ন, শিশুপাঠ্য বই (Primer) রচনা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে মাতৃভাষার ব্যবহার;
- লিখনব্যবস্থা নেই এমন মাতৃভাষার লিখনব্যবস্থা প্রবর্তন, মাতৃভাষার ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology), বাক্যতত্ত্ব (Syntax) ও বাগর্থতত্ত্ব (Semantics)।

প্রবন্ধ কাঠামো

শিরোনাম (Title)

সারসংক্ষেপ (Abstract)

মূলশব্দ (Keywords)

ভূমিকা (Introduction)

গবেষণা সমস্যার সনাক্তকরণ/সমস্যার বিবৃতি (Identification of Research Problem/Statement of the problem/Statement of the Topic)

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the research)

পূর্বগবেষণা সমীক্ষণ (Literature review)

গবেষণার যৌক্তিকতা (Research Rational)

গবেষণা-প্রশ্ন (Research Questions)

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো (Research theoretical framework)

গবেষণা-পদ্ধতি (Research Methodology)

গবেষণার বিস্তারিত আলোচনা (Discussion)

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল (Results and Findings of the research)

সুপারিশমালা (Recommendation)

উপসংহার (Conclusion)

তথ্য-নির্দেশ (References)

বি. দ্র. Reference System APA 7th edition অনুসরণ করুন।
রেফারেন্স সিস্টেমের লিংক: https://imli.portal.gov.bd/site/page/94efd24a-fa62-44c2-a16e-4a972b57c4b6/-

লেখার নিয়ম

১ প্রবন্ধ অবশ্যই বাংলা ভাষায় লিখিত, অপ্রকাশিত ও মৌলিক হতে হবে।

২ প্রবন্ধের সঙ্গে ইংরেজিতে Abstract বা সারসংক্ষেপ (ন্যূনাধিক ১৫০-২০০ শব্দে) বাম ও ডান দিকে ১/২ (.৫) ইঞ্চি ভেতরে (indenting) ১২ পয়েন্টে ও মূলশব্দ (Key words) বাংলায় ১৪ পয়েন্টে থাকতে হবে।

৩ প্রবন্ধের মূল পাঠ A4 কাগজে ১৪ পয়েন্ট বাংলা 'ইউনিকোড' (যে কোনো ফন্ট) ফন্টে ১.৫ লাইন-ব্যবধান অনুসরণ করে কম্পোজ করতে হবে। হার্ডকপি জমা দেওয়ার সময় একপাশে প্রিন্ট করে দুই(২) সেট জমা দিতে হবে।

৪ মূল পাঠে সারণি (table) ও চিত্র থাকলে সেগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা (যেমন: ১,২,৩...) প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক সারণি ও চিত্রের যথাযথ আখ্যা (caption) জরুরি।

৫ প্রবন্ধের মূল পাঠে অন্য কোনো উৎসের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থাকলে তা একই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতি চিহ্ন (" ") ও সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। তবে উদ্ধৃতিটি ২৫ শব্দের বেশি হলে তা মূল পাঠের নিচে বাম ও ডান দিকে ১/৪ (.২৫)

ইঞ্চি ভেতরে (indenting) ১২ পয়েন্টে নতুন অনুচ্ছেদে সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করার দরকার নেই। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস অক্ষুন্ন থাকবে।

৬ বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত আধুনিক বাংলা অভিধান-এর বানান অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের পরিবর্তন হবে না।

৮ মূল পাঠে কোনো বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করতে চাইলে তা মূল পাঠের শেষে অন্ত্য-টীকায় (end-note) উপস্থাপন করতে হবে। এ ধরনের টীকা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল পাঠের উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা বক্তব্য অধিসংখ্যা (superscript) দিয়ে ১, ২, ৩ ইত্যাদি) নির্দেশ করতে হবে।

৯ অন্য কোনো লেখকের উদ্ধৃতি ব্যবহারের নিয়ম:

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হুমায়ুন আজাদ-এর বাক্যতত্ত্ব বইয়ের ২০ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত অংশটি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপিত হবে:

ছাত্রদের বাক্যবোধ জাগানোর চেষ্টা বাঙলা ভাষা-অঞ্চলে খুব প্রবল নয়; কিন্তু পশ্চিমে এ-চেষ্টা অন্তহীন। সেখানে শিক্ষার্থীদের মনে বাক্যবোধ সৃষ্টির নিরন্তর চেষ্টা চালানো হয়, ও শুদ্ধ বাক্য রচনার কৌশল শেখানো হয় নিত্য অভিনব উপায়ে। তবুও ত্রুটি ঘটে, যা অনেকে লালন করে সারা জীবন (আজাদ, ১৯৮৪: ৮)।

১০ গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে তথ্য-নির্দেশে সকলের নাম থাকতে হবে।

১১ প্রকাশিত কিংবা প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন লেখা গ্রহণ করা হয় না।

১২ প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার দুটি কপি এবং তাঁর লেখার ৫ কপি অফপ্রিন্ট পাবেন।

১৩ লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর থাকতে হবে।

১৪ নির্বাচিত কোনো প্রবন্ধ স্থানাভাবে প্রকাশ করা সম্ভব না হলে তা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

১৫ প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে আমাই কর্তৃক নির্ধারিত রেফারেন্স অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় লেখা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিবেচনা করা হবে না। আমাইয়ের রেফারেন্স পদ্ধতি www.imli.gov.bd ঠিকানায় প্রকাশনা অংশে দেওয়া আছে।

১৬ প্রবন্ধে মূল পাঠের শেষে একটি তথ্য-নির্দেশ (reference) থাকবে। এই তথ্য-নির্দেশে কেবল মূল পাঠে যেসব লেখক ও গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তা বর্ণানুক্রমে (alphabetic order) বিন্যস্ত করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তথ্য-নির্দেশ রচনা করতে হবে, যেখানে প্রথমে বাংলা বই স্থান পাবে। এছাড়া পত্রিকার উল্লেখ থাকলে তা বইয়ের নামের পরে যাবে। তথ্য-নির্দেশের ক্ষেত্রে (hanging) ১/২ (.৫) ইঞ্চি হবে । রচনার নিয়ম নিম্নরূপঃ

গ্রন্থ

রাজীব, হুমায়ুন। (২০০১)। *সমাজভাষাবিজ্ঞান*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী।

Hai, Muhammad Abdul. (1960). *A Phonetic and Phonological Studz of Nasals and Naslization in Bengali.* The University of Dhaka.

১. একক লেখকের ক্ষেত্রে

সরকার, পবিত্র। (১৪০৫)। *ভাষা, দেশ, কাল*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলিকাতা।

২. দুইজন লেখকের ক্ষেত্রে

চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব। (২০০৪)। *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*। পুস্তক বিপণিঃ কলকাতা।

৩. দুইয়ের অধিক লেখকের ক্ষেত্রে

খান, শামসুজ্জামান, ইসলাম, আজহার ও হোসেন, সেলিনা (সম্পা.)। (১৯৮৫)। *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ*। বাংলা একাডেমিঃ ঢাকা।

৪. সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে প্রবন্ধ

রফিক, আহমদ। (২০২১)। ভাষা ও শব্দের ইতিহাস-প্রতিমা। সাজ্জাদ আরেফিন (সম্পা.), *একুশের কবিতা পরিচয়*। প্রথম খণ্ড। বাংলা একাডেমিঃ ঢাকা।

৫. গবেষণা জার্নাল থেকে প্রবন্ধ

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। (১৩২৪)। আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর। *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ২৪শ ভাগ (১৩২৪), ২১৩-২৫২। [১৯১৭]

৬. লেখকহীন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেন [কারাস]। (২০২১)। *জীবনযুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৭. একই বছরে একই লেখকের প্রকাশিত একাধিক প্রকাশনা

হক, সৈয়দ শামসুল। (১৯৯১ক)। *খেলারাম খেলে যা*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

হক, সৈয়দ শামসুল। (১৯৯১খ)। *মেঘ ও মেশিন*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

হক, সৈয়দ শামসুল। (১৯৯১গ)। *ইহা মানুষ*। শিখা প্রকাশনী: ঢাকা।

৮. অনলাইন/ইন্টারনেট উৎস থেকে

রায়, কৃষ্ণা। (জানুয়ারি ৯, ২০২২)। সৃজনশিল্পী: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়ম্বদা দেবী এবং ওকাকুরা কাকুজো। *দৈনিক আনন্দবাজার*। প্রবেশ ৭ই জুলাই ২০২৪,

https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/special-write-up-about-priyam vada-devi-and-his-love-towards-rabindranath-tagores-poem/cid/1322644

৯. লেখকহীন এবং তারিখহীন উল্লেখ

Pet therapy. (n.d.). Retrieved from http://www.holisticonline.com/stress/stress_pet-therapy.html

১০. গবেষণা পত্রিকা

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (২০০৮)। "বাংলা কর্মবাচ্য: গঠন বিশ্লেষণ"। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১১. ব্লগ পোস্ট থেকে

আহমেদ, বখতিয়ার। (২০১৩)। ভাষা সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা প্রশ্নে আমাদের জাতিরাষ্ট্র। [ব্লগ পোস্ট]। নেয়া হয়েছে ৪ ডিসেম্বর, ২০২৪, https://rashtrochinta.org/blog-post/**ভাষা-সংস্কৃতি-ও-জাতিসত্ত/**

১২. অভিধান থেকে

ক. সরাসরি অভিধান

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সঙ্ক.)। (১৯৯৮)। *সংসদ বাংলা অভিধান* (দ্বাবিংশতিতম মুদ্র.)। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা

খ. অনলাইন

Cambridge dictionaries online. (2011). Retrieved from http://dictionary.cambridge.org/

১৩. ভিডিও/ডিভিডি/ইউ টিউব থেকে

Gardiner, A., Curtis, C., & Michael, E. (Producers), & Waititi, T. (Director). (2010). Boy: Welcome to my interesting world [DVD]. New Zealand: Transmission.

১৪. ম্যাগাজিন/সাময়িকী থেকে

করিম, মীর রেজাউল। (২০২৪)। এত বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে কী হবে? পড়েই বা কী লাভ হচ্ছে? *দৃষ্টি*, ১।

১৫. দৈনিক পত্রিকা থেকে

রহমান, মিজানুর। (মার্চ, ২০২২)। ১৩৫ মনের মুক্তিযোদ্ধা সনদের তথ্যে গরমিল। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৩।

ইউক্রেন যুদ্ধে বিদেশি যোদ্ধা পাঠাচ্ছে পুতিন। (২০২২, মার্চ ১৩)। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৭।

১৬. অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

নেছা, করিমন। (২০১৪)। বাংলা কোড সংহিতা: একটি সমাজভাষাজ্ঞোনিক গবেষণা (অপ্রকাশিত এমফিল অভিসন্দর্ভ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৭. পুস্তিকা/ব্রোশিউর/বুকলেট

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (২০১০)। International Mother Language Institute (IMLI) [ব্রোশিউর]। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট: ঢাকা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট
শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৮৮-০২-৮৩৯১৩৪৬ ই-মেইল: imli.moebd@gmail.com

ISSN: 2618-0103 | ISSN-L: 2618-0103